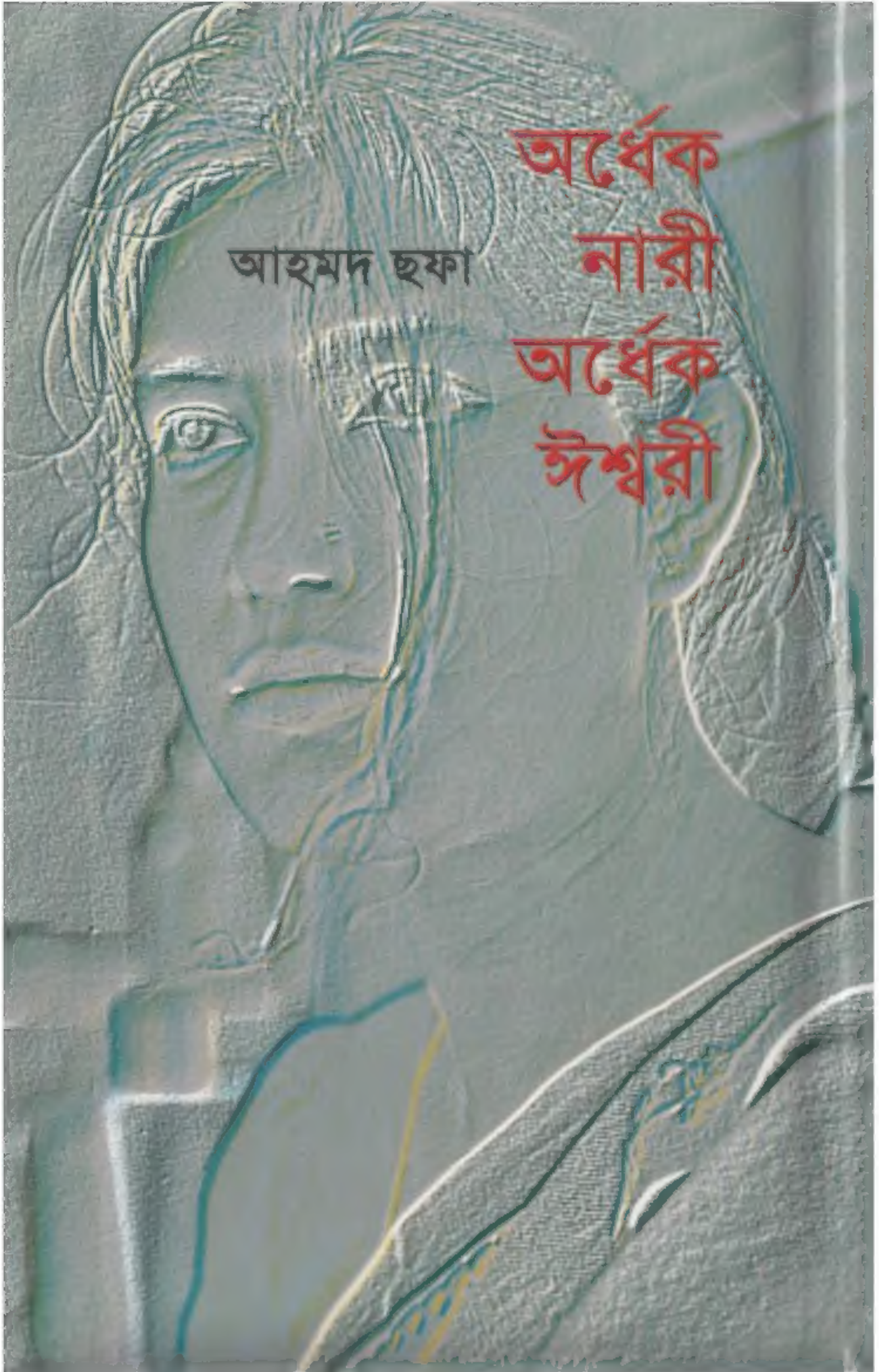
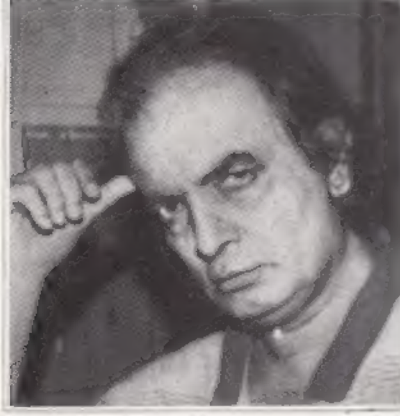

অর্ধেক
নারী
অর্ধেক
ঈশ্বরী
আহমদ ছফা

সত্য কল্পকাহিনীর চাইতে আশ্চর্যতরো। এটা আপ্তবাক্য। যে কাহিনীর মূলে সত্যের স্পর্শ নেই, সে কাহিনী মূল্যহীন। আহমদ ছফার দুই খণ্ডে সমাপ্ত আত্মজৈবনিক উপন্যাস অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী একটি অসাধারণ প্রেমের উপন্যাস।
নর-নারীর প্রেম হলো সবচাইতে জটিলতম শিল্পকর্ম। প্রেমজ একটি অঙ্গীকার না থাকলে প্রেমের কাহিনী বয়ান করা যায় না। আহমদ ছফা অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী উপন্যাসের প্রথম খণ্ডটিতে প্রেমজ অঙ্গীকার নিয়েই প্রেমের কথা বলেছেন। লেখক একেকটি নারী চরিত্রকে এমন জীবন্তভাবে উপস্থাপন করেছেন, নারীদের মনো-জগতের এমন উন্মোচন ঘটিয়েছেন; গ্রন্থটি পাঠ করলে মনে হবে জীবনের করুণতম অভিজ্ঞতার উৎস থেকেই জন্ম লাভ করেছে এই সমস্ত চরিত্র। প্রেমে পড়ার জন্য যেমন সৎ, একনিষ্ঠ হৃদয়বৃত্তির প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন প্রেম কথা বয়ান করার জন্য আরেক ধরনের নিষ্ঠা এবং সততার। শক্তির সঙ্গে সততার সম্মিলন সচরাচর ঘটে না। আহমদ ছফা এই অনুপম রচনাটিতে সেই আপাত অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছেন।
মনস্বীতাসম্পন্ন অনেকগুলো উপন্যাস আহমদ ছফার কলম থেকে বেরিয়েছে। নর-নারীর প্রেমকে উপজীব্য করে তাঁর উপন্যাস লেখার এটিই প্রথম প্রয়াস। অসাধারণ লিপি-কুশল লেখকের এই ধ্রুপদধর্মী উপন্যাসটিতে মানব-মানবীর প্রেম যে এক নতুনতরো ব্যঞ্জনায় দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।



আহমদ ছফা
জন্ম : ১৯৪৩ সাল
গাছবাড়িয়া, চট্টগ্রাম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এম. এ
গবেষক, বাংলা একাডেমী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গান, প্রবন্ধ, অনুবাদ, ইতিহাস, ভ্রমণ কাহিনী মিলিয়ে তিরিশটিরও অধিক গ্রন্থের প্রণেতা।
সম্পাদকীয় উপদেষ্টা অধুনালুপ্ত দৈনিক গণকণ্ঠ ও প্রধান সম্পাদক সাপ্তাহিক উত্তরণ। বাংলাদেশ লেখক শিবিরের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি।
একাধিক রচনা একাধিক ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ হয়েছে এবং হওয়ার পথে।
একাধিক সাহিত্য পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন।
জার্মানির ভেৎসলার শহরের মহাকবি গ্যোতের স্মৃতিবিজড়িত কিয়োস্কটি (পানশালা) আহমদ ছফার নামে নামকরণ করা হয়েছে।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

I S B N 984-410-057-7

অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী



আহমদ ছফা



অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী

আহমদ ছফা

মাওলা ব্রাদার্স ॥ ঢাকা

উৎসর্গ

ফারজানাকে

১

তোমার একটি নাম আছে। তোমাকে বাড়িতে ওই নাম ধরে সবাই ডাকে। তোমার মা-বাবা-ভাই-বোন-আত্মীয়স্বজন পাড়ার লোক সবাই। ক্লাসের হাজিরা খাতায় ওই নামটি লেখা হয়েছে। ওই নামে লোকে তোমার কাছে চিঠিপত্র লেখে। এই পত্র লেখকদের অনেকেই নিজেদের নাম-ধাম উহ্য রেখে মনের গহন কথাটি প্রকাশ করে থাকে। তোমার মা অত্যন্ত সতর্ক এবং সাবধানী মহিলা। তাঁর ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। এই ধরনের চিঠি তাঁর হাতে পড়া মাত্রই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারেন, ভেতরের কাগজে দাহ্য পদার্থ রয়েছে। তিনি কালবিলম্ব না করে এই উড়ে আসা চিঠিগুলো গ্যাসের চুলোয় জ্বালিয়ে ফেলেন। কখনো-সখনো তোমার মায়ের সতর্ক চোখের ফাঁক দিয়ে কোনো চিঠি তোমার হাতে এসে পড়ে। তুমি অত্যন্ত মাতৃভক্ত মেয়ে। কোনো ব্যাপারে মায়ের অবাধ্য হওয়ার কথা তুমি স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারো না। তারপরও ওই চিঠিগুলোর প্রতি তুমি মায়ের মতো নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারো না। কারণ, বুঝে ফেলেছো, তোমার এখন চিঠি আসার বয়স। যেসব চিঠি তোমার হাতে পড়ে, তোমার মা যাতে ঘুণাক্ষরেও টের না পান, অত্যন্ত সন্তর্পণে সেজন্যে বাথরুমে গোসল করার সময় মর্ম উদ্ধার করতে চেষ্টা করো। অধিকাংশ আজেবাজে চিঠি, ফাত্রা কথায় ভর্তি। কারা এসব লেখে তাদের অনেককেই তুমি চেনো। যাওয়া-আসার পথে অনেকের সঙ্গেই তোমার দেখা হয়। এই ধরনের কুপাঠ্য চিঠি পড়ার পর তোমার নিজের ওপর রাগ বাড়তে থাকে এবং শরীর গুলিয়ে ওঠে। খুব ভালো করে সুগন্ধি সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে গোসল করার পরও তোমার মধ্যে একটা অপবিত্র ভাব, একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি কাজ করতে থাকে। একটা পীড়িত ভাব তোমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

মাঝে মাঝে এমন চিঠিও আসে, পড়ার পর পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেমন লহরি খেলে, তেমনি তোমার মনেও তরঙ্গ ভাঙতে তাকে। এই পত্র লেখককে মনে হয় তুমি চেনো। কালো কালির অক্ষরে তার চোখের দৃষ্টি, মুখের ভাব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। তুমি নিজে খুব

অসুখী বোধ করতে থাকো। সারাটি দিন একটা গাম্ভীর্যের আবরণে নিজেকে আবৃত করে রাখো। তোমার মা কড়া মহিলা হলেও তাঁর মনে এক ধরনের আশঙ্কা দোলা দিয়ে যায়। তিনি মনে মনে প্রমাদ গুণতে থাকেন। কারণ তোমার মতিগতি তাঁর কাছে বড় দুর্বোধ্য মনে হয়। তিনি তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিত হয়ে পড়েন।

এখন তোমার নামের কথায় আসি। এই নাম দিয়েই তোমাকে সবাই চেনে। যে অফিসটিতে তুমি পার্টটাইম কাজ করো, সেখানে ওই নামেই তোমাকে সবাই জানে। ওই নামেই তোমাকে নিয়োগপত্র দেয়া হয়েছিলো। ওই নামেই মাসের শেষে তোমার মাইনের বিল হয়, চেক কাটা হয়। সবার কাছে শুনতে শুনতে তোমার মনে এমন একটা প্রতীতি গাঢ়মূল হয়েছে যে, তোমার নামটি তোমার সত্তার অবিভাজ্য অংশে পরিণত হয়েছে। কেরামুন কাতেবুন নামে যে দু'জন ফেরেশতা তোমার কাঁধের ওপর বসে অদৃশ্য কাগজে, অদৃশ্য কালিতে, তুমি সারাদিন ভালো করেছো কি মন্দ করেছো, সমস্ত তোমার নামের পাশে টুকটুক করে লিখে নিচ্ছেন। ওই ফেরেশতা সাহেবেরা তোমার নামের পাশে এমন একটা অদৃশ্য জাল পেতে রেখেছেন, তোমার ভালো-মন্দ সেখানে মাকড়সার জালের মধ্যে মশা-মাছির মতো টুকটুক আটকা পড়ে যাচ্ছে। কোনো সুন্দর যুবা পুরুষ দেখে তোমার মনে যদি একটি মিষ্টি চিন্তা ঢেউ দিয়ে জেগে ওঠে, মনের সেই একান্ত ভালো লাগাটুকুও ফেরেশতা সাহেবদের পেতে রাখা ভাড়ারে ধরা পড়বেই পড়বে।

তোমার যখন মৃত্যু হবে, শাদা কাফনে ঢেকে তোমার প্রাণহীন শরীর যখন মাটির গহিনে নামানো হবে, তখনও তুমি নামের জাল ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে পারবে না। দু'জন ভীষণ-দর্শন ফেরেশতা তরুণ বজ্রের মতো ভয়ঙ্কর শব্দে তোমার নাম ধরে চিৎকার করে ডাক দেবেন। তোমাকে মৃত্যুর স্তব্ধতার ভেতর থেকে জেগে উঠতে হবে। এক সময় পৃথিবীতে তুমি মানুষের শরীর নিয়ে বেঁচেছিলে, রক্তের উদ্ধতা এবং হৃদয়ের জ্বর নিয়ে মানুষকে ভালোবাসার চেষ্টা করেছিলে, অপ্রাপ্য সুন্দর বস্তু দেখে তোমার মনে লোভ জন্মেছিলো, ফেরেশতা দু'জন জেরার পর জেরা করে সব তোমার কাছ থেকে টেনে বের করে ছাড়বেন, কিছুই গোপন রাখতে পারবে না। পৃথিবীতে তুমি চোখ দিয়ে দেখেছিলে, হাত দিয়ে স্পর্শ করেছিলে, ঠোঁট দিয়ে চুমু খেয়েছিলে, এক কথায়, কেনো বেঁচেছিলে, কীভাবে বেঁচেছিলে, তার সমস্ত কৈফিয়ত তোমাকে দিতে হবে। ফেরেশতা সাহেবদের প্রত্যাশিত জবাবদিহি যদি তোমার মুখ থেকে বেরিয়ে না আসে, তাহলে কাঁটাঅলা গদার আঘাতে . . .। থাক, তোমাকে আগাম ভয় পাইয়ে দিতে চাইনে।

তারপর অনেক বছর (কতো বছর আমি বলতে পারবো না) ঘুমিয়ে থাকার পর হাশরের দিন ইস্রাফিল ফেরেশতার শিঙার হুঙ্কারে আবার তোমাকে জেগে উঠতেই হবে। আল্লাহতায়ালা যখনই ইচ্ছে করবেন, অমনি, কম্প্যুটারের পর্দায় তোমার আমলনামা ভেসে উঠবে। আল্লাহতায়ালা মানুষের পাপ-পুণ্যের সূক্ষ্ম বিচারক। তিনি তোমাকে জাহান্নামে ছুঁড়ে দেবেন কি বেহেশতে দাখিল করবেন, সে তোমার এবং আল্লাহর ব্যাপার।

তোমার নামের প্রশ্নটি তুললাম, তার একটা কারণও আছে। আমি ভেবে দেখেছি নামের চাইতে মাথা ঘামাবার উপযুক্ত বিষয়বস্তু দুনিয়াতে দ্বিতীয় কিছু নেই। আল্লাহতায়ালা

তো প্রথম মানব আদমকে নাম শিক্ষাই দিয়েছিলেন। তার মানে নাম শিক্ষা দেয়ার ছলে নামের শৃঙ্খলে তাঁকে বেঁধে ফেলেছিলেন। নামের বাঁধন ছিঁড়ে আদমের পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। আদমের বংশধরদেরও কারো নামের বন্ধন ছিন্ন করা সম্ভব হবে না।

তোমার এই নামটির কথা চিন্তা করে দেখো। যখন এই নামটি তোমার রাখা হয়েছিলো, তখন নামের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক অনুভব করার বোধ জন্মায় নি। এখন দেখো ওই নামটি তোমাকে কতো কিছুর সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে। মা-বাবা-আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শি, এমন কি গোপনে গোপনে যারা তোমাকে ভালোবাসে, সবার মনে ওই নামটি তোমার অস্তিত্বের প্রতীক হিশেবে, স্থান-বিবর্জিত সর্বনামরূপে এমনভাবে গেঁথে আছে, তুমি ইচ্ছে করলে মুছে ফেলতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায়, রেশন দোকানের তালিকায়, অফিসের হাজিরা বইতে, ভোটার লিস্টের পাতায়, পানি-বিদ্যুৎ, গ্যাস বিলের মাসিক খতিয়ানে, পাসপোর্টের সিলমোহরের নিচে এমনভাবে তোমাকে অদৃশ্য রশিতে আটকে রেখেছে, পালিয়ে যাবে তার কোনোও উপায় নেই। এমন কি মরে গিয়েও না। মৃত্যুর অপর পারে আল্লার বিক্রমশালী ফেরেশতারা নামের রশি নিয়ে তোমাকে গ্রেফতার করার জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছেন। স্বয়ং আল্লাহতায়ালার ঘরেও তোমার নামটি রেকর্ড হয়ে গেছে।

তোমার ওই অতি পরিচিত, অতি ব্যবহৃত নামের আমার প্রয়োজন হবে না। ওই নাম তোমার জন্য একটি কারাগারস্বরূপ। তোমাকে আমি দেখি মুক্তি এবং স্বাধীনতার প্রতীক হিশেবে। তাই ঠিক করেছি আমি একটি নতুন নাম দেবো। তোমার মা-বাবার দেয়া নাম তোমাকে চারপাশ থেকে আটকে ফেলেছে, সেই ঘেরাটোপ থেকে তোমার প্রকৃত সত্তা বের করে আনার জন্যে একটা মানানসই নাম আমার চাই। অভিযাত্রীরা অচেনা ভূখণ্ডে পদার্পণ করা মাত্রই একটা নাম দিয়ে বসেন। লেখকেরা একটা গল্প লিখলে নতুন নাম দেন, বিজ্ঞানীরা নতুন কিছু আবিষ্কার করলে তড়িঘড়ি একটা নাম দিয়ে ফেলেন। তাঁদের যুক্তি হলো, যে বস্তুর অস্তিত্ব দুনিয়াতে ছিলো না, আমরা তাঁকে নতুন সত্তায় সত্তাবান করেছি, সুতরাং নতুন একটি নাম দেবো না কেনো? অতো গম্ভীর এবং প্যাঁচালো বিতর্কের মধ্যে আমি যাবো না।

শাদা কথায় আমি তোমার একটি নতুন নামকরণ করতে চাই। আমার মনে একটা দুঃসাহস ঘনিয়ে উঠেছে, আমি তোমাকে নতুন করে সৃষ্টি করবো। আল্লাহতায়ালার ইচ্ছেতে তোমাকে জন্মাতে হয়েছে, তাই তুমি তাঁর কাছে ঋণী। ওই রক্ত-মাংসের শরীর তুমি মা-বাবার কাছ থেকে পেয়েছো, মা-বাবার কাছেও তোমার এমন কিছু ঋণ রয়েছে যা কোনোদিন অস্বীকার করতে পারবে না। পরিবারের মধ্যে তুমি বেড়ে উঠেছো, রাষ্ট্র তোমাকে নিরাপত্তা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে, এমন কি বাংলাভাষী মানুষজন তোমার জিভে বাংলা ভাষাটি তুলে দিয়েছে। সবাই তোমাকে দাবি করে, তোমার অস্তিত্বের মধ্যে সবকিছুর অস্তিত্ব সমুদ্রের পানির মধ্যে লবণের মতো মিশে আছে।

আমার কথা বলি। কারো দাবি আমি অস্বীকার করিনে। আমি তোমাকে দু'বেলার অন্ন সরবরাহ করি নি, মাসমাইনের টাকা দিই নি, ঘুমোবার বাসগৃহের ব্যবস্থা করি নি,

চলাফেরার নিরাপত্তা নিশ্চিত করি নি, জ্ঞানবিদ্যার ঊর্ধ্বজগতে তুলে ধরি নি, পরকালে বিচার-আচার করার জন্যে উদ্যত মুষল হাতে দাঁড়িয়ে থাকি নি। তারপরও তোমার প্রতি আমার একটা ভিন্নরকম দাবি, একটা অধিকার বোধ হালফিল জন্ম নিতে আরম্ভ করেছে। তোমার সত্তার যে অংশটিতে আল্লাহতায়ালার অধিকার নেই, কোনো মানুষের এখতিয়ার নেই, রাষ্ট্র সমাজ, কারো কাছে দায়বদ্ধতা স্বীকার করে না, যেখানে তুমি শুধু তুমি, তোমার অস্তিত্বের সেই মর্মবিন্দুটি আমি স্পর্শ করতে চাই। যদি আমি সাধক চরিত্রের মানুষ হতাম, সারা জীবনের সাধনায় সেই অপ্রকাশ-বিন্দুটি স্পর্শ করে একটি সুন্দর নাম ধ্যানের উত্তাপে ফুলের মতো ফুটিয়ে তুলতাম। সাধ আর সাধ্য এক জিনিস নয়। আমার যদি সে কামালিয়াত থাকতো, একটি নাম, শুধু একটি নামে তোমার সত্তার আসল রূপ বিকশিত করার জন্যে সমস্ত জীবন ধ্যানের আসনে কাটিয়ে দিতাম।

আমার ধৈর্যের পরিমাণ খুবই অল্প। তড়িঘড়ি একটা নাম দিয়ে ফেলতে চাই। যদি তোমার নাম ঈশ্বরী রাখতাম, বেশ হতো। তোমাকে ঈশ্বরের সঙ্গে জড়াবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও আমার নেই। কারণ তুমি একান্ত আমার। সেখানে কারো কোনো অংশ নেই, একেবারে লা শরিক। উপায়ান্তর না দেখে তোমার একটি নাম নির্বাচন করার জন্যে সঙ্গীত শাস্ত্রের শরণ নিলাম। একমাত্র সঙ্গীতই তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অপ্রকাশকে মূর্ত করে তুলতে পারে। সুতরাং তোমার নাম রাখলাম সোহিনী।

সোহিনী রাগের নামে তোমার নামকরণ করলাম। একটু হাল্কা বোধ করছি। নামকরণ তো করলাম। এই রাগটি সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়া দরকার। এটি মাড়োয়া ঠাটের অন্তর্গত একটি রাগ। এতে পঞ্চম স্বরটি ব্যবহার হয় না। বলতে হবে এটি একটি ষাড়ব রাগ। আরোহীতে সা গা হ্ম ধা নি সা এবং অবরোহীতে সা নি ধা হ্ম ধা গা, হ্ম গা রে সা অনুসরণ করে গাওয়া হয়। গাইবার সময় রাতের শেষ প্রহর। গুণী গাইয়ে যখন তানপুরার স্বরে তন্ময় হয়ে, কণ্ঠের তড়িতের মধ্য দিয়ে এই রাগের সৌন্দর্য লক্ষণসমূহ প্রকাশ করতে থাকেন, তখন কী যে এক অনির্বচনীয় রূপ-রসের জগৎ মূর্তিমান হয়ে ওঠে, সে আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। সৌন্দর্যের সঙ্গে কষ্টের একটা সংযোগ আছে এটাই সোহিনী রাগের বৈশিষ্ট্য। রাত যতোই শেষের দিকে গড়াতে থাকে, এই রাগটির সৌন্দর্য ততোই প্রস্ফুটিত হতে থাকে। কিন্তু একটি কথা, সঙ্গীতশাস্ত্রে যে গাইয়ে বিশুদ্ধি এবং নির্ভারতা অর্জন করে নি, তার কণ্ঠে সোহিনী রাগ কখনো গহন সৌন্দর্য নিয়ে ধরা দেবে না।

সেই প্রাচীনকালে সঙ্গীতশাস্ত্র যখন সবে আকার পেতে আরম্ভ করেছে ধ্যানী সাধকদের তন্ময় সাধন দৃষ্টিতে রাগ-রাগিণীগুলো তাদের সৌন্দর্যের ভাণ্ডার উন্মোচিত করে রসমূর্তিতে আবির্ভূত হতো। সাধকের প্রাণ রাগ-রাগিণীর চলার গতি আর অপূর্ব তাল-লয়ের স্বর্ণ-রেখায় আঁকা হয়ে যেতো। তখন পৃথিবী তরুণী ছিলো। নিসর্গের ভাণ্ডার থেকে, বিহঙ্গের কাকলি থেকে, প্রাণিকুলের ডাক থেকে, হাওয়ার স্বনন থেকে, নদীর গতিধারা থেকে সুর উঠে এসে সাধকের কণ্ঠে নিবাস রচনা করতো। তখন মানুষের অনুভূতি ছিলো স্বচ্ছ অকলঙ্ক। হৃৎপিণ্ডের লাল শোণিতের চাইতে তাজা অনুরাগ দিয়ে

সুরের স্যাধনা করতেন সাধকেরা। তাঁদের নির্মল ধ্যানদৃষ্টিতে যে সুরগুলোর মধ্যে শক্তির প্রকাশ ধরা পড়তো, তাকে বলতেন রাগ, আর যে সুরগুলোতে চলমান সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করতেন বলতেন রাগিণী। আমার ধারণা, সোহিনী রাগ নয়, রাগিণী।

২

সোহিনী, তুমি আমার কাছে অর্ধেক আনন্দ, অর্ধেক বেদনা। অর্ধেক কষ্ট, অর্ধেক সুখ। অর্ধেক নারী, অর্ধেক ঈশ্বরী। তোমাকে নিয়ে আমি কি করবো! তোমার টানা টানা কালো চোখের অতল চাউনি আমাকে আকুল করে। তোমার মুখের দীপ্তি মেঘ-ভাঙা চাঁদের হঠাৎ ছড়িয়ে-যাওয়া জোছনার মতো আমার মনের গভীরে সুরের তরঙ্গ জাগিয়ে তোলে। দিঘল চিকন কালো কেশরাশি যখন তুমি আলুলায়িত করো, হাওয়া-লাগা চারাগাছের মতো আমি কেমন আন্দোলিত হয়ে উঠি। তোমাকে নিয়ে আমি যাবো কোথায়? সোহিনী তুমি কি নিদারুণ সঙ্কটের মধ্যে আমাকে ছুঁড়ে দিয়েছো? তুমি 'এসো, এসো' বলে কাছে ডাকছো, আবার 'না-না' বলে দূরে ঠেলে দিচ্ছো। এই না-আসা না-যাওয়ার পথের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে কি অবস্থা করেছো আমার! তোমার মনে কি আমার প্রতি একটুও দয়া নেই? কাঞ্চনজঙ্ঘার অমল ধবল সূর্যালোক-চমকানো তুষার চূড়োর মতো আমাকে আকর্ষণ করছো। আমি যতোদূর যাই, যতোদূর যেতে থাকি, কাঞ্চনজঙ্ঘা ততোদূরে পিছোতে থাকে। ক্লান্ত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যখন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে থাকি সোনা-মাখানো কাঞ্চনজঙ্ঘার সমস্ত তুষার মধুর হাসি ছড়িয়ে দিয়ে হাতছানিতে ডাকতে থাকে, এই তো আমি, সেই কতোকাল থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার প্রতীক্ষা করছি। তুমি আমাকে কি নিষ্ঠুর অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিয়েছো? নিজের সঙ্গে আমাকে কী কঠিন লড়াইটা না করতে হচ্ছে! আমি যে দাঁড়িয়ে থাকবো, তার উপায় নেই, সামনে পা ফেলবো, সে শক্তিও পাচ্ছিনে। এই না-চলা না-দাঁড়ানো অবস্থা, তার কী যে যন্ত্রণা!

তোমার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হলো, সেদিন কি বার, কোন্ মাস, দিবসের কোন্ প্রহর, কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে তোমার সঙ্গে দেখা হলো। চরাচর চিরে তুমি যখন আবির্ভূত হলে, রজনীগন্ধার বোঁটার মতো যখন ঈষৎ নত হয়ে দাঁড়ালে, আমার শরীরের সমস্ত রক্ত মিছিল করে উজানে চলতে আরম্ভ করলো। চেতনার স্তরে স্তরে উৎসবের সাড়া পড়ে গেলো। আচমকা আমি বলে উঠলাম, আমি পেয়েছি, পেয়ে গেছি! নিজের উচ্চারণে নিজেই চমকে গেলাম। একী বলছি আমি! সামনে তুমি দাঁড়িয়ে। আমার মনে হলো, তুমি আসবে বলে, এসে এমনি করে দাঁড়াবে বলে, কতোকাল ধরে তোমার প্রতীক্ষায় আমি অধীর ছিলাম। আজ তুমি এসে গেছো। তোমার এলানো চুলের

গোছা ছড়িয়ে পড়েছে। চোখের তারা দুটো থর থর কাঁপছে। শরীর থেকে সুঘ্রাণ বেরিয়ে আসছে। বহুকাল আগে বিস্মৃত একটি স্বপ্ন যেনো আমার সামনে মূর্তিমান হয়েছে। শরীরের রেখাটি ঘিরে ঘিরে, শাড়িটি কোমর ছাড়িয়ে, বক্ষদেশ ছাড়িয়ে কাঁধের ওপর উঠে এসেছে। আঁচল-প্রান্ত হাল্কা হাওয়ায় একটু একটু করে কাঁপছে। আমি মৃদু খসখস শব্দ শুনতে পাচ্ছি। দুটো গানের কলি ঢেউ দিয়ে মনের মধ্যে জেগে উঠলো—সোহাগ ভরে অনুরাগে জড়িয়ে ধীরে ধীরে / বেনারসী প্যাঁচ দিয়েছে শরীর বল্লরীরে।

আমি বিড় বিড় করে বলতে থাকলাম, তুমি আমার জীবন। তোমাকে না পেলে আমি বাঁচবো না। তুমি আমার গন্তব্য, আমার মঞ্জিলে মকসুদ। তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্যে দুনিয়ার অপর প্রান্ত অবধি আমি ছুটে যাবো। দুস্তর সমুদ্র পাড়ি দেবো। দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ের শীর্ষ চূড়োয় আমি আরোহণ করবো। তুমি আমার মৃত্যু। তোমার পেছন পেছন আমি তীর্থযাত্রীর মতো ছুটে যাবো। যদি মৃত্যু আমাকে গ্রাস করতে ছুটে আসে শহিদের আবেগ নিয়ে আমি সেই মরণকে আলিঙ্গন করবো।

সোহিনী, তুমি আমার বুকে কী এক দুঃসাহসের জন্ম দিয়েছো! কী এক অসম্ভব আশা আমার মনে রক্ত শতদলের মতো ফুটিয়ে তুলেছো! আমার শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কী অপার শক্তির লহরি খেলিয়ে তুলেছো! আমি তোমাকে বারণ করতে পারছিনে। একটা দুর্বার গতিবেগ আমাকে ছুটিয়ে নিতে চাইছে। তুমি আমার পথ, আমার গন্তব্য। আমাকে যেতে হবে, আমাকে যেতে হবে। শরীরের প্রতি লোমকূপ থেকে একটা সিদ্ধান্ত প্রবাহিত হয়ে আমাকে তোমার অভিমুখে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তোমার অভিমুখে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোনো পথ খোলা নেই, যখন বুঝতে পারলাম, মনটা বিষাদে ছেয়ে গেলো। মনে হলো জেনেশুনে একটা ফাঁস গলায় পরলাম। এই ফাঁসই আমাকে টেনে নিয়ে যাবে। ধরে নিলাম আমার মৃত্যুদণ্ড লেখা হয়ে গেছে। কখন কার্যকর হবে শুধু ঘোষণাটা করা হয় নি। ভীষণ ভারি, ভীষণ কষ্টদায়ক ক্রুশের মতো মৃত্যুদণ্ডের আদেশ চেতনায় বয়ে নিয়ে তোমার দিকে পা বাড়াবো বলে যখন স্থির করলাম, বুকের ভেতর অনেকগুলো কণ্ঠের চাপা গুমরনো কান্নার শব্দ কান পেতে শুনলাম। আমার বুকের ভেতর কাঁদছে আমার অতীত। অতীতে যেসব নারী আমার জীবনে এসেছিলো, এখন দেখছি, তাদের কেউ বিদেয় হয় নি। বুকের ভেতর রাজ্যপাট বিস্তার করে বসে আছে। তোমার দিকে পা বাড়াই কী সাধ্য! তারা কেউ অধিকার ছেড়ে দিতে রাজি নয়। তাদের একেকজন মনের একেকটা অঞ্চল এমনভাবে খামচে ধরে আছে, অধিকার থেকে উপড়ে ফেলি কেমন করে! আমি যখন বাতাসে কান পাতি, বুকের ভেতর থেকে খিলখিল হাসির ধ্বনি, প্রাণ নিংড়ানো কান্নার আওয়াজ, চাপা চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ভেসে আসতে থাকে। এই সমস্ত রক্ত মাংসের নারী আমার জীবনে এসেছিলো। এখন তাদের কেউ নেই। নেই বলে কি একেবারে নেই? মাটির গভীরে দেবে যাওয়া বোমা যেমন সমস্ত তেজস্ক্রিয়তাসহ আত্মগোপন করে থাকে, নাড়াচাড়া লাগলেই বিস্ফোরিত হয়; তেমনি আমিও যতোই অতীত থেকে নিজের অস্তিত্ব টেনে আনতে চাই, কেউ হেসে, কেউ কেঁদে, কেউ ধমক দিয়ে বলতে থাকে, না না আমরা তোমাকে এক পাও নড়তে দেবো

না। অতীত অভিজ্ঞতার মৌমাছি-চক্রে তোমাকে আটকে রাখবো। অতীত এসে আগামীর পথ রোধ করে দাঁড়ায়। বুদ্ধত্ব অর্জনের পূর্ব-মুহূর্তে এমন অভিজ্ঞতা হয়েছিলো সাধক গৌতমের। ঝাঁকে ঝাঁকে মারকন্যা তাঁর চারপাশে এসে নানা ভঙ্গিমায় নৃত্য করতে থাকে। কেউ গৌতমের কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলে, আমি তোমাকে বিলাসের সমুদ্রে ভাসিয়ে নেবো; কেউ বলে, আমি ভোগ-সুখের অপরিমেয় আনন্দে ডুবিয়ে রাখবো, কেউ বলে, স্বর্ণ-সম্পদের ভাণ্ডার তোমার বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে মেলে ধরবো। তুমি আমার হও, তুমি চোখ মেলে তাকাও। গৌতমের অন্তরে ঘন হয়ে গাঢ় হয়ে নির্বাণের তৃষ্ণা জন্ম নিয়েছিলো। নির্বাণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁকে বুদ্ধত্ব অর্জনের পথে ধাবিত করে নিয়েছিলো।

সোহিনী, প্রেমও তো এক ধরনের নির্বাণ। আমি নিতান্তই সামান্য মানুষ। গৌতমের উচ্চতায় নিজেকে স্থাপন করবো, এমন ধৃষ্টতা আমার মতো তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবের কেমন করে হবে! তারপরও আমি সাহস করে বলবো, আমার চেতনায় প্রেমের কুঁড়ি ফুটি ফুটি করছে। এই প্রেমের শক্তিতেই এমন শক্তিমান হয়ে উঠেছি, মাঝে মাঝে নিজেকে তরুণ দেবতার মতো মনে হয়। আমার অতীতের দিকে আমি সাহস করে তাকাতে পারি। তার অক্টোপাস-বন্ধন ছিন্ন করে নিজেকে অনন্তের অভিমুখে ছুটিয়ে নিতে পারি। সোহিনী, তুমি ভালো করেই জানো আমার কোনো ধন-সম্পদ নেই। মা-বাবা-আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আমার কিছুই নেই। যে সজীব বন্ধন একজন মানুষকে নানা কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত করে রাখে, আমার ভাগ্য এমন ফর্সা যে তেমন কিছুই আমার জোটে নি। অতীত দিনের অর্জন বলতে আমার জীবনে যেসব নারী এসেছিলো, যারা আমাকে কাঁদিয়েছে, হাসিয়েছে, দাগা দিয়েছে, যারা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, সেই দুঃখ-সুখের স্মৃতি চক্রটুকুই শুধু আমার একমাত্র অর্জন। এতোকাল স্মৃতি নিয়েই বেঁচে ছিলাম। তোমার স্পর্শে আমার সমগ্র সত্তা জেগে উঠেছে। কাদায়-আটকানো হাতি যেমন ডাঙায় ওঠার জন্যে সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করে, আমিও সেরকম স্মৃতির জলাভূমি থেকে ছুটে বেরিয়ে আসার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি প্রাণপণ।

কাজটা সহজ নয়, সোহিনী। একজন মানুষের শরীরের একটা হাত কিংবা পা দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়ে অবশ হয়ে গেলে মানুষ যেমন স্বেচ্ছায় আপন হাতে সে অঙ্গটি কেটে বাদ দিতে পারে না, সে রকমই অতীতকে বর্তমানে টেনে তুলে তার জীর্ণ অংশ ছেঁটে ফেলাও একরকম অসম্ভব। দিব্য চেতনা অর্জন না করলে কেউ তা পারে না। আমি মনে করছি আমার হৃদয়ে প্রেম জন্ম নিয়েছে। অমৃতলোকের হাওয়া আমার মনে তরঙ্গ জাগিয়ে তুলছে, তীব্রভাবে অনুভব করছি, আমি অমৃতলোকের যাত্রী। আমার যাত্রাপথ যদি অবারিত করতে চাই, আমার জীবনে যেসব নারী এসেছিলো, চলে গিয়েছে, স্মৃতির গভীরে খনন করে তাদের লাশগুলো আমাকে বের করতে আনতে হবে। স্মৃতিকে যদি অতীত-মুক্ত না করি, বর্তমানকে ধারণ করবো কোথায়? সোহিনী, আমি জানি, আমার অনেক অশ্রু ঝরবে, বুকের ভেতর তপ্ত শোণিতের ধারা বইবে। কিন্তু উপায় কি? এই এতোগুলো নারীর স্মৃতি-ভার বুকে নিয়ে আমি তোমার দিকে অগ্রসর হবো কেমন করে?

আমি যদি নির্ভারতা অর্জন না করি, সামনে চলবো কেমন করে? তাই স্মৃতির ভাঁড়ার উন্মোচন করে এইসব নারীকে অস্তিত্বহীন করে ফেলতে চাই। তারা ভালো ছিলো কি মন্দ ছিলো, সে বিচারে আমার কাজ নেই। সবচেয়ে বড়ো কথা, তারা আমার জীবনে এসেছিলো। একেকজন একেক ধরনের বন্ধনে আমার চেতনলোক আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এখন আমি সেই বন্ধনের গিঁটগুলো খুলে ফেলতে উদ্যত হয়েছি। মনে হয়, হাতুড়ি দিয়ে পাঁজরে আঘাত হানছি। সমস্ত জীবনের অর্জিত গহন সম্পদ তছনছ করে ফেলতে যাচ্ছি। কী করবো! প্রেমপন্থের যাত্রী আমি। স্মৃতির কবর না খুঁড়লে তো আমার যাওয়া হবে না। সবকিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কেবল আমার আমিত্বটুকু নিয়েই তোমাকে অনুসরণ করতে চাই।

৩

প্রিয় সোহিনী, আমি তোমার কাছে দুরদানার কথা বয়ান করবো। তার পুরো নাম দুরদানা আফরাসিয়াব। কেমন ফার্সি কিংবা তুর্কি মনে হয় না! লোকে বলতো দুর্দান্ত খান্ডার। দুরদানার সঙ্গে খান্ডার শব্দটি বেশ মানিয়ে গিয়েছিলো। কেউ কেউ তাকে দুর্দান্ত চক্রযান বলেও ডাকতো। কারণ নাখালপাড়ার দিক থেকে দ্রুতবেগে সাইকেল চালিয়ে সে আর্ট ইনস্টিটিউটে আসতো। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে একটি উনিশ বছরের তরুণী ঢাকার রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে কলেজে আসছে-যাচ্ছে, ব্যাপারটা কল্পনা করে দেখো। দু' পাশের মানুষ হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখতো। খাইবার মেল ছবিতে পাঞ্জাবি হিরোইন নীলুর লড়াকুপনা দেখে তৃতীয় শ্রেণীর দর্শকেরা যেমন শিস্ দিতো, অশ্লীল মন্তব্য ছুঁড়ে দিতো, তেমনি সাইকেল চালানোরত দুরদানাকে দেখেও রাস্তার লোকেরা তাদের অবদমিত অনুভূতি অশালীন ভাষায় প্রকাশ করতে থাকতো। ছেমরির বুক-পাছা-নিতম্ব এসব নিয়ে সরস আলোচনার ঝড় বয়ে যেতো। পাঞ্জাবি হিরোইন নীলুর কাজ-কারবার পর্দায় সীমিত ছিলো। আর গোটা উন্মুক্ত রাজপথটাই ছিলো দুরদানার চলন ক্ষেত্র। রাজহাঁস যেমন পাখা থেকে পানি ঝেড়ে ফেলে, তেমনি দুরদানাও লোকজনের কোনো মন্তব্য গায়ে মাখতো না। স্কুলগামী ছোটো ছোটো বাচ্চারা হাততালি দিয়ে সাইকেল চালানোরত দুরদানাকে অভিনন্দন জানাতো। দুরদানা খুশি হয়ে হ্যান্ডেল থেকে দু'হাত উঠিয়ে নিয়ে শুধু পায়ে প্যাডেল ঘুরিয়ে বাচ্চাদের তাক লাগিয়ে দিতো। প্রিয় সোহিনী, আজ থেকে তিরিশ বছর আগে ঢাকার রাস্তায় এতো ভিড় ছিলো না। অনায়াসে দুরদানা স্কুলের বাচ্চাদের সাইকেলের খেলা দেখাতে পারতো।

এই দুরদানার কথা আমি প্রথম শুনেছিলাম কোলকাতায়। স্মৃতিকণা চৌধুরীর কাছে। উনিশশ' একাত্তুর সালে। তখন তো মুক্তিযুদ্ধ চলছিলো। আমরা কোলকাতায় পালিয়েছিলাম। তখন স্মৃতিকণা চৌধুরীর সঙ্গে আমার পরিচয়। উপলক্ষ বাংলা সাহিত্য। স্মৃতিকণা আমার কাছে দুরদানার কথা জানতে চেয়েছিলো। আমি চিনি না বলায় অবাক হয়ে গিয়েছিলো—ঢাকায় থাকি অথচ দুরদানাকে চিনিনে। এ কেমন করে সম্ভব! প্রথম স্মৃতিকণার কাছেই শুনেছিলাম দুরদানা কি রকম ডাকসাইটে মেয়ে। সে সাইকেল চালিয়ে কলেজে আসে। ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করতেও তার বাধে না। প্রয়োজনে ছোরাছুরি চালাতেও পারে। স্মৃতিকণার কাছে শুনে শুনে দুরদানার একটা ভাবমূর্তি আমার মনে জন্ম নিয়েছিলো। মনে মনে স্থির করে ফেলেছিলাম এই যুদ্ধ যদি শেষ হয়, ঢাকায় গিয়ে দুরদানার তত্ত্বতালাশ করবো।

কোলকাতা থেকে ফিরে একদিন সন্ধ্যায় আমি আর্ট ইনিস্ট্যুটে দুরদানার খোঁজ করতে গিয়েছিলাম। দেখা হয় নি। সেদিন দুরদানা ইনস্টিটিউটে আসে নি। আমি একজন ছাত্রকে চিনতাম। তার কাছে আমি একটা চিরকুট রেখে এসেছিলাম। কোলকাতার স্মৃতিকণার কথা উল্লেখ করে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই, একথা লিখে চলে গিয়েছিলাম। তারপরের দিনের কথা বলি। শরিফ মিয়ার ক্যান্টিনে দুপুরবেলা খেতে গিয়েছি। ক্যান্টিনে বিশেষ ভিড় ছিলো না। হুমায়ুন একটা টেবিলের সামনে ঝুঁকে পড়ে ডায়েরি থেকে কবিতা কপি করছে। আমি তার পাশে গিয়ে বসতেই সে ডায়েরি থেকে মুখ না তুলেই বললো, জাহিদ ভাই, চিৎকার করবেন না, চুপচাপ খেয়ে চলে যাবেন। আমার কবিতার মাত্রা গড়বড় হয়ে যাচ্ছে। মেলাতে পারছি না। আপনি চেল্লাতে থাকলে আমার লেখার কাজ খতম।

আমি হুমায়ুনের টেবিল থেকে উঠে এসে আরেকটা টেবিলে বসেছিলাম। তখনই চক্কর-বক্কর শার্টপরা ভদ্রমহিলাকে আমার নজরে পড়ে। ভদ্রমহিলার শার্টটা প্যান্টের ভেতর ঢোকানো। ছেলেদের মতো করে মাথার চুল ছাঁটা। গলায় মেশিনগানের গুলির খোসা দিয়ে তৈরি একখানা হার। দূর থেকে দেখলে মনে হবে ভদ্রমহিলা গলায় একটা ছোটখাটো খড়্গ ঝুলিয়ে রেখেছেন। এই হারটা না থাকলে তাঁকে আমি ছেলেই মনে করতাম। তাকে ওই বেশভূষায় দেখে আমার চোখে একটা ধাক্কা লাগলো। মনে মনে চটে উঠলাম। ভদ্রমহিলা সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য গলায় আস্ত মুক্তিযুদ্ধ ঝুলিয়ে রেখেছেন। তাঁকে ঘিরে বসে রয়েছে চারজন যুবক। এই অভিনব ফ্যাশনের স্তাবকও জুটে গেছে। যুদ্ধের রকমারি সব উপসর্গ তাতে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে নানাভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। তবে আজ যে জিনিশ দেখলাম, তখন রীতিমতো ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার যোগাড়। একটা নীরব প্রতিবাদ আমার ভেতরে জন্ম নিচ্ছিলো। আমি কাউকে কিছু না বলে শরীফ মিয়াকে খাওয়ার বিল মিটিয়ে দিয়ে মাঠে এসে বসলাম। মনে মনে বললাম, বেশ করেছি। মহিলাকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছি, যতো উগ্রভাবে তিনি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেন, মানুষও ততো বিরক্ত হয়ে তাঁকে পরিহার করতে পারে।

আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে থাকতাম। সেদিন রাতে যখন ফিরলাম বড়ো দারোয়ান হাফিজ জানালো, ছার, আপনের লগে দেখা করনের লাইগ্যা

দুরদান ছাব বইলা একজন মানুষ আইছিলো। আমি কইছি কাউলকা ছকালে আটটা নটার সমে আইলে ছারের লগে দেহা অইব। হাফিজের বাড়ি ঢাকায়। ঢাকাইয়া ভাষা টানটোন আর মোচড়সহ উচ্চারণ করে সে একটা নির্মল আনন্দ পেয়ে থাকে। চিকন-চাকন মানুষটা ভাঙা ভাঙা গলায় যখন ঢাকাইয়া বুলি ঝেড়ে দেয়, তখন হাফিজের মধ্যে একটা ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। যাহোক আমি দুরদান বলে কোনো লোককে চিনিনে।

তারপরের দিন সকালবেলা ডাইনিং হলে নাস্তা করছি, এই সময় হাফিজ এসে বললো, ছার কাউলকার হেই ছাব আইছে। আমার চা খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিলো। আমি বললাম, হাফিজ একটু অপেক্ষা করতে বলো, আমি আসছি। নাস্তার বিল মিটিয়ে হল গেটে এসে দেখি, গতকাল শরীফ মিয়ার ক্যান্টিনে যাকে দেখেছিলাম, সেই মহিলা। শুধু গলায় বুলেটের হারটি নেই। হাফিজ চোখে ঝাপসা দেখে। আমি বললাম, হাফিজ তুমি চোখে ভালো দেখতে পাও না। ইনি ছেলে নন, মেয়ে। হাফিজ ভালো করে চোখ ঘষে ভদ্রমহিলার দিকে তাকায়। তারপর বললো, হায় হায় ছাব আমারেতো মুশকিলে ফালাইয়া দিলেন, ভিতরেতো মাইয়া মাইনসের যাওনের অর্ডার নাই।

ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে কি কারণে মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ কাহিনীটা আমি শুনেছি। একজন শিক্ষক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের অসহায়ত্বের কথা চিন্তা করে তাঁর বেগমকে ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলের ওয়ার্ডেনের কাজটি দিয়েছিলো। ভদ্রমহিলাকে তাঁর আসল বয়সের তুলনায় তরুণী মনে হতো এবং চেহারায় একটা আগুনা চটক ছিলো। নতুন চাকরিতে যোগ দিয়েই তিনি একই সঙ্গে দু'জন বিদেশী ছাত্রকে ম্যানেজ করে ফেলেছিলেন। একজন মালয়েশিয়ান, আরেকজন প্যালেস্টাইনের। তাঁর চমৎকার ক্রীড়াটি অনেকদিন পর্যন্ত সুন্দরভাবে চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু একদিন গোল বাধলো। প্যালেস্টাইনের ছাত্রটি এক বিকেলবেলা অফিসের ভেজানো দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখে মালয়েশিয়ান ছাত্রটি ওয়ার্ডেনকে চুমো খাচ্ছে। এই দৃশ্য দর্শন করার পর তার রক্ত চড়চড় করে উজানে বইতে আরম্ভ করলো। সে রুমে গিয়ে ছুরি নিয়ে এসে মালয়েশিয়ানটির ওপর চড়াও হলো। আঘাতের লক্ষ্য ছিলো বুক, কিন্তু মালয়েশিয়ানটি সরে যাওয়ায় লেগেছিলো কাঁধে। তারপর থেকে হোস্টেলে কোনো মহিলা আসা নিষেধ।

গল্পটি আমরা জানতাম। হোস্টেল তৈরি হওয়ার পর থেকে যতো মজার ঘটনা ঘটেছে, তার কোনো লিখিত ইতিহাস না থাকলেও, তিন মাস বসবাস করলে সেসব না জানার উপায় থাকে না। বহুকাল আগের একটা নিয়ম আমার বেলায় এমনভাবে কার্যকর হতে দেখে আমি প্রথমত অপ্রস্তুত বোধ করলাম। দ্বিতীয়ত চটে গেলাম। অপ্রস্তুত বোধ করলাম এ কারণে যে, একজন ভদ্রমহিলার কাছে আমার মান-ইজ্জত খোয়া যাচ্ছে। তাঁকে আমি ঘরে নিয়ে যেতে পারছিনে। আরো চটলাম এ কারণে, এই বুড়ো মূর্খ দারোয়ান একটা বিষয় হিসেবের মধ্যে আনছে না, আমি সদ্য যুদ্ধফেরত একজন মুক্তিযোদ্ধা। সব জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের সুযোগ-সুবিধে আলাদা। আইনে যা থাকুক আমি একজন ভদ্রমহিলাকে আমার ঘরে নিয়ে যেতে পারবো না, তা কেমন করে হয়! কোনো

রকমের অপ্রিয় বিতণ্ডা যাতে সৃষ্টি না হয়, সেজন্য দারোয়ানকে বললাম, ঠিক আছে হাফিজ, ভদ্রমহিলা অনেক দূর থেকে এসেছেন, একবার ভেতরে ঢুকতে দাও। তবু তার গোঁ ভাঙলো না, না ছাব কানুন ভাঙ্গা যাইবো না, ওয়ার্ডেন ছাব আইনেও আওরত নিয়া ভিতরে যাইবার পারব না। ভাইস চ্যান্সেলর ছাব ভি না। আমি দেখলাম ওই ঠ্যাটা লোকটার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। আমি বললাম, তুমি ওয়ার্ডেন, ভাইস চ্যান্সেলর যার কাছে ইচ্ছে নালিশ করো গিয়ে, আমি গেস্ট নিয়ে ভেতরে গেলাম। সে বললো, না ছাব সেটাওভি অইবার পারব না। ভদ্রমহিলা যাতে ভেতরে ঢুকতে না পারেন, সেজন্য গেটে ঢোকার পথে দু'হাত বাড়িয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি ভীষণ ক্ষেপে উঠছিলাম, কিন্তু কি করবো, সেটা ঠিক করতে পারছিলাম না।

এতোক্ষণ ভদ্রমহিলা একটি কথাও বলেন নি। দাঁড়িয়ে আমাদের বিতর্ক শুনছিলেন। এইবার তিনি হঠাৎ প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে একখানা ছুরি বের করে স্প্রিংয়ে চাপ দিলেন। সাঁই করে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি ফলা বেরিয়ে ঝকঝক করতে লাগলো। দারোয়ানকে বললেন, এই বুড়া মিয়া, দেখছো এটা কি? সরে দাঁড়াও। নইলে বুকের মধ্যে বসিয়ে দেবো। দারোয়ানের মুখ থেকে 'ও বাবারে' শব্দটা আপনিই বেরিয়ে এলো এবং তার শরীর ভয়ে শিউরে উঠলো। হাফিজ মিয়া শক্ত ধাঁচের মানুষ। একটা মেয়ে মানুষ ছুরি দেখিয়ে ভেতরে ঢুকবে, তা কেমন করে হয়? তা হলে দারোয়ান হিশেবে তার মানসম্মানের কিছুই থাকে না। অল্পক্ষণের মধ্যে সামনে এগিয়ে গিয়ে দ্বিগুণ দৃঢ়তার সঙ্গে বললো, আপনি ছুরি মারবার চান মারেন মেমছাব, আমি আপনেরে ভেতরে যাইবার দিমু না। এই কথা শোনার পর দুরদানা ছুরি বন্ধ করে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো। তারপর দারোয়ানের একটা হাত ধরে এমনভাবে টান দিলো বেচারি একপাশে ছিটকে পড়ে গেলো। মহিলা সেদিকে একবারও না তাকিয়ে বললেন, জাহিদ সাহেব, চলুন আপনার ঘরটা দেখে যাই। আমি মহিলার শরীরের জোর দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। স্মৃতিকণা তাহলে তার সম্পর্কে একটা কথাও বাড়িয়ে বলে নি। হাতেনাতে প্রমাণ পেয়ে গেলাম। দারোয়ানের নিষেধ ঠেলে ভদ্রমহিলাতো আমার ঘরে এলেন। যাইহোক, এই ঘটনার জের অনেক দূর গড়িয়েছিলো। দারোয়ান রেগে-মেগে ওয়ার্ডেনের কাছে নালিশ করেছিলো। আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে, তাতে কিছু আসে যায় না। একটা আওরত শরীরের শক্তি খাটিয়ে তাকে এমন নাজেহাল করতে পারে, সেই জিনিসটিই হজম করতে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিলো। চাকরি ছেড়ে দেবে এমন ঘোষণাও সে দিয়েছিলো। সেদিনই বিকেলবেলা ওয়ার্ডেন আমার কাছে নোটিশ পাঠিয়ে জানালেন, আমাকে পত্রপাঠ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমাদের হোস্টেলের ওয়ার্ডেন দেখতে অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। কিন্তু ভেতরটা ছিলো একেবারে ফাঁকা। বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটি বাংলায় লিখতে তাঁকে তিনবার ডিকশনারি দেখতে হতো। মাতৃভাষায় যাঁর এমন অগাধ জ্ঞান, বিদেশী ছাত্রদের কাছে ইংরেজিতে চিঠিপত্র লিখে কি করে প্রশাসন চালাতেন এবং চাকরি টিকিয়ে রাখতেন, সে কথা তিনি এবং তাঁর আল্লা বলতে পারবেন। আমি বিকেল পাঁচটায় ওয়ার্ডেনের অফিসে গেলাম। তিনি আমাকে দেখামাত্রই ক্ষেপে উঠলেন, জাহিদ সাহেব, আপনি হোস্টেলে এসব কী শুরু করেছেন?

আমি বললাম, কী শুরু করেছি আপনিই বলুন! তিনি বললেন, এই হোস্টেলের রেসিডেন্ট হিসেবে আপনারই জানা উচিত এখানে কোনো মহিলার প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ। অথচ হোস্টেলের আইন ভেঙে একজন মহিলাকে আপনার রুমে নিয়ে গিয়েছেন। দারোয়ান বাধা দিলে, তাকে ছুরি দিয়ে ভয় দেখানো হয়েছে। আপনি তো আর ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র নন। হোস্টেলের বোর্ডার হিশেবে নিয়ম-কানুন আপনার জানা থাকা উচিত।

আমি বললাম, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, আমি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র নই। এখন একটা বিষয় আপনার কাছে জানতে চাইবো। ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রদের কাছে মহিলাদের যাওয়া-আসায় কোনো বাধা নেই। আমার ছাত্র জীবন শেষ হয়েছে অনেক আগে। আমার রুমে যদি একজন মহিলা আসেন, তাতে বাধা দেয়া হয়, তার কারণ কি?

ওয়ার্ডেন আবদুল মতিন বললেন, সে কথা আপনি ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবকে গিয়ে জিগ্যেস করুন। তিনিই আইন করে হোস্টেলে মহিলাদের প্রবেশ বন্ধ করেছেন। আমার কাজ হোস্টেলের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

আমি জবাবে বললাম, ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব যদি আমাকে জিগ্যেস করেন, সে কৈফিয়ত আমি তাঁকে দেবো। তিনি বললেন, তা'হলে ব্যাপারটা আপনি ভি. সি স্যারকে জানাতে বলেন? আমি বললাম, আপনার যাকে ইচ্ছে জানাতে পারেন। তারপর চলে এসেছিলাম।

তারপর থেকে দুরদানা আমার হোস্টেলে আসা-যাওয়া করতে থাকে। কেউ কিছু বলে নি। এমনকি দারোয়ান হাফিজের সঙ্গেও দুরদানা একটা ভালো সম্পর্ক করে নিয়েছে। কিভাবে সেটা সম্ভব হয়েছে, আমি ঠিক বলতে পারবো না। সে এসেই জিগ্যেস করে, কি বুড়ামিয়া কেমন আছেন? হাফিজ একগাল হেসে জবাব দেয়, মেম ছাব, ভালাই। হাফিজ পরিদর্শকের খাতাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, মেম ছাব, এইখানে আপনার একটা সাইন লাগান। দুরদানা আসার পর থেকে অন্য বোর্ডারদের রুমেও মহিলাদের আসা-যাওয়া শুরু হয়ে যায়।

মহিলাদের হোস্টেলে আসার বিধিনিষেধ উঠে গেলো এবং সে সুযোগটাকে পুরোপুরি কাজে লাগালেন স্বয়ং ওয়ার্ডেন আবদুল মতিন। কিছুদিন পর তিনি দেশের বাড়িতে গেলেন এবং এক মহিলাসহ ফিরে এলেন। পরিচয় দিলেন তাঁর স্ত্রী বলে। ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলের তার নিজের রুমটিতে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী একই সঙ্গে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। কিছুদিন পর বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ পুলিশ এসে আবদুল মতিন এবং তাঁর স্ত্রীকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেলো। তখনই আমরা আসল ঘটনাটা জানতে পারলাম। ওয়ার্ডেন স্ত্রীর পরিচয়ে যে মহিলার সঙ্গে বসবাস করছিলেন, সে মহিলা তাঁর বিয়ে করা স্ত্রী নয়। তাঁর এক মামাতো না ফুফাতো ভাই দুবাই কি কুয়েত নাকি সৌদি আরবে থাকতো, ভায়ের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মতিন তার বউটিকে ফুসলিয়ে এনে স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে হোস্টেলে একই সঙ্গে বসবাস করছিলেন। জ্ঞাতিভ্রাতা ফিরে এসে মামলা করলে পুলিশ তাদের দু'জনকে গ্রেফতার করে। ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলের ভাগ্যই এমন, ওয়ার্ডেন হিশেবে যাঁরাই এখানে আসেন, একটা-না-একটা যৌন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে যাবেনই।

৪

সেদিনই সন্ধেবেলা হোস্টেলে এসে একটা চিরকুট পেলাম। পাঠিয়েছেন মাহমুদ কবির সাহেব। তিনি বয়সে প্রবীণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকদের একজন। আমাদের মতো তরুণদের সঙ্গে মেলামেশা করেন বলে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বদনাম। অনেক বুড়ো বুড়ো শিক্ষকদের বলতে শুনেছি ড. মাহমুদ কবির চ্যাঙড়া পোলাপানদের আশকারা দিয়ে দিয়ে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন, প্রবীণ শিক্ষকদের মান-ইজ্জত নিয়ে চলাফেরা করা একরকম দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমরা পাঁচ-সাত বছর ধরে মাহমুদ সাহেবের বাড়িতে আসা-যাওয়া করছি। তাঁর কখনো চিরকুট পাঠিয়ে কাউকে বাড়িতে ডাকতে হয়েছে, এমন সংবাদ আমার জানা নেই। আমি একটুখানি চিন্তিত হলাম। নিশ্চয়ই কোনো জরুরি ব্যাপার। জামা-কাপড় ছেড়ে গোসল করে ফেললাম। গোসল করার পর বেশ ঝরঝরে বোধ করতে থাকি। তখুনি পেটের খিদেটা টের পেলাম। ড. মাহমুদ সাহেবের বাড়িতে যাওয়ার আগে কিছু খেয়ে নেয়া প্রয়োজন। ক্যান্টিনে গিয়ে দেখলাম, চা-টা ছাড়া খাওয়ার মতো কিছু নেই। অগত্যা শরিফ মিয়ার ক্যান্টিনে যেতে হলো। একটা একটা করে চারটে সিঙারা খেয়ে ফেললাম। চায়ে মুখ দিয়েছি, এমন সময় দেখতে পেলাম হুমায়ুন কোণার দিকের টেবিলটাতে বসে ঘুসুর-ঘুসুর করে মজিদ মামার সঙ্গে কথা বলছে। মজিদ মামা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নন। কখনো ছাত্র ছিলেন কি না, তাও আমার জানা নেই। সব সময় একখানা সাইকেল নিয়ে ঘোরাফেরা করেন। পাজামার সঙ্গে তিন দিকে পকেটঅলা হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত একটা নকশা আঁকা শার্ট পরেন। সবসময়ে ওই পোশাকেই তাঁকে দেখে আসছি। তিনি শার্টের গভীর পকেট থেকে পানের ছোটো ছোটো বানানো খিলি বের করে মুখের ভেতরে পুরে নেন। তাঁর পান খাওয়ার একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে। ঠোঁট ফাঁক না করেই তিনি পানটা চিবিয়ে কিভাবে হজম করে ফেলেন, সেটা আমার কাছে একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। অতিরিক্ত পান খাওয়ার জন্য তাঁর বড়ো বড়ো দাঁতগুলো গ্যাটগেটে লাল দেখাতো। প্রথম যেদিন মজিদ মামার সঙ্গে হুমায়ুন পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো তাঁর লাল লাল দাঁতগুলোই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। আমি ভীষণ রকম অস্বস্তি বোধ করেছিলাম। মজিদ মামা কোথায় থাকেন, কি করেন এবং হুমায়ুনের কি ধরনের মামা, এসব কিছুই জানতাম না। হুমায়ুন মামা ডাকতো, আমরাও মামা ডাকতাম। দিনে দিনে মজিদ আমাদের অনেকেরই কমন মামা হিশেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।

আমি বিল পরিশোধ করে বাইরে এসে দেখি, আমার পেছন পেছন হুমায়ুন এবং মজিদ মামাও বাইরে চলে এসেছেন। হুমায়ুন আমাকে জিগ্যেস করলো, জাহিদ ভাই কোথায় যাচ্ছেন ? আমি বললাম, যাচ্ছি এক জায়গায়। একটু বসবেন ? আমি বললাম, না, আমার কাজ আছে। আমি দেখলাম হুমায়ুন মজিদ মামার সাইকেলের পেছনে বসে শাহবাগের দিকে কোথায় চলে গেলো। নীলক্ষেতের অপরূপ সন্ধে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই কেশবতী সন্ধে আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলো, মনে হচ্ছিলো, আমি শান্তি সরোবরের ওপর দিয়ে হাঁটাচলা করছি। কলাভবনের চারপাশে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়ালাম। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া আবছা অন্ধকারে গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পত্র পল্লবের মধ্যে বিধাতার আশীর্বাদের মতো শান্তি স্থায়ী নীড় রচনা করে আছে। গুরু দুয়ারার ভেতর থেকে শিখ পুরোহিতের কণ্ঠের ভজনের ধ্বনি ভেসে আসছে। প্রার্থনার ভাষা এতো সুন্দর! আপনা থেকেই আমার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। আমি গুরু দুয়ারার পেছনে শিশু গাছটির গোড়ায় বসে পড়লাম এবং অনেকক্ষণ ধরে ভজন শুনলাম। ভজন থেমে যাওয়ার পরও সেই স্তব্ধতার মধ্যে চুপ করে বসে রইলাম। আমার মনে হচ্ছিলো অতল স্তব্ধতার ভেতর থেকে জাগ্রত প্রার্থনার ভাষা ছাড়া জীবনের জন্য অন্য কোনো সত্য বস্তু নেই।

এক সময়ে আমাকে উঠতে হলো। ড. মাহমুদ কবিরের বাড়ির দরোজার বেল টিপলাম। তাঁর সব সময় মুখ হাঁ-করে-থাকা কাজের লোকটা বাঁ দিকের দরোজাটা খুলে দিলো। সামনের দরোজাটা বরাবরের মতো আজো তালা আটকানো। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পঁচিশে মার্চের ক্র্যাকডাউনের পর থেকেই সামনের দরোজায় তালা আটকানোর রেওয়াজ চালু হয়েছে। সামনের দরোজার তালা আটকানো মানে কেউ বাড়িতে নেই। এখন বাড়িতে সবাই থাকলেও সামনের দরোজার তালা বিদেয় নেয় নি। তার মানে বাড়ির মানুষদের মানসিক ভীতি এবং অনিশ্চয়তার অবসান হয় নি। আমি ভেতরে ঢুকে দেখলাম ড. মাহমুদের বাড়িতে অনেক মানুষ। তিনি আজ বিকেলবেলা দাড়ি কাটেন নি। তাঁর ফরসা মুখমণ্ডলে রসুনের শেকড়ের মতো অজস্র দাড়ি অঙ্কুর মেলেছে। তিনি গড়গড়া টানছিলেন। সবাই মিলে কি নিয়ে আলোচনা করছিলেন বুঝতে পারলাম না। আমাকে দেখামাত্রই ড. মাহমুদ কবির উত্তেজনার তোড়ে একরম উঠে দাঁড়ালেন। গড়গড়ার নলটা হাত থেকে নিচে পড়ে গেলো। কোনো রকম ভূমিকা না করেই তিনি বলে বসলেন, তোমার সাহস তো কম নয় হে ছোকরা! তিনি কোথায় কেমন করে আমার সাহসের পরিচয় পেলেন, বুঝতে পারলাম না। আমি জিগ্যেস করলাম, স্যার আমার অপরাধ কি ? আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, কারণ বসবার জায়গাগুলো অন্য সবাই আগে থেকেই দখল করে আছেন। কেউ আমাকে বসবার জায়গা করে দিলেন না। তিনি গড়গড়ার নলটা কুড়িয়ে নিয়ে টান দিয়ে দেখেন তামাক পুড়ে শেষ। কড়া স্বরে আকবর বলে ডাক দিলেন। সেই মুখ-হাঁ-করা মানুষটা সামনে এসে দাঁড়ালে কল্কিটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, তামাক লাগাও। ড. মাহমুদ যেভাবে তামাক এবং চা দেয়ার জন্য হুঙ্কার ছেড়ে কাজের মানুষটিকে ডাক দিয়ে বীরত্ব প্রকাশ করেন, তার সঙ্গে সেনা প্যারেডের কম্যান্ডিং অফিসারের অনায়াসে তুলনা করা যায়। আকবর ফুঁ দিতে

দিতে কল্কিটা হুঁকোর ওপর বসিয়ে দিতেই তিনি লম্বা করে ধোঁয়া ছড়ালেন, তারপর বললেন, সবাই বলছে তুমি ইউনুস জোয়ারদারের ডাকু বোনটির সঙ্গে যত্রতত্র ঘোরাফেরা করছো। ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলের ওয়ার্ডেন আজ সকালবেলা মর্নিং ওয়াকের সময় আমাকে বলেছেন তুমি দুরদানা না ফুরদানা সেই গুণ্ডা মেয়েটিকে নিয়ে দারোয়ানকে ছুরি মারার ভয় দেখিয়েছো। ওয়ার্ডেন মতিন তোমাকে সতর্ক করার জন্য ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তুমি উল্টো তাঁকে হুমকি দিয়েছো। ব্যাপারটা ভাইস চ্যান্সেলরের কান পর্যন্ত এসেছে। তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত। ওই গুণ্ডা মেয়েকে নিয়ে ঘোরাফেরা করলে তুমি তো বিপদে পড়বেই এবং যাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে, তাদের সবাইকেও বিপদে ফেলবে। ওই মেয়ের ভাই ইউনুস জোয়ারদার একজন সন্ত্রাসী, খুনি। সে সব জায়গায় মানুষ খুন করে বেড়াচ্ছে। বোনটাও ভাইয়ের মতো সাংঘাতিক। শুনেছি সবসময় সে ছুরি-পিস্তল সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তুমি নিরীহ মানুষের সন্তান, তুমি কেনো ওসবের মধ্যে নিজেকে জড়াবে! মুজিব সরকার ইউনুসকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে, জানো!

ড. মাহমুদ হুঁকোয় টান দেয়ার জন্য একটু বিরতি দিলেন। ওই ফাঁকে মওলানা হান্নান কথা বলতে আরম্ভ করলো। বলা বাহুল্য সে পাজামা-পাঞ্জাবির বদলে হাফহাতা শাদা হাওয়াই শার্ট এবং প্যান্ট পরে এসেছে। মওলানা হান্নান যখন একটানা কথা বলে, তার গলা থেকে একটা চিঁহি জাতীয় আওয়াজ বের হয়। সেটাকে মনুষ্য-মুখ-নিঃসৃত ধ্বনি বলে মেনে নিতে অনেকেরই আপত্তি হবে। হান্নান সেই চিঁহি স্বরেই বলে যেতে থাকলো, আমি নিজের চোখেই দেখেছি বলাকা সিনেমার কাছে ওই মেয়েকে বদমাশ পোলাপানরা চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছিলো। তাদের ইচ্ছে ছিলো তার শরীর থেকে প্যান্ট-শার্ট খুলে নিয়ে উদোম করে ছেড়ে দেবে। মেয়েটি পকেট থেকে পিস্তল বের করে ওপর দিকে গুলি ছুঁড়েছিলো। ভয় পেয়ে সবাই সরে দাঁড়ালে এক ফাঁকে মেয়েটি বেবিট্যাক্সিতে চড়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিলো। কিন্তু তার জামা-কাপড় সব ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলেছিলো। দুরদানার ভয়ঙ্করী মূর্তির একমাত্র চাক্ষুস সাক্ষী মওলানা হান্নান। সে যখন বলাকা সিনেমার ঘটনাটা বয়ান করছিলো, তার চোখের মণি দুটো কোটর থেকে একরকম বেরিয়েই আসছিলো।

দেখা গেলো উপস্থিত ভদ্রলোকদের প্রায় সবারই দুরদানা সম্পর্কে বলার মতো একেকটা গল্প জমা হয়ে আছে। ইংরেজি বিভাগের কামরুল চৌধুরী বললেন, তিনি শুনেছেন ওই মেয়েটি ছেলেদের কাঁধে হাত দিয়ে পথে-ঘাটে ঘুড়ে বেড়ায়। গুণ্ডা-বদমাশের মতো শিস দেয়। একটা মেয়ে ওইভাবে এমন বেপরোয়াভাবে যদি ঘুরে বেড়ায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ম-শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে না। নৈতিকতার প্রশ্নটিও তিনি টেনে আনলেন। আরেকজন বললেন, এই মেয়েটা এক সময় সর্বনাশ ডেকে আনবে। তাঁর কাছে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে, মেয়েটি সন্ত্রাসীদের চর। তার মাধ্যমেই ভূতলবাসী সন্ত্রাসীরা একে অন্যের কাছে খবর-বার্তা পাঠিয়ে থাকে। তাদের অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ লুকিয়ে রাখার দায়িত্বও দেয়া হয়েছে তার ওপর।

ড. মাহমুদের বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মনোভাব নিয়ে আমি ফিরলাম। দুরদানা সম্পর্কে যেসব কথা শুনলাম, তাতে করে তাকে একজন দেবী চৌধুরানী জাতীয় নায়িকা বলে মনে হচ্ছিলো। ওই রকম অঘটনঘটনপটিয়সী, দুর্দান্ত সাহসী একজন তরুণীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, এটাকে আমি ভাগ্যের ব্যাপার বলেই ধরে নিলাম। তাঁদের কথাবার্তা থেকে যে জিনিসটি বেরিয়ে এসেছে তার মধ্যে দোষের কোনো কিছুই খুঁজে পাই নি। বরঞ্চ আমার মনে হয়েছে, দুরদানা এক অসাধারণ তরুণী। যে মেয়ে একদল বদমাশের ভেতর থেকে শুধু রিভলবারের একটা আওয়াজ করে বেরিয়ে আসতে পারে, তার হিম্মতের তারিফ করার বুকের পাটা কারো নেই। তাঁরা যেগুলোকে দোষের বিষয় বলে বয়ান করলেন, আমি সেগুলোকে গুণ বলে মনে করলাম। এতোক্ষণ ড. মাহমুদের বাড়িতে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের মুখ থেকে দুরদানা সম্পর্কিত যে অপবাদ আমাকে শুনতে হলো, সেগুলোকে আমি কর্তৃত্বপ্রয়াসী কতিপয় ঝুনো পণ্ডিতের নিছক অক্ষম কাপুরুষতা বলে ধরে নিলাম।

ড. মাহমুদের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর আমি যেনো দুরদানা সম্পর্কে নতুন একটা দিব্যদৃষ্টি লাভ করলাম। মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমার নতুন জন্ম হয়েছে। আমি অনেক তথাকথিত পবিত্র মানুষের লোভ-রিরংসা একেবারে চোখের সামনে বীভৎস চেহারা নিয়ে জেগে উঠতে দেখেছি। আবার অত্যন্ত ফেলনা তুচ্ছ মানুষের মধ্যেও জ্বলন্ত মনুষ্যত্বের শিখা উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠতে দেখেছি। আমার চেতনার কেন্দ্রবিন্দুটিতে এমন একটা চুম্বকক্ষেত্র তাপে-চাপে তৈরি হয়ে গেছে, সামান্য পরিমাণে হলেও খাঁটি পদার্থ দেখতে পেলে মন আপনা থেকেই সেদিকে ধাবিত হয়। গতানুগতিক নারীর বাইরে দুরদানার মধ্যে আমি এমন একটা নারী সত্তার সাক্ষাৎ পেলাম, সর্বান্তঃকরণে তাকে আমাদের নতুন যুগের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করতে একটুও আটকালো না। দুরদানা যখন সাইকেল চালিয়ে নাখালপাড়া থেকে আর্ট ইনস্টিটিউটে আসতো, আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতাম। আমার মনে হতো দুরদানার প্রতিটি প্যাডেল ঘোরানোর মধ্য দিয়ে মুসলিম সমাজের সামন্ত যুগীয় অচলায়তনের বিধি-নিষেধ ভেঙে নতুন যুগ সৃষ্টি করছে। সেই সময়টায় আমরা সবাই এমন একটা বদ্ধ গুমোট পরিবেশের মধ্যে বসবাস করছিলাম, অনেক সময় নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনেও আতঙ্কে চমকে উঠতে হতো। আমরা পাকিস্তানের আতঙ্ক-রাজ্যের অস্তিত্ব গুঁড়িয়ে দিয়ে নিজেরা সজ্ঞানে-স্বেচ্ছায় আরেকটা আতঙ্ক-রাজ্য কায়েম করে তুলেছিলাম। আমাদের জনগণের রক্ত থেকে, মৃত্যু থেকে, আমাদের মুক্তি সেনানীদের মৃত্যুঞ্জয়ী বাসনার উত্তাপ থেকে রাতারাতি কী করে কখন আরেকটা কারাগার আমাদের জাতীয় পতাকার ছায়াতলে তৈরি করে নিলাম, নিজেরাও টের পাই নি। আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের সম্মোহন-মন্ত্রে স্বর্গাদপি গরিয়সী মাতৃভূমিটির যে উদার গগনপ্রসারী ছবি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতাম, সেই প্রয়াস বার বার ব্যর্থ হয়ে যেতো। দৃষ্টির সামনে বার বার একটা খাঁচা তার চারদিকের দেয়ালের সোনালি কারুকাজসহ দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। এই খাঁচার ভেতরেই আমাদের বসবাস। এখানে সবকিছু বিকলাঙ্গ, সবকিছু অসুস্থ, অস্বাস্থ্যকর। এই পরিবেশে, এই পরিস্থিতিতে একজন তরুণী সমস্ত বাধা-নিষেধ

অস্বীকার করে প্রবল প্রাণশক্তির তোড়ে চারপাশের সমস্ত কিছু একাকার করে ফেলতে চাইছে, আমি একে জীবনের স্বাধীনতা সৃষ্টির একটা মহৎ প্রয়াস বলে ধরে নিলাম। লোকে দুরদানা সম্পর্কে যতো আজে-বাজে কথা বলুক না কেনো, সেগুলোকে আমি জমাট-বাঁধা কাপুরুষতা ছাড়া কিছুই মনে করতে পারলাম না। বিকৃত রুচির কিছু মানুষ যেমন এলিজাবেথ টেলর কিংবা সোফিয়া লোরেনের ছবি সামনে রেখে গোপনে মাস্টার্বেশন করে আনন্দ পায়; দুরদানা সম্পর্কে রটনাকারীদেরও তাদের সমগোত্রীয় বলে ধরে নিলাম। মাঝে মাঝে মনে হতো যুগের প্রয়োজনে এই মেয়ে পাতাল-ফুঁড়ে গোঁড়া মুসলমান সমাজে আবির্ভূত হয়েছে। সে যদি শাড়ি-ব্লাউজের বদলে প্যান্ট-শার্ট পরে বেড়ায়, তাতে কি হয়েছে? তুচ্ছ গয়নাগাটির বদলে ছুরি-পিস্তল নিয়ে যদি ঘোরাঘুরি করে, সেটা অনেক বেশি শোভন, অনেক বেশি মানানসই।

আমি দুরদানার দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়লাম। ঝুঁকে পড়লাম তার প্রেমে পড়েছি বলে নয়। তার মধ্যে প্রাণশক্তির সবল অঙ্কুরণ দেখে তার প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। লোকে তার নামে যা-তা বলে বেড়ায়, কারণ সে অন্য রকম। কেউ কখনো বলতে পারে নি সে পুরুষ মানুষের সঙ্গে ক্লাবে গিয়ে মদ খেয়ে কখনো মাতাল হয়েছে, টাকা নিয়ে কোনো ধনী ব্যক্তির অঙ্কশায়িনী হয়েছে, কিংবা প্রেমের ছলনা করে সাত-পাঁচটা পুরুষ মানুষকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে বেড়িয়েছে। লোকে তার নিন্দে করতো, কারণ সে ছিলো একান্তভাবে সুস্থ এবং স্বাভাবিক। একদিন তার বাবা যখন বললেন, কলেজে আসা-যাওয়ার রিকশা ভাড়া দেয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই, তখন সে সাইকেল চালানো শিখে নিয়ে একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড সাইকেল জোগাড় করে রিকশা ভাড়ার সমস্যার খুব একটা সহজ সমাধান করে নিলো। একা একটা মেয়েকে সাইকেলে চলাচল করতে দেখলে সময়-অসময়ে বখাটে ছেলেরা তার ওপর চড়াও হতেও দ্বিধা করতো না। এই রকম উৎপাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সম্প্রতি সে নিজের সঙ্গে একটা চাকু রাখতে আরম্ভ করেছে। সাইকেল চালাতে গিয়ে একদিন সে আবিষ্কার করলো শাড়ি পরে সাইকেল চালাতে বেশ অসুবিধে হয়। সে শাড়ির পাট চুকিয়ে দিয়ে প্যান্ট-শার্ট পরতে আরম্ভ করলো।

তার ভাই চরমপন্থী রাজনীতি করতো। রাজরোষ তার মাথার ওপর উদ্যত খড়্গের মতো ঝুলছিলো। সরকার তার মাথার ওপর চড়া দাম ধার্য করেছে। এমন ভায়ের বোন হিসেবে তার লুকিয়েচুপিয়ে থাকা উচিত ছিলো। কিন্তু দুরদানা সে অবস্থাটা মেনে নেয় নি। ভাইয়ের বিপ্লবী রাজনীতি সম্বন্ধে তার অপরিসীম গর্ববোধ ছিলো। তাই সবসময় সে মাথা উঁচু করে বেড়াতো। আমাদের সমাজে এই এতোখানি স্বাভাবিকতা সহ্য করার খুব বেশি মানুষ ছিলো না। কেউ কেউ তাকে পথেঘাটে আক্রমণ করতো। যারা তারা ওপর হামলা করতো দুরদানা তাদের কোনো ক্ষতি করে নি। যারা তার নামে নানা রকম অশ্লীল গল্প রটিয়ে বেড়াতো, তাদের যৌন-যন্ত্রটা আসল জায়গার বদলে মগজের গভীর প্রদেশে অবস্থান করতো বলে এমন সুন্দর কাহিনী তারা অনায়াসে রচনা করতে পারতো।

দুরদানা আমার ঘরে এসেছে, দারোয়ান হোস্টেলে ঢুকতে বাধা দিয়েছে, সে পকেট থেকে ধারালো চাকু বের করে দারোয়ানের ভূঁড়ি ফাঁসিয়ে দিতে গিয়েছিলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব দারোয়ান একজোট হয়ে ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে বিচার দাবি করেছে এবং ভাইস চ্যান্সেলর আমাকে ডেকে কড়া কৈফিয়ৎ তলব করেছে, এইসব খবর গোটা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বোমা ফাটানোর মতো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। আমি খুব অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম আর্ট ইনস্ট্যুটে দুরদানা নামে এক ডাকাবুকো মহিলা আছে এবং সে সব ধরনের অকাণ্ড ঘটিয়ে তুলতে ওস্তাদ, একথা আমি ছাড়া সবাই জানে। ঘটনাটি মওলানা হান্নানকে কি রকম বিচলিত করে তুলেছিলো তার উল্লেখ করছি। অবশ্য তার আগে মওলানা হান্নানের বিষয়ে একটা ধারণা দেয়া প্রয়োজন। হান্নান সম্প্রতি ইসলামিক স্টাডিজের লেকচারারের চাকরি পেয়েছে। সে শাদা পাঞ্জাবি-পাজামা পরে ক্লাস করতে আসতো এবং দাড়ি রাখার একটা নতুন স্টাইল সৃষ্টি করেছিলো। কানের নিচে থেকে শুরু করে থুঁতনি হয়ে কানের অপর অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো দাড়িতে তাকে ভালো কি খারাপ দেখাতো, সেটা বড়ো কথা নয়, কিন্তু চোখে পড়তো।

রোদ বৃষ্টি থাকুক-বা-না-থাকুক সব সময় ছোটো ছাতাটা মাথার ওপর মেলে ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতো। সে সময় গোল টুপিটা মাথার বদলে শোভা পেতো হাতে। তার সম্পর্কে আরেকটি মজার সংবাদ হলো, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার পর পাজামা-পাঞ্জাবি বদলে শার্ট-প্যান্ট পরতো। আমরা তাকে নিয়ে নানারকম মজা করতাম। আমাদের ঠাট্টা-তামাশা সে গায়ে মাখতো না। আমরা জিগ্যেস করতাম, মওলানা তুমি এরকম করে দাড়ি ছেঁটেছো কেনো ? হান্নান গম্ভীর হয়ে জবাব দিতো, চাঁদ হলো ইসলামের চিহ্ন। তাই আমার দাড়ি আমি আলহেলালের মতো করে রেখেছি। মওলানা হান্নানের এরকম অনেক ব্যাপার ছিলো, যেগুলো চট করে চোখে পড়ে যেতো।

ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে বুড়ি বুড়ি শিক্ষিকাদের রুমে রুমে গিয়ে গল্প করতে সে খুব পছন্দ করতো। সেদিকে ইঙ্গিত করে কোনো কিছু বললে, পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে জবাব দিতো, না না, বেআইনি কিছু নয়। গুলশান আপার সঙ্গে আমি ধর্ম এবং দর্শনের কিছু সমস্যার কথা আলোচনা করে আনন্দ পেয়ে থাকি। তার মুখে একটা লজ্জার ছোঁয়া লাগতো। সেটা চাপা দেয়ার জন্যে 'গুলশান আপার ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কতো অগাধ জ্ঞান' বলে একটা নাতিদীর্ঘ লেকচার দিয়ে বসতো।

হান্নান এক শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের সামনে আমাকে আটক করে বসলো। সে জুমার নামাজ আদায় করে মসজিদ থেকে বেরিয়েছে। আমি তাকে পাশ কাটিয়ে চলে আসছিলাম। হান্নান আমার কলার ধরে হিড় হিড় করে ছাতিম গাছের গোড়ায় টেনে নিয়ে গেলো। আমি আশঙ্কা করছিলাম, হান্নান শুক্রবারে জুমার নামাজ পড়ার ফজিলত সম্পর্কে কিছু হেদায়েত করবে। আমিও একটু ভড়কে গিয়েছিলাম। সে আজ পাঞ্জাবির ওপর আচকান চাপিয়েছে, চোখে সুরমা, কানে আতর মাখানো তুলো গোঁজা। সব মিলিয়ে একটা পবিত্র পবিত্র ভাব। এই বিশেষ সাজ-পোশাকে আমার সঙ্গে যদি

গুলশান আপার সঙ্গে যেমন করে, সেরকমভাবে ধর্মতত্ত্বের আলোচনা শুরু করে, আমি বেকায়দায় পড়ে যাবো। তাই তাড়াতাড়ি কাট মারার জন্যে বললাম, হান্নান, কি বলবার আছে তাড়াতাড়ি বলো, খিদেয় প্রাণ বেরিয়ে আসছে। হান্নান আমার কথা গ্রাহ্যই করলো না। জামার কলারটা ভালো করে চেপে ধরে বললো, জাহিদ তোমার কাজটা বেআইনি হচ্ছে। আমি বললাম, বেআইনি কাজ তো তুমিই করো। গুলশান আপার মতো মডার্ন মহিলার সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের আলোচনা করাটা হলো দুনিয়ার সবচাইতে বেআইনি কাজ। হান্নান আমার কথা মোটেই আমল না দিয়ে মুখ গম্ভীর করে বললো, আমি জানি তুমি দুরদানা বেগমের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আসছো। আমি বললাম, আড্ডা দিয়ে আসছি ভালো করেছি, তুমি জানলে কি করে ? সে বললো, শাহবাগ থেকে আসার সময় তোমাদের দু'জনকে দেখেছি। আমি বললাম, দেখেছো বেশ করেছো। মওলানা তুমি মিছেমিছি নামাজ পড়লে। আল্লাহ তোমার জুমার নামাজ কবুল করবে না। তুমি নামাজ পড়তে পড়তে কোন্ ছেলে কোন্ মেয়ের সঙ্গে কি করলো এসব কথা চিন্তা করেছো। কলার ছাড়ো, আমি যাই।

মওলানা হান্নানের মুখের ভাবে একটা পরিবর্তন এলো, জাহিদ, আমি তোমার ভালোর জন্যেই বলছিলাম, দুরদানা বেগমের সঙ্গে তোমার মেলামেশা ঠিক হচ্ছে না। কথাটা শুনে চটে উঠলাম, হান্নান, হঠাৎ করে আমার ভালো-মন্দ নিয়ে তুমি এমন আগ্রহী হয়ে উঠলে কেন ? সে বললো, আহা তাই চটো কেন ? দুরদানা বেগম একটা বিপজ্জনক মহিলা। সে প্যান্ট-শার্ট পরে, গলায় মেশিনগানের বুলেটের হার ঝোলায়, পকেটে এই এ্যাত্তোবড়ো চাকু রাখে, ব্যাটাছেলেদের কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলে, ভুস ভুস ধোঁয়া ছেড়ে সিগারেট খায়, আর সাইকেলে চড়ে যেখানে-সেখানে চলে যায়। বন্ধু হিসেবে বলছি, এই রকম মেয়েছেলের সঙ্গে চলাফেরা করলে তোমার নামে কলঙ্ক রটে যাবে। তার অনেক খবর আমি রাখি। তবে একটা কথা তোমাকে বলি, দুরদানা সত্যিকার মেয়েছেলে কিনা আমার সন্দেহ আছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিলো দুরদানাকে গিয়ে ডেকে আনি এবং বলি, দুরদানা, তোমার ছুরিখানা মওলানা হান্নানের থলথলে ভুঁড়িটার মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। সেটি যখন আপাতত সম্ভব হচ্ছে না হান্নানের সঙ্গে রসিকতা করার ইচ্ছেটাই আমার প্রবল হয়ে উঠলো। আমি জিগ্যেস করলাম, মওলানা, দুরদানা যে মেয়ে না, কি করে তোমার এ সন্দেহ জন্মালো ? হান্নান কানে গোঁজা আতর মাখানো তুলোর টুকরোটি বের করে নিয়ে আমার নাকে চেপে ধরলো। তারপর বললো, শুঁকে দেখো, গন্ধ কেমন। উৎকট বোঁটকা গন্ধে আমার কাশি এসে গেলো। সেদিকে খেয়াল না করেই বললো, মেয়ে মানুষের হওয়া উচিত এই আতরের গন্ধের মতো এবং আরো হওয়া উচিত মাখনের মতো তুলতুলে নরোম। যে মেয়েমানুষ প্যান্ট-শার্ট পরে, সিগারেট খায়, ব্যাটাছেলের কাঁধে হাত দিয়ে চলাফেরা করে, যখন-তখন সাইকেলে চড়ে জায়গা-অজায়গায় যাওয়া-আসা করে, তার মধ্যে মেয়েমানুষের কি থাকে ? আমার কথাগুলো তুমি একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখো। আমি বললাম, মওলানা আতরের ঘ্রাণের মতো, মাখনের মতো তুলতুলে মেয়ে মানুষের কথা তুমি এবাদত করার সময় চিন্তা করতে থাকো, আল্লাহ মেহেরবান, মিলিয়েও দিতে পারেন। আমি চললাম। রাগে-ক্ষোভে হান্নানের ছাতিটা দশ হাত দূরে ছুঁড়ে দিয়ে আমি চলে এসেছিলাম।

হান্নান মওলানার কবল থেকে রেহাই পেয়ে আমি তো হোস্টেলে এলাম। কিন্তু তারপর থেকে আমার মনে একটা চিন্তা জন্ম নিলো। মওলানার জগৎ, বিশ্ববিদ্যালয়, মসজিদ, বাসা এবং নিউমার্কেটের কাঁচাবাজার—এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ দুরদানা সমস্ত সংবাদ তার নখদর্পণে। আমি দু'পায়ে সমস্ত ঢাকা শহর চষে বেড়াচ্ছি কিন্তু দুরদানার বিষয়ে কোনো কিছু জানিনে। নিজের সম্পর্কে একটা ধারণা ছিলো। সেটা ভেঙে গেলো। নিজের ওপর চটে গেলাম। সেদিন দুপুরে খাওয়ার পর সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। কখন রাজ্যের ঘুম এসে আমার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে ফেললো, টেরই পাই নি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা বিদঘুটে স্বপ্ন দেখলাম। আমি একটা মোটরযানের ওপর চড়েছি। গাড়ি, ট্রাক, পিকআপ, এমনকি জিপের সঙ্গেও যানবাহনটির তুলনা চলে না। বাইরে থেকে দেখলে অনেকটা মিলিটারি ট্যাঙ্কের মতো দেখায়। কিন্তু ভেতরের আসন ইত্যাদি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। এই যন্ত্রযান তীব্রবেগে সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, শহরের বাঁধানো রাজপথ দিয়ে যানটা চলছে না। ঘরবাড়ি ইলেকট্রিক পোস্ট সবকিছু তছনছ করে অত্যন্ত মসৃণ গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর একজন মহিলা ডান হাতে স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাচ্ছে এবং বাম হাতে সিগারেট টানছে। ভদ্রমহিলার চেহারা ভালো করে চোখে পড়ছে না। আমি শুধু তার মুখের একটা অংশ দেখতে পাচ্ছি। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ঘুম ভেঙে গেলো। জেগে ওঠার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত ইঞ্জিনের ভন ভন শব্দ আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো। ক্রমাগত নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগলাম, এরকম একটা উদ্ভট স্বপ্ন দেখলাম কেনো!

৫

দু'দিন বাদে হুমায়ুন শরীফ মিয়ার ক্যান্টিনে আমাকে পাকড়াও করে বললো, জাহিদ ভাই, আপনার সঙ্গে কথা আছে। আমি বললাম, বলে ফেলো। হুমায়ুন বললো, আপনি চা-টা শেষ করুন, এখানে বলা যাবে না। আমি জিগ্যেস করলাম, ভালো, না খারাপ কথা। হুমায়ুন বললো, সে আপনি পরে বিবেচনা করবেন। তারপর সে আমাকে রমনা রেসকোর্সের এক কোণায় নিয়ে গেলো। হাজি শাহবাজের মসজিদের উত্তর দিকের ঝাঁকড়া বিলেতি গাব গাছটার গোড়ায় গিয়ে পা ছড়িয়ে বসলো। আমাকেও বললো, জাহিদ ভাই, বসুন। তার কথামতো আমিও বসে পড়লাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না, হুমায়ুনের এমন কি গোপন কথা থাকতে পারে বলার জন্যে এতোদূরে এই নির্জন

গাছতলায় টেনে নিয়ে আসার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। হুমায়ুন বললো, আমাকে একটা স্টার সিগারেট দেন। প্যাকেট খুলে একটা নিজে ধরালাম, আরেকটা ওকে ধরিয়ে দিলাম। হুমায়ুন সিগারেটে লম্বা করে টান দিলো, তারপর নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললো, জাহিদ ভাই, আপনাকে একটা ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দেয়ার জন্যে এই এতোদূরে নিয়ে এসেছি। আমি বললাম, আমি কি তোমার কোনো ক্ষতি করেছি? হুমায়ুন বললো, আপনি সবসময় আমার উপকারই করেছেন। কিন্তু আপনি নিজের ক্ষতি করতে যাচ্ছেন। আমি একটুখানি চমকে গিয়ে বললাম, আমি নিজের ক্ষতি করতে যাচ্ছি! কিভাবে? হুমায়ুন বললো, দুরদানার সঙ্গে আপনি ইদানীং খুব ঘোরাঘুরি করছেন, কাজটা ভালো হচ্ছে না। আমি বললাম, বুঝিয়ে বলো, কেনো ভালো হচ্ছে না। হুমায়ুন বললো, মহিলা অসম্ভব রকম ড্যাঞ্জারাস। আমি বললাম, ড্যাঞ্জারাস মহিলাদের আলাদা আকর্ষণ আছে, সেকথা চিন্তা করে দেখেছো? আপনি রসিকতা করে উড়িয়ে দিতে চাইছেন, কিন্তু জিনিসটি খেলা নয়, তার স্বরে একটা চাপা উত্তেজনার আভাস। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করলাম। হুমায়ুনের মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। সে বলতে থাকলো, জানেন, আমরা আপনাকে কি রকম শ্রদ্ধা করি, আপনাকে এমন কাজ করতে দিতে পারিনে, যাতে সে শ্রদ্ধার ভাবটি চলে যায়। একটুখানি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। হুমায়ুন কি বলতে চাইছে, সেটাই আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হচ্ছিলো না। আমি বললাম, তোমরা শ্রদ্ধা করো, ঘৃণা করো, সে তোমাদের ব্যাপার। আমি তোমাকে বলিনি যে আমাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। আর যদি শ্রদ্ধাই করো, তোমাকে খুলে বলতে হবে, কি কারণে সেটা চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। হুমায়ুন বললো, আপনি দুরদানার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবেন না। আমি বললাম, কেন রাখবো না, সেটা বুঝিয়ে বলতে হবে। তোমার সঙ্গে ওই মহিলার হৃদয়ঘটিত কোনো ব্যাপার আছে? হুমায়ুন থু করে একদলা থুথু ফেললো, আমাকে কি এতোই বাজে লোক মনে করেন যে, ওই মহিলার সঙ্গে হৃদয়ঘটিত সম্পর্ক তৈরি করবো! তার সবটাইতো শরীর, হৃদয় কোথায়? আমি বললাম, মহিলার শরীর মন্দ জিনিস নয়, রোগা ছিপছিপে মহিলাকে নিয়ে ঘর করে আসছো, শরীরের মাহাত্ম্য বোঝার সুযোগ পাও নি, তাই এ কথা বলছো।

আমার কথা শুনে হুমায়ুনের মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেলো। সে ঘেরঅলা পাঞ্জাবির পকেট হাতিয়ে একটা পিস্তল বের করে আনলো। আমাকে বললো, ধরে দেখেন। দেখলাম এই মারণাস্ত্রটির পিচ্ছিল শীতল শরীর। সে আমারই সামনে যন্ত্রটি খুলে ছয়টি ছুঁচোলো গুলি দেখালো। তারপর ট্রিগারে হাত দিয়ে বললো, জানেন, এইখানে একবার চাপ দিলে একটা গুলি বেরিয়ে আসবে এবং একটা গুলিই একজন মানুষকে খুন করার পক্ষে যথেষ্ট। আমার হাসি পেয়ে গেলো। হুমায়ুন পিস্তল দেখিয়ে দৈনিক বাংলার সাহিত্য সম্পাদককে কবিতা ছাপতে বাধ্য করেছে। সেই টেকনিকটা আমার ওপর প্রয়োগ করতে এসেছে। হুমায়ুন বললো, তাহলে জাহিদ ভাই, আপনার সঙ্গে ফাইনাল কথা বলতে চাই। আমি বললাম, বলে ফেলো। সে বললো, দুরদানার সঙ্গে মেশামেশি

বন্ধ করতে হবে। আমি বললাম, একই কথা বার বার বলছো, আমি যদি তোমার প্রস্তাবে রাজি না হই, কি করবে ? সে পিস্তলটা আঁকড়ে ধরে বললো, যদি কথা না রাখেন গুলি করে দেবো। আমি বললাম, করে দাও। আমি জামার বোতাম খুলে বুকটা উন্মুক্ত করে দিলাম। সে ট্রিগারে হাত দিয়ে পিস্তলটা তাক করে রেখেছে, কিন্তু তার হাত কাঁপছে। সে বললো, রাজি হয়ে যান, নইলে ট্রিগার টিপে দিচ্ছি। আমার খুব রাগ হলো, দুঃখ হলো। জোরের সঙ্গে বললাম, আমি ভয় পেতে ঘৃণা করি। তুমি ট্রিগার টিপে দাও। তার সারা শরীরে একটা খিঁচুনি দেখা দিলো এবং পিস্তলটা হাত থেকে পড়ে গেলো। হুমায়ুন আওয়াজ করে বাচ্চা ছেলের মতো কাঁদতে আরম্ভ করলো। আমি হতবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, কাঁদছো কেন ? হুমায়ুন বললো, অন্তত আপনি ভয়তো পাবেন। আমি বললাম, ওহ্ তাই বলো।

৬

দুরদানার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর আমার জীবনের ভারসাম্য পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেলো। হঠাৎ করে আমি সবার বিশেষ মনোযোগের পাত্র হয়ে উঠলাম। যেখানেই যাই, সবাই আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। আমি মনে করতে আরম্ভ করলাম, ঢাকা শহরের সবগুলো চেনা-জানা মানুষের চোখ আমার দিকে ক্যামেরার মতো তাক করে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে বই ইস্যু করতে গিয়েছি। বইয়ের নাম এবং নম্বর লিখে স্লিপ দিয়ে অপেক্ষা করছি। সেদিন ভিড় কম ছিলো। দাড়িঅলা কেরানি ভদ্রলোক মুখে বড়ো মতো পানের খিলিটা ঠেসে দিয়ে একটা ঢোক গিলে জিগ্যেস করলেন, আপনার নামই তো জাহিদ হাসান। আমি বললাম, হাঁ, কেনো ? তিনি চুনের বোঁটায় কামড় দিয়ে বললেন, না কিছু না। এমনিতেই জানতে চাইলাম। সেদিন গুলিস্তানের কাছে ইউনুস জোয়ারদারের বোন দুরদানা বেগমের সঙ্গে আপনাকে দেখলাম কিনা। আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হলো, হারামজাদা, দুরদানা বেগমের সঙ্গে দেখেছো, তাতে তোমার বাপের কি, কতো লোকই তো কতো মেয়ে মানুষের সঙ্গে এক রিকশায় যাতায়াত করে। কিন্তু আমি কিছু বলতে পারি নি।

বাংলা একাডেমির কি একটা অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছি। পাগলা জগলুল দূর থেকে ছুটে এসে আমার পাশ ঘেঁষে বসলো। তারপর বললো, দেখি ভাতিজা একটা সিগারেট বের করো তো দেখি। আমি প্রমাদ গুণলাম। জগলুলের পাল্লায় পড়লে সহজে ছাড়া পাওয়ার উপায় নেই। আমি নীরবে একটা স্টার সিগারেট বের করে তাকে দিলাম। সে সিগারেট নিলো বটে, কিন্তু ভীষণ অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে বললো, ভাতিজা এখনো

তুমি স্টার সিগারেট খাও ? আমি বললাম, চাচা এটাইতো আমার ব্র্যান্ড। জগলুল নাকে-মুখে ধোঁয়া ছেড়ে বললো, না ভাতিজা, তোমার কথাটা মনে ধরলো না। তুমি ইউনুস জোয়ারদারের বোনের সঙ্গে প্রেম করে বেড়াও। যে মেয়ে সাইকেল চালায়, প্যান্ট-শার্ট পরে। একেবারে আপটুডেট মেয়ে। এখন তো দেখছি সে মেয়ে তোমাকে কলা দেখিয়ে চলে যাবে। বুঝলে ভাতিজা, এই ধরনের মেয়েকে বশে রাখতে হলে অনেক কায়দা-কানুন জানা চাই। ফকিরনির পোলার মতো চলাফেরা করলে চলবে না। ভালো সিগারেট খেতে হবে, ভালো জামা-কাপড় পরতে হবে। ভালো জায়গায় যেতে হবে। বুঝলে ভাতিজা, বয়সকালে আমরাও প্রেম করেছি। একটা নয়, দুটো নয়, এক সঙ্গে পাঁচ-পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছি। কখন কি করতে হবে, আমি তোমাকে সব বাতলে দেবো, এবার চাচার হাতে দশ টাকার একটা নোট রাখো দেখি।

আমি বললাম, চাচা, আজ তো আমার কাছে কোনো টাকা-পয়সা নেই। জগলুল বললো, ভাতিজা, নাই বললে পার পাবে না। ভালোয় ভালোয় দশ টাকা চালান করে দাও। নইলে লোকজনের সামনে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবো। এতোদিন জগলুলকে পাগল বলে জানতাম। আজ দেখলাম, লোকটা কম নীচও নয়। আমি রীতিমতো রেগে গিয়ে বললাম, ঠিক আছে, আপনি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিন। প্রায় ছ'ফিট লম্বা লিকলিকে মানুষটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে লাল চোখ করে বললো, এখনো বলছি, ভালোয় ভালোয় টাকাটা দিয়ে দাও। আমি গোঁ ধরে রইলাম। তারপর জগলুল চিৎকার করে বলতে আরম্ভ করলো, তুমি ইউনুস জোয়ারদারের বোনের সঙ্গে ফুর্তি করে বেড়াও। মানুষ কি জানে না ইউনুস জোয়ারদার একটা খুনি। তার দলের লোকেরা গ্রামে-গঞ্জে মানুষ খুন করে বেড়াচ্ছে। লোকের ধন-সম্পদ লুটপাট করছে। ভাইয়ের দেমাকেই তো বোনটা সাইকেলে চড়ে সবাইকে পাছা আর বুক দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। এইসব কথা শুনে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। জগলুলের মাথায় বসিয়ে দেবার জন্যে আমি একটা ফোল্ডিং চেয়ার উঠিয়ে নিলাম। সভাস্থলে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। একাডেমির লোকেরা এসে আমাদের দু'জনকে আলাদা করে দিলেন।

সেদিন সন্ধেবেলা একাডেমি থেকে অনুষ্ঠান শেষ করে শরীফ মিয়ার ক্যান্টিনে এসেছি। আমার পেছন পেছন দু'জন তরুণ এসে আমার বিপরীত দিকে বসলো। আমি চা খেয়ে বেরিয়ে আসতেই দেখি, তরুণ দু'জনও আমার পেছন পেছন আসছে। আমার কেমন যেন গা ছম ছম করতে আরম্ভ করলো। যেই ছাতিম গাছটার গোড়ায় এসেছি, দু'জনের মধ্যে একজন পেছন থেকে ডাক দিলো, এই যে ভাই, একটু দাঁড়ান। আমি দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলাম, আমাকে কি কিছু বলছেন ? তরুণ দু'জন আমার শরীর ঘেঁষে দাঁড়ালো। দু'জনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেঁটেটি আমাকে প্রশ্ন করলো, আপনি কি ইউনুস জোয়ারদারের দল করেন ? আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। সহসা মুখে কোনো কথা যোগালো না। লম্বা যুবকটি আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে বললো, কি ভাই, কথা বলছেন না কেনো ? আমি দেখলাম গতিক সুবিধের নয়। বললাম, ইউনুস জোয়ারদার বলে কাউকে আমি চিনি নে। তরুণটি হু হু করে হেসে উঠলো, ইউনুস জোয়ারদারকে চেনেন না, তাই না ? তার বোনটিকে চিনলেন কেমন করে ? একেবারে খাসা মাল। কি ভাই, চুপ

কেনো, কথা বলেন। আমি বললাম, আপনারা অসভ্যের মতো কথা বলছেন। বেঁটে তরুণটি আচমকা দু'হাত দিয়ে আমার গলা চেপে ধরে বললো, শালা, অসভ্য কাকে বলে চিনিয়ে দিচ্ছি। তারপর দু'জনে মিলে অবিরাম আমার গায়ে কিল-চড় মারতে থাকলো। আমার শরীর বরাবরের মতো দুর্বল। আমি বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। তরুণ দু'টি আমাকে মারতে মারতে একরকম আধমরা করে ছাতিম তলায় ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলো।

অনেকক্ষণ হুঁশ ছিলো না। মাঝ রাতে যখন জ্ঞান ফিরে এলো, দেখলাম, আমি ছাতিম তলায় পড়ে আছি। আমার শরীর ধুলোকাদায় লেপ্টে গেছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়াবার ক্ষমতা আমার নেই। অনেক কষ্টে সে রাতে কোনো রকমে হোস্টেলে ফিরতে পেরেছিলাম। পুরো সপ্তাহটা ঘরের মধ্যে আটকে থাকতে হয়েছিলো। তবুও ওই মার খাওয়ার ঘটনা আমি কারো কাছে প্রকাশ করিনি। ড. মাহমুদ কবিরের সতর্ক করে দেয়ার কথা আমার মনে পড়লো। যে মেয়ের ভাই সন্ত্রাসী রাজনীতি করে, যে মেয়ে প্যান্ট-শার্ট পরে, সাইকেল চালিয়ে আসা-যাওয়া করে, তার সঙ্গে মেলামেশা করার মূল্য তো আমাকে দিতেই হবে। সীমানা ভাঙা কি সহজ কথা! এখন আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু এ পথে একবার যখন পা বাড়িয়েছি আর তো ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। লাঞ্ছনা-গঞ্জনা যা কিছু আসে সব আমাকে একাই ভোগ করতে হবে। সান্ত্বনা প্রকাশ করবে, সমবেদনা জানাবে, এমন কাউকে আমি পাবো না। মার খেয়েছি কথাটি আমি কোনো লোকের কাছে বলি নি। কারণ মার খাওয়ার কথা বলার মধ্যে আমি অপমান ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই নি। তবুও হপ্তাখানেক পর যখন ঘরের বাইরে এলাম, গভীর বেদনার সঙ্গে হজম করতে হলো, সরকারি দলের ছাত্ররা আমাকে মারতে মারতে আধমরা করে ফেলে গিয়েছিলো, একথা সবাই জেনে গিয়েছে। এই প্রথম উপলব্ধি করলাম, আমি একটা গ্যাড়াকলের মধ্যে আটকা পড়ে গিয়েছি। এখন আমি যেখানেই যাবো, এরপর রাজরোষ আমাকে অনুসরণ করতে থাকবে।

আবার ড. মাহমুদ কবিরের আরেকটি চিরকুট পেলাম। তিনি আমাকে সন্ধেয় তাঁর বাড়িতে যেতে বলেছেন। আমি ঠিক করলাম, যাবো না। কারণ তাঁর ওখানে গেলে তিনি হুঁকোয় লম্বা টান দিয়ে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলবেন, কি হে ছোকরা, এখন কেমন বোধ করছো! তখন তো আমি তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। তিনি যে একজন মস্ত বড়ো ভবিষ্যদ্বক্তা এই সত্যটি প্রমাণ করার জন্যে তাঁর বাড়ি অবধি ছুটে যাওয়ার মধ্যে কোনো অর্থ খুঁজে পেলাম না। অপমান-লাঞ্ছনা যা কিছু আসুক, আমি একাই সহ্য করবো। কারুর সহানুভূতি আমার প্রয়োজন নেই।

হঠাৎ করে আমি শহিদ হওয়ার দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত মানব-সম্পর্ক বিচার করতে আরম্ভ করলাম। শহিদের হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে আমি তামাম দুনিয়াটাকে দেখতে আরম্ভ করলাম। ইউনুস জোয়ারদার মানুষটিকে আমি কোনোদিন নিজের চোখে দেখি নি, কথা বলি নি। তিনি কি দিয়ে ভাত খান এবং কোথায় কোথায় যান, কিছুই জানি নে। তাঁর রাজনীতির বিন্দুবিসর্গ সম্পর্কেও আমার কোনো ধারণা নেই। তারপরেও

আমার মনে হতে থাকলো জোয়ারদারের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। আমি ভীষণ কৌতূহলী হয়ে তাঁর সম্পর্কে নানান তথ্য সংগ্রহ করতে লেগে গেলাম। ধীরে ধীরে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটা ধারণা আমার মনে জন্ম নিতে আরম্ভ করলো। শহরের দেয়ালে দেয়ালে আলকাতরার লিখন দেখে আমার মনে হতে থাকলো ইউনুস জোয়ারদার ধারে-কাছে কোথাও লুকিয়ে রয়েছেন এবং আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পেতে রেখেছেন। আমি রিভলবার দিয়ে শ্রেণীশত্রু খতম করার কাজে অংশগ্রহণ করি নে, রাত দুপুরে আড়তদারের আড়তে হামলা করি নে, পুলিশ কিংবা রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে সামনা-সামনি বন্দুক-যুদ্ধে নামি নে, গ্রাম-গঞ্জের বাজারে কারফিউ জারি করে গণশত্রুদের ধরে এনে গণ-আদালতে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করি নে। চেয়ারম্যান মাও সে তুঙের নামে শ্লোগান দিয়েও গাঁও-গেরামের জমাটবাঁধা অন্ধকার কাঁপিয়ে তুলি নে, গোপন দলের হয়ে চাঁদা সংগ্রহ করি নে, গাঢ় আলকাতরার অক্ষরে দেয়ালে লিখন লিখি নে, গোপন দলের সংবাদ আনা-নেয়া করি নে। তাদের ইশতেহারও বিলি করি নে। কোনো কাজে অংশগ্রহণ না করেই কেমন করে আমি মানসিকভাবে ইউনুস জোয়াদারের সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম।

নিজের অজান্তেই আরেকটি গোপন পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে গেলাম। সেই পৃথিবী চোখের সামনে দৃশ্যমান পৃথিবীর কোনো নিয়ম রক্ষা করে না। সেখানে সূর্য ভিন্ন রকম আলো ছড়ায়, চাঁদ ভিন্ন রকম কিরণধারা বিতরণ করে, সেই পৃথিবীর আকাশে ভিন্ন রকমের গ্রহ-নক্ষত্র শোভা বিস্তার করে। শিশুদের চোখে ম্যাজিক ল্যান্টার্নের ফোকর দিয়ে যেমন মায়া-জগতের চেহারা মূর্ত হয়ে ওঠে, আমিও দুরদানার মধ্য দিয়ে একটি গোপন পৃথিবীর নিবিড় স্পর্শ অনুভব করে একা একা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিলাম। দুরদানা যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াতো, আমার শরীরের সমস্ত রক্ত মিছিল করে উজানে ছুটতে থাকতো। তরল রঙিন মদের নেশার মতো আমার চেতনার মধ্যে সোনালি বুদ্বুদ খেলা করতো।

দুরদানা একটি মেয়ে, একটি অজানা পৃথিবীর প্রতীক। এই ভাবনাটাই আমার জন্য যথেষ্ট ছিলো। তার স্তন জোড়ার আকৃতি কি রকম, অন্য মহিলার মতো তারও একখানা যৌনাঙ্গ আছে কি না, মাসে মাসে তারও রক্তস্রাব হয় কি না এবং রক্তস্রাবের যন্ত্রণা সে অনুভব করে কি না—এসব কথা কখনো আমার ধর্তব্যে আসে নি। একজন যৌবনবতী নারীর রূপ ধরে আমাদের দেশের ইতিহাসের পাল্টা স্রোত, যা গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র হাজার বছরের বাঁধন ঠেলে বেরিয়ে আসার জন্যে রক্তপাত ঘটাচ্ছিলো, সেই প্রবাহটার সঙ্গেই দুরদানা আমার পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলো। নারী আসলে যা, তার বদলে যখন সে অন্যকিছুর প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়, তখন তার আকর্ষণ করার শক্তি হাজার গুণ বেড়ে যায়।

একটানা বেশ কয়েকটা মাস একটা ঘোরের মধ্যে কেটে গেলো। নিজের দিকে তাকাবার মোটেও ফুরসত পাই নি। এক শুক্রবারে ঘুম থেকে উঠে ঘরের চেহারা দেখে সারা গা কুটকুট করতে থাকলো। অনেক দিন থেকে ঘরে ঝাড়ু পড়ে নি। দেয়ালের চারপাশে, ছাদে ঝুল জমেছে, তাতে অজস্র মাকড়সা বাসা বেঁধেছে। বালিশ ময়লা।

বিছানার চাদর অনেকদিন বদলানো হয় নি। এখানে-ওখানে কাগজপত্র ছড়িয়ে আছে। আমি নাস্তা শেষ করে এসে প্রথমে ঝুল ঝাড়লাম। তারপর বিছানার চাদর, বালিশের ওসার, তোয়ালে এইসব সাবান মেখে বালতিতে ডুবিয়ে রাখলাম। নতুন চাদর বের করে বিছানায় পেতে দিলাম, বালিশে নতুন ওসার লাগালাম। বইপত্রগুলো গোছগাছ করলাম। অনেকগুলো চিঠির জবাব দেয়া হয় নি। মনের মধ্যে অপরাধ বোধের পীড়ন অনুভব করলাম। মায়ের পর পর তিনটে চিঠির কোনো জবাব দিই নি। ঠিক করলাম, প্রথমে মাকে, তারপর চাচাকে চিঠি লিখবো। বাকি চিঠিগুলোর জবাব অন্য সময় দেবো। কাপড়-চোপড় পরিষ্কার এবং চিঠিপত্র লেখায় অর্ধেক বেলা চলে গেলো। ফলে আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। দুপুরবেলা খেয়ে এসে বিছানায় পিঠ রেখেছি, এমন সময় দরোজায় একে একে তিনবার টোকা পড়লো। আমি তাড়াতাড়ি উঠে দরোজা খুলে দিতেই একজন বুড়োমতো ভদ্রলোক আমাকে সালাম দিলেন। আগন্তুক বেশ লম্বা, মুখে ছাগল দাড়ি। পরনে পাজামা এবং লম্বা নীল রঙের শার্ট। শার্টের তিনদিকে পকেট। দেখলাম, তাঁর ওপরের পাটির দুটো দাঁত নেই। আমি ভদ্রলোককে বসতে বললাম এবং কি কারণে এসেছেন জানতে তিনি একগাল অমায়িক হেসে জানালেন, তাঁর তেমন বিশেষ উদ্দেশ্য নেই। আমার সঙ্গে অল্পস্বল্প কথাবার্তা বলতে এসেছেন। আমার সঙ্গে তাঁর কখনো পরিচয় হয়েছিলো কি না জানতে চাইলাম। ভদ্রলোক এবারও হেসে জানালেন, না, আমার সঙ্গে তাঁর মৌখিক পরিচয় হয় নি বটে, তবে তিনি আমাকে চেনেন। নানা সভা-সমিতিতে তিনি আমার বক্তৃতা শুনেছেন। আমার কথাবার্তা শুনে খুব পছন্দ হয়েছে। তাই আজ পরিচয় করতে ছুটে এসেছেন।

ভদ্রলোকের কথাবার্তা শুনে আমার বুকের ছাতি একটুখানি ফুলে উঠলো। তাঁর দিকে সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরলাম। তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং জানালেন, পান, সিগারেট, চা কিছুই খান না। কেবল দুপুরে এবং রাতে খাওয়ার পর মুখশুদ্ধির জন্য অর্ধেক করে হরতকি খেয়ে থাকেন। মৃদু হেসে এও জানালেন, হরতুকি সেবনের এই অভ্যাস তিনি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক অম্বিকা বাবুর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। হরতুকি খুব উপকারী জিনিস। এ ছাড়াও তিনি প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে পুরো এক গ্লাস ত্রিফলা-ভেজানো পানি পান করে থাকেন। আর এই পানির গুণ এতো বেশি যে, পিত্তচড়া, অগ্নিমান্দ্য এসব রোগ ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারে না। ভদ্রলোকের কথাবার্তা শুনে তাঁর ওপর আমার ক্রমশ শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। এই রকম একজন সাত্ত্বিক স্বভাবের মানুষ সভা-সমিতিতে আমার বক্তৃতা শুনে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন শুনে মনটা খুশিতে গান গেয়ে উঠতে চাইলো।

আমার উষ্মা, বিরক্তি সব কোথায় চলে গেলো! আমি তরিবতসহকারে ভদ্রলোক কোথায় থাকেন জানতে চাইলাম। ভদ্রলোক জানালেন, তিনি আমার খুব কাছেই নীলক্ষেতের একটা অফিসে ছোটোখাটো গোছের কাজ করেন। তাঁর আসার কারণ জিগ্যেস করলে তিনি খুক খুক করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার। স্যার, শুনলে আপনার হাসি পাবে। আমি বললাম, তবুও আপনি বলুন। তিনি

এক গ্লাস পানি খেতে চাইলেন। আমি পানি ভর্তি গ্লাসটা তাঁর সামনে বাড়িয়ে দিলাম। তিনি আস্তে আস্তে ঢোক গিলে গিলে সবটুকু পানি পান করলেন। তারপর মুখ খুললেন, স্যারকে প্রতিদিন দূরদানা বেগমের সঙ্গে চলাফেরা করতে দেখি। এরকম ভালো দাগহীন মেয়ে আমি কম দেখেছি। প্যান্ট-শার্ট পরে একটু পাগলামি করলে কি হবে, একেবারে খাঁটি মেয়ে। ওই মেয়ের মধ্যে কোনোরকম নোংরামি থাকতে পারে না। আসলে স্যার আমরা মুসলমানরা যতোই পর্দা-পর্দা বলে যতোই চিৎকার করি না কেনো, পর্দা করলেই যে মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন হয়ে যাবে, এটা কোনোদিন ঠিক হতে পারে না। যাকে বলে ঘোমটার মধ্যে খেমটা নাচ, সেতো সব জায়গাতেই চলছে।

ভদ্রলোক যেই দূরদানার নাম উচ্চারণ করলেন, আমি সচকিত হয়ে উঠলাম। কারণ এ-পর্যন্ত দূরদানার ব্যাপার নিয়ে যতো মানুষ আমার সঙ্গে কথা বলেছে, সবার কাছ থেকেই একটা প্রচ্ছন্ন বিপদের ইঙ্গিত পেয়েছি। ভদ্রলোকের মতলবখানা কি আমি আঁচ করতে চেষ্টা করলাম। আমার চোখে-মুখে একটা কঠোরতার ভাব ফুটে উঠলো। সেটা ভদ্রলোকের দৃষ্টি এড়ালো না। তিনি জানালেন, তাঁর নাম ইউনুস মোল্লা। দূরদানা বেগমের ভাইয়ের নামে নাম। তাই তিনি দূরদানা বেগমের প্রতি একটা ভ্রাতৃসুলভ স্নেহ অনুভব করে থাকেন এবং এই স্নেহের টানেই তিনি আমার কাছে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বললেন, স্যার, নামে নামে মিল হয়ে যাওয়ার মধ্যে একটা ব্যাপার আছে। যেমন ধরুন ইউনুস জোয়ারদার সাহেবকে আমি কখনো চোখে দেখি নি। তবু তাঁর দুঃসাহসী কাজের কথা শুনতে শুনতে আমার একটা ইয়ে, মানে আগ্রহ জন্মে গেছে। বোঝেনতো স্যার নামে নামে মিল চুম্বকের মতো একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করে। তাই স্যারের কাছে এলাম। ইউনুস জোয়ারদার সাহেব সম্পর্কে কিছু জানার খুব খায়েশ। আমি জানালাম, জোয়ারদারের নাম তাঁর মতো আমিও শুনেছি। কিন্তু তাঁকে কোনোদিন চোখে দেখি নি। আমার কথা শুনে ইউনুস মোল্লা সাহেব অবাক হওয়ার ভঙ্গি করলেন, কী যে বলেন স্যার। বোনের সঙ্গে এতো খাতির অথচ ভায়ের ব্যাপারে কিছুই জানেন না। এটা কেমন করে হয়। আজ না জানতে পারেন, একদিন তো জানতে পারবেন, বেগম সাহেব আপনাকে না জানিয়ে কি পারবেন ? স্যার, এরপর থেকে আমি আপনার কাছে যাওয়া-আসা করতে থাকবো। অবশ্য, স্যার যদি বিরক্ত না হন। আমার কেমন জানি সন্দেহ হলো। আমি বললাম, ইউনুস সাহেব, ঠিক করে বলুন তো আপনি কি করেন ? তিনি বিনয়ে বিগলিত হয়ে জানালেন, অদৃষ্টের ফেরে তাঁকে অতিশয় তুচ্ছ কাজ করতে হচ্ছে। তিনি নীলক্ষেত ব্রাঞ্চের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টর। বুঝলাম, পেছনে গোয়েন্দা লেগেছে।

পাগলা জগলুল আমার ভেতরে একটা বিশ্রী জিনিস ঢুকিয়ে দিয়েছে। আগের মতো জামা-কাপড় পরে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি না। আমার কাপড়-চোপড় দূরদানার একটা বিবেচনার বিষয়ে হতে পারে আগে চিন্তাও করি নি। এখন পোশাক-আশাকের ব্যাপারটা আমার প্রধান মনোযোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন্ প্যান্টের সঙ্গে কোন্ শার্টটা পরলাম, ম্যাচিং ঠিকমতো হলো কি না, এসব জিনিশে দৃষ্টি দিতে হচ্ছে। অসম্ভব

কষ্টের সঙ্গে আবিষ্কার করলাম, আমার শার্টগুলো অত্যন্ত বিশ্রী, প্যান্টগুলোর কোনো ছিরিছাঁদ নেই। পরে লজ্জা নিবারণ করা যায় কোনোমতে। পোশাকের ভেতর দিয়ে একজন মানুষের রুচি-সংস্কৃতি প্রকাশিত হয়, এসব কথা কোনোদিন ঘুণাক্ষরেও মনে আসে নি। তাই ধার করে নতুন জামা-কাপড় বানাতে হলো। আগে একটা শার্ট একনাগাড়ে চার-পাঁচদিন পরতাম। এখন দু'দিনের বেশি পরলে দুর্গন্ধে নিজের শরীরটাই গুলিয়ে উঠতে থাকে। ঘন ঘন লন্ড্রিতে পাঠাবার মতো পয়সা আমার নেই। নিজের হাতে পরিষ্কার করে তারপর ইস্তিরি করি। ইস্তিরি করা শিখে নিতে হয়েছে। আমার নিজের ইস্তিরি ছিলো না। কেনার পয়সাও ছিলো না। আমার এক বন্ধুর বড় বোনের বাড়িতে একটা ইস্তিরি নষ্ট হয়ে পড়ে ছিলো, সেই অকেজো জিনিশটাকেই মেরামতের দোকান থেকে সারাই করে কোনোরকমে কাজ চালিয়ে নিই।

এক ছুটির দিনে কাপড় ইস্তিরি করছিলাম। পুরনো মালে নির্ভর করার উপায় নেই। তাপ বেশি হলে কাপড় পুড়ে যাবার সম্ভাবনা। রেগুলেটার ঠিকমতো কাজ করছিলো না। আবার যদি হাতেটাতে লেগে যায়, শক খেয়ে পটল তুলতে হবে। তাই সুইচ বন্ধ করে ভাবছিলাম, এখন কি উপায়! ঘেমে সারা শরীরে আমি নেয়ে উঠছিলাম। এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে ঘরে ঢুকলো সেই বুড়ো দারোয়ান হাফিজ। সে আমার হাতের দু' আঙুলে লম্বা একটা স্লিপ ধরিয়ে দিয়ে বললো, স্যার আর একুয়া মেম ছা'ব। তারপর খুব ধারালো একটা হাসি ছুঁড়ে দিলো। এমন এমন এক ধরনের হাসি, দেখলে সারা শরীরে জ্বালা ধরে যায়। অথচ কিছু বলার উপায় নেই। এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে বললাম, দুরদানা এসেছে? হাফিজ একটা জবর জবাব দিলো, না স্যার, এইটা মেমছাব, দেখলে চিনন যায়, দুরদানা ত ফুল ছা'ব। অপমানটা আমি গায়ে মাখলাম না। বললাম, পাঠিয়ে দাও।

অন্তত মিনিট তিন পর আমার ঘরে একটি মেয়ে ঢুকলো। মেয়ে আমি ইচ্ছে করেই বলেছি, কারণ ভদ্রমহিলা হিশেবে তাকে মেনে নিতে আমার মন সায় দিচ্ছিলো না। তার গায়ের রঙ অসম্ভব রকম ফরসা। একখানা ফিনফিনে রেশমের শাড়ি তার শরীর ঢেকে রেখেছে। শরীর প্রতিটি বাঁক স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। পানের রসে তার ঠোঁট দুটো লাল। মুখের ভাবে একটা অকালপক্কতার ছাপ। মাথার চুলগুলো ছোটোছোটো। এ ধরনের মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না। মেয়েটির বয়স নেহায়েৎ কম হয় নি। কিন্তু বাড়টা ঠেকে আছে। অবশ্য এ কারণেই তাকে ভদ্রমহিলা বলা যাবে কি না তাই নিয়ে আমি ইতস্তত করছিলাম! অবশ্য ভদ্রমহিলা দামি কাপড়-চোপড় পড়লেও তাঁর পরার ধরন আপনা থেকেই একটা আনাড়িপনা জানান দিয়ে যাচ্ছে। তার পোশাক-আশাক দেখলে মনে হবে, ওগুলো পরা হয় নি, শরীরের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

আমি বললাম, বসুন। মেয়েটি চেয়ারের ওপর থপ করে বসে, কোনোরকম ভূমিকা না করেই জানিয়ে দিলো, আমার নাম কল্পনা আখতার লুলু। আমি এবার ইডেন থেকে বিএ ফাইনাল দেবো এবং হোস্টেলেই থাকি। আমার আব্বা ছিলেন জগন্নাথ কলেজের এক্স ভাইস প্রিন্সিপাল জালালুদ্দিন হায়দার চৌধুরী। কল্পনা প্রতিটি শব্দ চিবিয়ে চিবিয়ে

এমনভাবে উচ্চারণ করে, যা মনের মধ্যে গেঁথে যায়। কিন্তু তার দাঁতগুলো খুবই সুন্দর। আমি বললাম, লুলু, আপনার আব্বা কি এখন বেঁচে নেই? মেয়েটি যেন তেড়ে এলো, আমার আব্বার সংবাদে আপনার কাজ কি? আমি আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছি। দুরদানার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে আমি সব রকম অসম্ভব অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্যে তৈরি থাকতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। আমি বললাম, লুলু, আমি কোথায়, কিভাবে আপনার ক্ষতি করলাম? মেয়েটি মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলো। মশাই, আপনি ন্যাকার মতো কথা বলবেন না। কি ক্ষতি করেছেন আপনি নিজে জানেন না? সত্যি সত্যি আমাকে মাথায় হাত দিয়ে চিন্তা করতে হলো, কখন, কোথায় কীভাবে মেয়েটির ক্ষতি করলাম। আমি বললাম, লুলু, আপনি বোধহয় ভুল করেছেন। আপনি যাকে তালাশ করছেন, আমি সে ব্যক্তি নই। আপনার সঙ্গে আমার কোথাও কোনোদিন দেখাই হয় নি। সুতরাং ক্ষতি করার প্রশ্নই ওঠে না। আমার কথা শুনে কল্পনা আখতার লুলু টেবিল থেকে পানির বোতলটা তুলে নিয়ে মেঝের ওপর ছুঁড়ে মারলো। ঝনঝন করে বোতলটা ভাঙলো। ভাঙা কাচের কুঁচি ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো। আমি ভাবলাম, মহামুশকিলে পড়া গেলো। আবার পাগলটাগল নয়তো?

লুলু বললো, আপনাকে আমি খুব ভালোভাবে চিনি। আপনার নাম জাহিদ হাসান। আপনি অত্যন্ত নোংরা চরিত্রের মানুষ। আপনাকে চিনতে আমার বাকি আছে! আপনার সঙ্গে মেলামেশা করার পর থেকে দুরদানা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। আপনি তাকে নষ্ট করেছেন। আপনাকে একদিন দেখে নেবো। তার কথাবার্তার ধরন দেখে মজা পেয়ে গেলাম। আমি বললাম, না লুলু, দুরদানাকে আমি নষ্ট করি নি। আমাদের সম্পর্ক এখনো পোশাকের বাঁধন অতিক্রম করে নি। লুলু কালির দোয়াতটটা উঁচিয়ে ধরে বললো, আমার ইচ্ছে হচ্ছে এটা আপনার মুখে ছুঁড়ে মারি। বুঝলাম, এই মেয়ের সঙ্গে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। মানে মানে এখন বিদেয় করতে পারলেই বাঁচি। আমি বললাম, আপনি সত্যি করে বলুন তো দুরদানা আপনাকে বলেছে আমি তাকে নষ্ট করেছি? লুলু টেবিলে থাবা বাজিয়ে বললো, নষ্ট করবার বাকি কি রেখেছেন, এখন দুরদানা আমার সঙ্গে ঘুমোতে চায় না, সে বাড়ি গিয়ে শাড়ি-সালোয়ার কামিজ পরতে চায়। এসব তো আপনার কাছ থেকেই শিখেছে। আমি তাজ্জব বনে গেলাম। এ কেমন ধারা নালিশ! বাঙালি মেয়ে মাত্রই তো শাড়ি কিংবা সালোয়ার কামিজ পরে। দুরদানাও যদি পরে, তাহলে অন্যায় কোথায়! দুরদানা শাড়ি পরুক, সালোয়ার কামিজ পরুক সে তার ব্যাপার। লুলু, আমার অপরাধ কোথায়? এবার লুলু চিৎকার করে বলতে আরম্ভ করলো, আপনি নিজে মজা মারার জন্য তাকে মেয়ে বানাবার ষড়যন্ত্র করছেন। আমি চাই দুরদানা সব সময়ে পুরুষ মানুষের মতো পোশাক পরবে। মেয়েমানুষের পোশাকে তাকে একবারও দেখতে চাইনে। আপনাকে এক্ষুনি কথা দিতে হবে, আপনি জীবনে কোনোদিন আর দুরদানার সঙ্গে মিশবেন না। দুরদানা সারাজীবন আমার এবং একমাত্র আমার থাকবে। আমাদের পুরুষ মানুষের প্রয়োজন নেই। আমরা দু'জনই যথেষ্ট। আপনাকে আমার কথায় রাজি হতে হবে। নইলে এক্ষুনি জোরে চিৎকার দিয়ে লোকজন জড়ো করে জানিয়ে দেবো, আপনি আমার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছেন। ভেবে

দেখলাম এ মেয়ের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। লুলু যদি সত্যি সত্যি চিৎকার দেয় এবং বলে যে, আমি তার ওপর চড়াও হয়ে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছি, তাই শুনে লোকজন ছুটে আসবে এবং সবাই তার কথা সত্যি বলে মেনে নেবে। আমি আল্লার নাম নিয়ে শপথ করে বললেও কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। এই আপদ কি করে বিদেয় করা যায়, চিন্তা করতে লাগলাম।

অগত্যা আমাকে বলতে হলো, লুলু আপনার কথা আমি মেনে নিলাম। আমি আর কোনোদিন দুরদানার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবো না এবং তার সঙ্গে সম্পর্কও রাখবো না। লুলু বললো, মুখের কথায় চলবে না। আপনাকে স্ট্যাম্পে লিখে দিতে হবে। সে সত্যি সত্যি ব্যাগের ভেতর থেকে তিন টাকার স্ট্যাম্প বের করে আনলো। আমি তার কথামতো লিখে দিলাম, আমি অমুকের পুত্র জাহিদ হাসান এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে জীবনে দুরদানা নাম্নী মহিলার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিব না এবং কোন প্রকার সম্পর্কও রাখিব না। আমার কাছ থেকে সই আদায় করে কল্পনা আখতার লুলু গর্বিত হলো। কিন্তু আমি একটা বড়ো ধাক্কা খেলাম। দুরদানা কি সমকামী?

৭

মাঝখানে বেশ কিছুদিন আমার সঙ্গে দুরদানার দেখা হয় নি। তার ছোটো বোনের শরীর খারাপ যাচ্ছিলো। তাই নিয়ে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিলো। আমি তার বাড়িতে একখানা পোস্টকার্ড লিখে চৌদ্দ তারিখ সন্ধেবেলা উয়ারিতে খানে খানানের বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম। আসলে আমাদের বন্ধুটির নাম আব্দুর রহিম খান। তার দরাজ দিলের পরিচয় পেয়ে খানকে খানেখানান করে নিয়েছিলাম। আকবরের নওরতনের একজন ছিলেন খানে খানান।

দুরদানা সাড়ে পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির। সে সবসময় ঘড়ির নির্দেশ মেনে চলে। যদি পাঁচটায় আসবে বলে, সব সময় লক্ষ্য রাখে সেটা যেন পাঁচটা পাঁচ মিনিটে না গড়ায়। সাইকেলের চাবিটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললো, জাহিদ ভাই, আজ রাতে সাইকেলটা আপনার এখানে থাকবে। কাল ক্লাস করতে এলে নিয়ে যাবো। উয়ারি থেকে আসার পথে আপনি আমাকে বেবি ট্যাক্সিতে নাখালপাড়া অবধি পৌঁছে দেবেন। বেশ কিছুদিন থেকেই আমার মনটা খচ খচ করছিলো। দুরদানার সঙ্গে দেখা হয় নি তাই সুযোগ হয় নি জেনে নেয়ার। আমি জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা, তুমি কল্পনা আখতার লুলু বলে কোনো মেয়েকে চেনো? দুরদানা জবাব দিলো, চিনবো না কেনো! আপনার সঙ্গে তার দেখা হলো কোথায়? বললাম, সে হোস্টেলে এসেছিলো এবং

অনেক আজেবাজে কথা বলে গিয়েছে। প্রথমে সে অবাক হওয়ার ভঙ্গি করলো। তারপর রেগে গেলো। পকেট থেকে প্যাকেট বের করে লাইটার জ্বালিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললো, শালীর সাহস তো কম নয়। সে আপনাকে পর্যন্ত বিব্রত করতে ছুটে এসেছে। জানেন জাহিদ ভাই, মেয়েটি আমাকে অস্থির করে তুলেছে। একথা বলতে গিয়ে দুরদানা ফিক করে হেসে ফেললো। আমার যতো ছেলে বন্ধু আছে সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে এসেছে, খবরদার, তোমরা দুরদানার সঙ্গে মিশবে না। দুরদানা আমার বর।

দুরদানার সঙ্গে কোনোদিন আমার এ ধরনের কথাবার্তা হয় নি। তার সম্পর্কে আমার মনে যে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিলো, তাতে হাতুড়ির আঘাত লাগছিলো এবং একটু একটু করে বার্নিশ ঝরছিলো। আমি জিগ্যেস করলাম, তুমি কি বলতো পারো, লুলু যা বলেছে তাতে কোনোরকম সত্যের স্পর্শ নেই? আমার কথা শুনে দুরদানা কাঁধ ঝাঁকালো, তারপর বললো, আমাকে শার্ট-প্যান্ট পরা দেখে কোনো মেয়ে যদি মনে করে আমি তার ইয়ে, শুনতে তো আমার বেশ লাগে। কথাগুলো হজম করতে আমার কষ্ট হচ্ছিলো। সেটা দুরদানার দৃষ্টি এড়ালো না। বললো, জাহিদ ভাই, আপনি আচাভুয়ো ধরনের মানুষ। সংসার অনেক জটিল। এখানে কতো ধরনের মানুষ। সেসব ভেবে আর কি হবে। নিন, কাপড়-চোপড় পরে নিন। সন্ধে হয়ে এলো। তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে কাপড়-চোপড় পরতে লেগে গেলাম।

সারা পথে দুরদানার সঙ্গে আমার একটিও কথা হয় নি। খানে খানানের বাড়ি এসে যখন পৌঁছুলাম, আকাশে নিবিড় করে মেঘ জমেছে। ঘন ঘন বিজলি চমকাচ্ছে। খানে খানান দরোজা খুলে দিয়ে খুশিতে একরকম নেচে উঠে বললো, দেখছো তো আসমানের অবস্থা। একটু পরেই বৃষ্টি নামবে। আমার কাছে বিসমিল্লাহ খানের মিয়া কি মল্লার এবং মেঘ মল্লার রাগের শানাইয়ের রেকর্ড দুটোই আছে। এখনই শানাই শোনার উপযুক্ত সময়। কাজের লোকটা চা দিয়ে গেলো। সে রেকর্ড এবং প্লেয়ার আনতে ভেতরে গেলো। আকাশ ভেঙে বর্ষা নেমে এলো। খানে খানান প্লেয়ারে রেকর্ড চাপিয়ে দিলো। সে বললো, আমরা রেকর্ড শুনতে শুনতে অন্য সবাই এসে পড়বে।

খানে খানান হলো সেই ধরনের মানুষ, নিজেকে অন্যদের কাছে জাহির করে যৌন পুলকের মতো এক ধরনের নিবিড় আনন্দ সুখ অনুভব করে। সে বিসমিল্লাহর রেকর্ড কিনেছে নিজের গভীর পিপাসা মেটাবার জন্যে নয়, অন্যেরা বলবে, খানে খানান ছেলেটা বেশ রুচিবান, বিসমিল্লাহর শানাই সে নিয়মিত শোনে—এই জন্যে। খানে খানানের সবকিছুই এ ধরনের। আজ সন্ধেয় দুরদানাকে নিমন্ত্রণ করে আনার মধ্যেও যে এ ধরনের একটা জাঁক দেখানোর ব্যাপার আছে, সেটা ক্রমাগত টের পেতে আরম্ভ করেছি। দুরদানা বাংলাদেশে ভীষণ আলোচিত মহিলা। তাকে নিয়ে ফাজিল কলাম লেখকেরা রবিবাসরীয় সংখ্যায় আজেবাজে ফিচার লেখে। কেউ কেউ অবশ্য ভালো কথাও লিখে থাকে। সবকিছু মিলিয়ে দুরদানার একটা ভাবমূর্তি দাঁড়িয়ে গেছে। সেই জিনিসটি খানে খানানের বন্ধু-বান্ধবের কাছে জানান দেয়ার জন্যই আজকের এই

আয়োজন। দুরদানাই আজকের নিমন্ত্রণের প্রধান উপলক্ষ। আমি ফাউ ছাড়া কিছু নই। যেহেতু একা নিমন্ত্রণ করলে দুরদানা আসবে না, তাই আমাকেও ডাকা হয়েছে। আমার ভীষণ খারাপ লাগছিলো।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। ঘরের ভেতর বিসমিল্লাহর শানাইতে মেঘমল্লার বেজে চলেছে। নিসর্গের সঙ্গীত ধারার সঙ্গে বিসমিল্লাহর শানাইয়ের সুর মিলেমিশে কী অপূর্ব মায়ালোকের জাদু রচনা করে যাচ্ছে। আমি দু'চোখ বন্ধ করে আছি। সুরের সূক্ষ্ম কারুকাজের প্রতিটি মোচড় আমার ভেতরের গোপন দরোজা একটা একটা করে খুলে দিচ্ছে। মুহূর্তেই আমি অপার্থিব জগতের বাসিন্দা হয়ে গেলাম। জগতে এতো সুন্দর জিনিশ আছে! অকারণে আমার দু'চোখ ঠেলে পানি বেরিয়ে আসতে চাইছে। আহা, কতোদিন এমন হৃদয় দ্রাবক বাজনা শুনি নি! খানে খানান দুরদানার সঙ্গে বকর বকর করছে। বিসমিল্লাহ খানের শানাই, আকাশে তুমুল বৃষ্টি আর এদিকে বাড়িতে রান্না হচ্ছে খিচুড়ির সঙ্গে হাঁসের ভুনা মাংস। সবকিছুর এক আশ্চর্য মনিকাঞ্চন সংযোগ। তার বন্ধুবান্ধব যারা আসবে, তাদেরও কেউ ফ্যালনা মানুষ নয়। ধানমণ্ডি থেকে আসবে মনসুর। তার বাবা লয়েড ব্যাঙ্কের জিএম। আর আসছে বনানী থেকে মেহবুব। সে আগামী সপ্তাহে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্যে আচমকা চলে যাচ্ছে। আসবে জুম্মন খাঁ, বাংলাদেশী পপ গানের রাজা। গান গেয়ে জুম্মন শহর-বন্দর মাত করে ফেলেছে। এমনি করে খানে খানান সম্ভাব্য অতিথিদের নাম বলে নিজে উদ্দীপিত হয়ে উঠছিলো এবং আমাদেরও তাক লাগিয়ে দিচ্ছিলো। তার বাড়িতে এসেছি, বাজনা শুনছি এবং একবেলা ভালো খাবো তার কথা না শুনে উপায় কি। কিন্তু বিসমিল্লাহ খানের রেকর্ডটাই যতোসব গোলমাল বাধিয়ে দিলো। এক জায়গায় আটকে গিয়ে ঘ্যার-ঘ্যার আওয়াজ করতে লাগলো। পিনটা সঞ্চালিত হচ্ছিলো না। আমি খানে খানানকে ডেকে বললাম, দোস্ত, এরকম ঘ্যার-ঘ্যার আওয়াজ আসছে কেনো? সে বললো, রেকর্ডটার এক জায়গায় ফাটা আছে। সেখানটায় আটকে গিয়েছে। দাঁড়াও বদলে দিই।

ঠিক এই সময় আমরা বাইর থেকে দরজা-জানালায় প্রচণ্ড ধাক্কানোর আওয়াজ শুনতে পেলাম। ভেতরের ঘরে বসে আছি। তবুও একসঙ্গে অনেক মানুষের গলার আওয়াজ এবং চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। এমন বিশ্রী সব গালাগাল করছে, শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। খানে খানান দ্রুত দরোজার দিকে উঠে গেলো এবং ফাটা রেকর্ডটা সেই একই জায়গায় ক্যার ক্যার শব্দ তুলে ঘুরতে লাগলো। না আমি, না দুরদানা—কেউই প্লেয়ারটা বন্ধ করে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম না। খানে খানানের সঙ্গে বাইরের লোকজনের তখন উত্তপ্ত বাদানুবাদ চলছে। সব কথা আমাদের কানে আসছে।

কিছুক্ষণ পর খানে খানান ঘরে ঢুকে ফিসফিস করে বললো, দোস্ত, মস্তবড়ো মুসিবত। ভয়ে তার মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে। ঠিকমতো আওয়াজ বের হচ্ছিলো না। সে ফিসফিস করে কখনো থেমে, কখনো তুতলিয়ে যা বললো, তার অর্থ দাঁড়ায় এরকম : গত বছর দুরদানা এই পাড়ার টিঙ্কু নামের একটা ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পিটিয়েছিলো। সেই ছেলেটাই আমার সঙ্গে দুরদানাকে এই বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে।

টিঙ্কু অনেক লোকজন নিয়ে এসে বাড়ি ঘেরাও করেছে। তারা বলছে, তাদের হাতে দুরদানাকে তুলে দিতে হবে। নইলে দরজা ভেঙে তারা ঘরে ঢুকবে এবং দুরদানাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। সে কাঁপতে কাঁপতে বললো, আমি বলেছি, তোমরা এসেছিলে, কিন্তু চলে গিয়েছো। যদি ঘরে ঢুকে তোমাদের পায়, দুরদানাকে তো নিয়ে যাবেই, আবার ঘরবাড়ি ভেঙেচুরে আস্ত রাখবে না। এখন উপায় ?

এটা নতুন নয়। এরকম বহু অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। আমরা দু'জন চুপচাপ কাউকে কিছু না বলে পেছন দিককার কিচেনের পাশের দরজাটা খুলে দু' বাড়ির সীমানা-দেয়ালের মধ্যবর্তী আধ হাত প্রস্থ সরু পথ ধরে যতোটা সম্ভব দ্রুত অগ্রসর হতে থাকলাম। পথটা পার হয়ে বড়ো রাস্তায় এসে পড়লাম। তুমুল বর্ষার কারণে রাস্তায় মানুষজন ছিলো না। সেটা আমাদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। অনেকটা পথ পার হয়ে বলধা গার্ডেনের সামনে এসে যখন একটা খালি রিকশায় উঠে বসলাম, তক্ষুনি ধারণা জন্মালো আমরা এবারের মতো বেঁচে যেতে পেরেছি।

রিকশায় উঠেই প্রথম টের পেলাম আমাদের পরনের কাপড়চোপড়ের সব ভিজে চুপসে গেছে। দুরদানার দিকে তাকানোর উপায় ছিলো না। তার জামা দ্বিতীয় চামড়ার মতো বুকের সঙ্গে একসা হয়ে লেগে রয়েছে। স্তন দুটো ফুটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমার কেমন লজ্জা লাগছিলো। বৃষ্টি হচ্ছিলো আর তার সঙ্গে হাওয়া দিচ্ছিলো। অকাল বৃষ্টি। ভীষণ শীত লাগছিলো। হঠাৎ করে আমি একটা কাজ করে বসলাম। দুরদানার মুখটা নিজের কাছে টেনে এনে চুমু দিতে লাগলাম। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামছে। শোঁ শোঁ হাওয়া বইছে। এমন জোরে বইছে যে, মাঝে মাঝে রিকশাসুদ্ধ আমাদের উড়িয়ে নিতে চাইছে। আমার মনে হলো, সব মিথ্যে, বৃষ্টি মিথ্যে, হাওয়ার বেগ মিথ্যে। কেবল এই চুমুটাই সত্যি। আমি জানতাম না দুরদানাকে চুমো দেয়ার আকাঙ্ক্ষা আমি কতোদিন থেকে রক্তের ভেতরে লালন করে আসছিলাম। যেহেতু আমার দুরদানার মুখ চুম্বন করতে হবে, সে জন্যেই খানে খানানের বাড়িতে টিঙ্কু দলেবলে হামলা করেছিলো। আমাদের জন্যই এমন প্রবল বেগে হাওয়া বইছে, এমন মুষলধারে বিষ্টি পড়ছে। এই বজ্র-বিদ্যুতে আঁকা বর্ষণ মুখর রাতটা আমাদের।

রিকশাঅলাকে বাতাসের প্রতিকূলে যেতে হচ্ছিলো। সে জন্য অত্যন্ত ধীরগতিতে সে এগুচ্ছিলো। যতো ইচ্ছে আস্তে যাক, দুরদানার নাখালপাড়ার বাড়িতে পৌঁছুতে বাকি রাত কাবার হয়ে যাক, কিছু যায় আসে না। দুরদানা সরে এসে আমার আরো কাছ ঘেঁষে বসলো। আমি তার কাঁধে হাত রাখলাম। মাথার ভিজে চুলের গন্ধ নিলাম। এক সময়ে তার বুকে হাত রাখলাম। ভীত-সঙ্কুচিত পায়রার ছানার মতো দুটো স্তন স্পর্শে কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমি স্তন দুটো নিয়ে খেলা করতে আরম্ভ করলাম। আমার সমস্ত চেতনা তার স্তন যুগলের ওঠা-নামাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছিলো। এই তুরীয় অবস্থার মধ্যেও একটা জিনিস আমার কাছে ধরা পড়লো। দুরদানার বাম স্তন ডানটির তুলনায় অনেক পরিমাণে ছোটো। আমার মনে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকলো, এ কেমন করে হলো! বাম স্তনটা ছোটো কেনো ? তারপর আরেকটা প্রশ্ন জন্ম নিলো। দুরদানার

বাম স্তনটা দৃষ্টির আড়াল করার জন্যেই কি সে এমন আঁটোসাঁটো শার্ট পরে বুকটা চেপে রাখে।

এই সময় রাস্তার লাইট চলে গেলো। দুরদানা বাচ্চা মেয়ের মতো আমার কাঁধের ওপর তার মাথাটা রেখে ফিসফিস করে বললো, জাহিদ ভাই, আমার খুব খারাপ লাগছে। পিরিয়ড শুরু হয়েছে। এখন ভীষণ ব্লিডিং হচ্ছে। গুলিস্তানে গিয়ে একটা বেবি ট্যাক্সি ধরবেন। তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়া প্রয়োজন। আমার ভেতরে বিস্ফোরণ হতে শুরু হয়ে গেলো। দুরদানারও তাহলে পিরিয়ড হয়! তার শরীর থেকে তীব্র বেগে রক্ত ধারা নির্গত হয়! দুরদানা আরেকটা চেহারা নিয়ে আমার কাছে ধরা দিতে আরম্ভ করেছে। অ-মেয়েমানুষ দুরদানা এতোদিন আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। তার মেয়েমানুষী পরিচয় বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি ভেতরে ভেতরে একরকম শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। একে নিয়ে আমি কি করবো ? একে তো কোনোদিন ভালোবাসতে পারবো না। গুলিস্তানে এসে একটা স্কুটারে চাপিয়ে তাকে নাখালপাড়া রেখে এলাম।

৮

মাস তিনেক পর। একরাতে ঘুমিয়ে আছি। হোস্টেলে একটা লোক এসে সংবাদ দিয়ে গেলো রাজাবাজারের বাসার কাছে কে-বা-কারা হুমায়ুনকে গুলি করে খুন করে গেছে। তাকে দেখার জন্য তাড়াতাড়ি হাসপাতালে ছুটলাম। আমি যখন গিয়েছি তখন সব শেষ। হুমায়ুনকে বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। নিথর নিস্তব্ধ। মাথার বাঁ-দিকটা একটা বড়োসড়ো আমের মতো ফুলে উঠেছে। আমার বুকটা জ্বালা করছিলো। হুমায়ুনের বউটার একটা বাচ্চা হয়েছে, তিন মাসও যায় নি। আমি কি করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। হাসপাতালেই কান্নাকাটির ধুম লেগে গিয়েছিলো। তার বউ ক্ষণে ক্ষণে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলছিলো।

আমার বন্ধু হাবিবুল্লাহ আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে কানে কানে বললো, জাহিদ ভাই, আপনি এখান থেকে তাড়াতাড়ি কোথাও চলে যান। একটু পরেই কে খুন করেছে তাই নিয়ে জল্পনাকল্পনা শুরু হবে। সবাই আপনাকে দায়ী করতে চেষ্টা করবে। কারণ ইউনুস জোয়ারদারের গ্রুপের সঙ্গে হুমায়ুনদের গ্রুপের অনেকদিন থেকে রাজনৈতিক শত্রুতা চলছে। হুমায়ুনকে নিশ্চয়ই ইউনুস জোয়ারদারের লোকেরাই খুন করেছে। আমার চট করে মনে পড়ে গেলো, হুমায়ুন আমাকে হাজি শাহবাজের মসজিদের পাশে একদিন বিকেল বেলা ডেকে নিয়ে দুরদানার সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করেছিলো।

আমি তার কথায় রাজি না হওয়ায় একটা পিস্তল বের করে আমাকে খুন করার ভয় দেখিয়েছিলো। আমি ভয় পেতে রাজি না হওয়ায় হুমায়ুন ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিলো। হায়রে হুমায়ুন, তুমি এমন করুণভাবে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছো! হুমায়ুনের মৃত্যুর পর থেকে মজিদ মামা, যিনি সব সময় ছোটো ছোটো পানের খিলি মুখে পুরে দিতেন, সাইকেলে যাওয়া-আসা করতেন, আর কোনোদিন তাঁর দেখা পাওয়া যায় নি।

প্রিয় সোহিনী, দুরদানার গল্পটা এরকমভাবে শেষ হয়েছে। তুমি খুব অবাক হচ্ছো, না? অমন জমজমাট একটা সম্পর্ক, বলা নেই, কওয়া নেই আপনা থেকেই ছেদ পড়ে গেলো! কিন্তু তার ভেতরের কাহিনী তোমার কাছে খুলে বলতে চাই। দুরদানা এবং আমি দু'জনাই অনুভব করেছিলাম, আমাদের ভেতরকার তাজা সম্পর্কটা আপনা থেকেই মরে যাচ্ছে। গাছের একটা ডাল যেমন করে শুকিয়ে যায়, প্রক্রিয়াটা অনেকটা সেরকম। আমরা দু'জনাই অনুভব করছিলাম যে আমাদের ভেতরে সম্পর্কের মধ্যে সেই সজীব রাসায়নিক পদার্থের ঘাটতি পড়তে শুরু করেছে। এখনো দুরদানা প্রায়ই আমার ঘরে আসে। তার সাইকেলের পেছনে চেপে আমি নানা জায়গায় যাই। মানুষ নানারকম অশ্লীল মন্তব্য ছুঁড়ে মারে, এসব আমার মন্দ লাগে না। একবার লালমাটিয়ার কাছে চারজন যুবক দুরদানাকে সাইকেল থেকে নামতে বাধ্য করে। আমাকেও বাধ্য হয়ে নামতে হয়। তারা দুরদানাকে কিছুই বললো না, কেবল আমাকে রাস্তার একপাশে নিয়ে গিয়ে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিলো। তাদের একজন বললো, হারামজাদা হিজরার বাচ্চা, নুনু কাইটা তুতে লাগিয়ে দিমু। একজন মাগির পেছনে সাইকেলে চেপে বেড়াতে শরম করে না? তারা সত্যি সত্যি আমার শরীর থেকে প্যান্ট খুলে নিয়ে উলঙ্গ করে রাস্তায় ছেড়ে দেয়ার জন্যে টানাটানি করছিলো। ভাগ্যিস পুলিশ এসে পড়েছিলো, তাই রক্ষে।

সেদিন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। ঠিক করলাম, আর দুরদানার সাইকেলের পেছনে চাপবো না। দুরদানাও তারপর থেকে আমাকে সাইকেলের পেছনে চাপতে বলে নি। তা সত্ত্বেও দুরদানা আমার কাছে আসতো, আমি দুরদানার কাছে যেতাম। এটা একটা পুরনো অভ্যেসের জের; ট্রেনের ইঞ্জিন বন্ধ করার পরেও যেমন অন্তর্গত বেগের ধাক্কায় কিছুদূর পর্যন্ত সচল থাকে, এও ঠিক তেমনি। আমাকে দেখে দুরদানার চোখের তারা নেচে উঠতো না। আমিও দুরদানাকে দেখে অস্তিত্বের গহনে সেই সজীব রাসায়নিক শক্তির প্রতিক্রিয়া অনুভব করতাম না।

কী একটা শক্তি আমাদের দু'জনের হাত ধরে দৃঢ়বেগে পরস্পরের বিপরীত দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলো। এই শক্তিটাকে ইতিহাস বলবো, না মহাকাল বলবো, এখনো স্থির করতে পারি নি। আমাদের জীবনের ভেতর দিয়ে মহাকাল কীভাবে কাজ করে, তার বিবরণ হাজির করতে চেষ্টা করবো এখানে।

হুমায়ুন খুন হওয়ার পর চারদিকে একটা জনরব উঠলো যে, ইউনুস জোয়ারদারের লোকেরাই তাকে খুন করেছে। হুমায়ুন যে গোপন রাজনীতির সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলো, সে বিষয়ে আমার সামান্যতম ধারণাও ছিলো না। হুমায়ুন যেসব কথা আমাকে

বলতো, যে ধরনের অস্থিরতা অনুভব করতো, সেসবের অর্থ আমার কাছে এখন জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো। লোকজনকে আরো বলাবলি করতে শুনলাম, হুমায়ুনের গ্রুপ একবার মাঝখানে ইউনুস জোয়ারদারের প্রাণের ওপর হামলা করেছিলো, তার বদলা স্বরূপ জোয়ারদারের গ্রুপ হুমায়ুনের প্রাণটা নিয়ে নিলো। হুমায়ুনের খুন হওয়ার পর মানুষজন নানারকম রটনা করতে আরম্ভ করলো। কেউ কেউ বললেন, যেহেতু দুরদানার সঙ্গে আমার একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে, তাই হুমায়ুনের খুন হওয়ার পেছনে আমারও একটা গোপন ভূমিকা ছিল। এই অভিযোগ আর কেউ নয়, উত্থাপন করলেন শিক্ষক শফিকুল ইসলাম। ব্যতিক্রমী মহিলাদের শফিক সাহেব তাঁর নিজের উদ্যানের ফল বলে মনে করতেন। আমার মতো একজন গাঁও-গেরামের মানুষ, একটা চিতা বাঘিনী চরিয়ে বেড়াবে, শফিক সাহেব এটা কিছুতেই মেনে নেন নি। তিনি মনে করতেন, তাঁর ব্যক্তিগত খেতে আমি বেড়া ভেঙে প্রবেশ করে অনধিকার চর্চা করছি। তিনি কখনো আমাকে ক্ষমা করতে পারেন নি। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর শফিক সাহেব বলে বেড়াতে থাকলেন, আমি হুমায়ুনের বিধবা বউকে বিয়ে করার জন্যেই তাকে খুন করেছি। তিনি ছিলেন সরকারি দলের লোক। অনেক মানুষ তার কথা বিশ্বাস করে ফেললেন। আমার যাওয়া-আসার পথে মানুষজন আমার দিকে আঙুল তুলে দেখাতে আরম্ভ করলো। সত্যি সত্যি আমিই হুমায়ুনকে খুন করেছি কি না, এমন একটা সংশয় আমার ভেতরেও জন্ম নিতে আরম্ভ করলো। খুনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও আমি নিজেকে খুনি ভাবতে আরম্ভ করলাম। মানুষ তো নিজের অজান্তেও অনেক জঘন্য অপরাধ করে বসে। সমস্ত ধর্মতো পাপ বোধের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু মানুষ হিসেবে তোমাকে জন্ম নিতে হয়েছে, তুমি পাপী।

এই সময় একদিন আরেক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে আমার হোস্টেলে দর্শন দিলেন সেই এসবি-র ইউনুস মোল্লা। ইউনুস মোল্লা নিজেকে মনে করতেন ইউনুস জোয়ারদারের মিতা। এই মিতার সম্পর্কে অল্পস্বল্প সংবাদ জানার জন্যেই আমার কাছে আসতেন। তিনি বলতেন, যেহেতু নামে নামে মিলে গেছে, তাই মিতার সম্পর্কে জানার অধিকার তাঁর আছে। আজ মোল্লা সাহেবের নতুন চেহারা দেখলাম। তিনি কোনোরকম ভণিতা না করেই জানালেন, আমাকে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে মালিবাগ স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসে যেতে হবে। না, ভয়ের কোনো কারণ নেই, এই যাবো আর আসবো। শুধু তারা আমার কাছ থেকে কিছু সংবাদ জানতে চান। পুরো দু'মাস ধরে আমাকে স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসে যেতে হলো এবং আসতে হলো। কতোরকম জেরার সম্মুখীন যে হতে হয়েছিলো, সে কথা বয়ান করে লাভ নেই। ওই পরিস্থিতিতে দুরদানার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। এছাড়া সে কোথায় যেনো আত্মগোপন করলো, কিছুই জানতে পারলাম না। মহাকালের খাঁড়ার আঘাতে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম।

জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ হবে। ইংরেজি কাগজের প্রথম পাতায় টুকরো একটা খবর পড়ে আমি চমকে উঠলাম। ইউনুস জোয়ারদার শট ডেড। এক কোণায় ইউনুস

জোয়ারদারের একটা ঝাপসা ছবি ছাপা হয়েছে। আমি নিজের চোখে কোনোদিন ইউনুস জোয়ারদারকে দেখি নি। এই ঝাপসা ছবিটাটর দিকে তাকানো মাত্রই আমার বুকে মমতার ঢেউ উথলে উঠলো। কি কারণে বলতে পারবো না, আমি মনে করতে আরম্ভ করলাম, ইউনুস জোয়ারদার আমার ভাই, আমার বন্ধু, আমার সন্তান। তাঁর মৃত্যু-সংবাদে আমার চোখের সামনেকার গোটা পৃথিবীটা দুলে উঠলো। তিনি আমার কেউ নন। তাঁর দলের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তবু আমার মনে হলো, আমার দু'চোখের দৃষ্টি নিভে গেছে। নিঃশ্বাস নিতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিলো। এই অবস্থায় দু'দিন পায়ে হেঁটে একা একা ঢাকা শহরের পথে পথে ঘুরে বেরিয়েছি। ইউনুস জোয়ারদার কোন্ জাদুমন্ত্র বলে, জানিনে, আমার ভেতরে অনাগত পৃথিবীর যে স্বপ্ন জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে সেই পৃথিবীটাই ছারখার হয়ে গেলো। আমি কেনো বেঁচে থাকবো! কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কারো কাছে প্রকাশ করে মনোবেদনা হালকা করবো, সে উপায়ও নেই। কে শুনবে আমি শোকভর্তি একটা জাহাজের মতো ঢাকা শহরে অনবরত পথ হাঁটছিলাম। তিনদিন পর গল-গল করে রক্তবমি করলাম এবং তিন মাসের জন্যে আমাকে হাসপাতালে স্থায়ী ডেরা পাততে হলো। কী করে যে বেঁচে ফিরে এসেছি, সেটা আমার কাছে এখনো অবিশ্বাস্য ব্যাপার মনে হয়।

প্রিয় সোহিনী, ইউনুস জোয়ারদার খুন হওয়ার একই বছর না যেতেই একদিন রেডিওতে ঘোষণা শুনলাম, দেশের রাষ্ট্রপতি, বাংলার নয়নমণি শেখ মুজিব সপরিবারে আততায়ীদের হাতে খুন হয়েছেন। প্রিয় সোহিনী, নীল নির্মেঘ আকাশ থেকে আমার মাথায় কে যেনো একটা তাজা বজ্র ছুঁড়ে দিলো। প্রিয় সোহিনী, আমি এক অভাগা, কেবল দুঃখের গাথা লেখার জন্যেই যেনো আমার জন্ম।

মহাকালের খাঁড়া আমার আর দুরদানার সম্পর্কই শুধু নষ্ট করে নি, এই খাঁড়া ঝলসে উঠে হুমায়ুনকে নিরস্তিত্ব করেছে, ইউনুস জোয়ারদারের গর্দান নিয়েছে, সপরিবারে শেখ মুজিবকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে। হুমায়ুন জোয়ারদারকে খুন করতে চাইলে, জোয়ারদার হুমায়ুনকে খুন করে বদলা নিলেন। শেখ মুজিব জোয়ারদারকে হত্যা করলেন। সেনাবাহিনীর জওয়ানরা শেখকে খুন করলো। জিয়া, তাহের, খালেদ মোশাররফ, মঞ্জুর—কাকে কার হত্যাকারী বলবো ? আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, মহাকালের খাঁড়ার আঘাতে তাঁদের একেকজনের মুণ্ডু ভাদুরে তালের মতো গড়িয়ে পড়লো। আমি কাকে কার বিরুদ্ধে অপরাধী বলে শনাক্ত করবো ? এঁরা সবাই দেশপ্রেমিক, সবাই স্বাধীনতা সংগ্রামী। জননী স্বাধীনতা মহাকালের রূপ ধরে আপন সন্তানের মুণ্ডু নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলতে আরম্ভ করেছে। প্রিয় সোহিনী, কার অপরাধ একথা জিগ্যেস করবে না। আমরা সবাই শরীরের রক্ত-প্রবাহের মধ্যে ঐতিহাসিক পাপের জীবাণু বয়ে বেড়াচ্ছি। সেই ইতিহাস প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। আমরা কেমন যুগে, কেমন দেশে জন্মগ্রহণ করেছি, ভাবো একবার!

প্রিয় সোহিনী, এরপর তুমি দুরদানা সম্পর্কে প্রশ্ন করে আমাকে বিব্রত করবে না আশা করি। তবু তোমার কৌতূহল দূর করার জন্য বলবো, সে এই ঢাকা শহরেই আছে। তার স্বামী-সংসার আছে, ছেলেমেয়ে আছে। চাকরিবাকরি করে। অবশ্য অনেক আগে

সাইকেল চালানো ছেড়ে দিয়েছে। এখন নিজের হাতে গাড়ি চালায়। এসব মামুলি সংবাদে আর কাজ কি ? তবু আমি অকপটে বলবো, দুরদানার কাছে আমার ঋণের পরিমাণ সামান্য নয়। তার স্পর্শেই আমি ইতিহাসের মধ্যে জেগে উঠতে পেরেছি। এ সামান্য ব্যাপার নয়। সব মানুষ জীবন ধারণ করে। কিন্তু ইতিহাসের স্পর্শ অনুভব করে না। আশা করি, এই ব্যাপারটাকে তুমি প্রকৃত গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করতে চেষ্টা করবে। দুরদানার প্রতি কোনোরকম সন্দেহ-সংশয় মনের কোঠায় এক পলকের জন্যও ঠাঁই দেবে না। এই যে আমি তোমার অভিমুখে যাচ্ছি দুরদানা হচ্ছে তার প্রথম মাইলফলক। দুরদানা একা নয়, আরো অনেক নারীর জীবন আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাদের সবার কথা আমাকে তোমার কাছে বলতে হবে। নইলে আমি তোমার দিকে যাওয়ার শক্তি এবং নির্ভারতা অর্জন করতে পারবো না। আগেই বলেছি, কাজটা কঠিন, খুবই কঠিন। পাঁজরে পাঁজরে আঘাত করে অস্তিত্বের ভেতর থেকে নিমজ্জিত নারীদের তুলে আনতে হচ্ছে। প্রিয়তমা আমার, সুন্দরী আমার, তুমি আমাকে এই দুঃসাধ্য দায়িত্ব সম্পাদনের সাহস দিয়েছো, প্রেরণা দিয়েছো। তুমি আমার ভবিষ্যৎ। আমার ভবিষ্যৎ আছে বলেই আমি অতীতকে আবিষ্কার করতে পারছি। যদি তোমাকে ভালো না বাসতাম, এই কাহিনী কোনোদিন লিখতে পারতাম না। আমি নিজের কাছে নিজে শুদ্ধ হয়ে ওঠার তাগিদেই আমার জীবনের নারীদের কথা বয়ান করে যাচ্ছি। প্রেয়সী আমার, প্রিয়তমা আমার, আমার জীবনে এতো বিচিত্র ধরনের নারীর আনাগোনা দেখে আমাকে ঘৃণা করো না। মানুষ একজন মাত্র নারীকেই মনে-প্রাণে কামনা করে। আর সেই সম্পূর্ণ নারী জগতে মহামূল্যবান হীরক খণ্ডটির চাইতেও দুর্লভ। তাই খণ্ড-খণ্ড নারীকে নিয়েই মানুষকে সন্তুষ্ট থাকার ভান করতে হয়। তোমার মধ্যে একটা অখণ্ড নারীসত্তার সন্ধান আমি পেয়েছি। আমার কেমন জানি আশঙ্কা হয়, এই কাহিনী যখন আমি শেষ করবো, তুমি হয়তো এই বিশাল পৃথিবীর কোথাও হারিয়ে যাবে। তবু আমার সুখ, আমার আনন্দ, আমার প্রাণের সমস্ত উত্তাপ কেন্দ্রীভূত করে একটি সম্পূর্ণ নারীকে আমি ভালোবাসতে পেরেছি। জীবনে ভালোবাসার চাইতে সুখ কিসে আছে ?

৯

প্রিয় সোহিনী, মৃগনয়না আমার, এবার আমি তোমার কাছে কন্যা শামারোখের কাহিনী বয়ান করতে যাচ্ছি। একটুখানি চমকে উঠছো, না ? ভাবছো, শামারোখের নামের সঙ্গে হঠাৎ করে কন্যা শব্দটি যোগ করলাম কেনো ? কারণ তো একটা অবশ্যই আছে। সেই কারণ ব্যাখ্যা দাবি করে। শামারোখের সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার অন্তত বারো বছর

আগে তার কুমারী জীবনের অবসান ঘটেছে। আর আট বছর আগে স্বামীর কাছে একটি পুত্র সন্তান রেখে দাম্পত্য সম্পর্কের ছেদ টেনে বেরিয়ে এসেছে। এই বেরিয়ে আসা জীবনে তার হৃদয়ের স্বল্পকালীন, দীর্ঘকালীন নানা অগ্ন্যুৎপাতের সংবাদও আমি বিলক্ষণ জানি। সুন্দরী মহিলাদের নামের সঙ্গে যখন হৃদয়ঘটিত অপবাদ যুক্ত হয়, তখন তাদের সৌন্দর্য এবং আকর্ষণ ক্ষমতা অনেক অনেক গুণে বেড়ে যায়। নীতিবাগীশেরা শামারোখের জীবনের অতীত বৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করে নানান দাগে দাগী হিসেবে তাকে চিহ্নিত করবে, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমি যখন তাকে প্রথম দেখি, আমার মনে হয়েছিলো, সৃষ্টির প্রথম নারীর সান্নিধ্যে এসে দণ্ডায়মান হয়েছি। এই অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী আমাকে দিয়ে যা-ইচ্ছে-তাই করিয়ে নিতে পারে। তার একটি কটাক্ষে আমি মানব সমাজের বিধিবিধান লংঘন করতে পারি। তার নির্দেশে সমস্ত নিষেধ অগ্রাহ্য করে হাসিমুখে ঈশ্বরের অভিশাপ মস্তকে ধারণ করতে পারি। শামারোখকে প্রথমবার দর্শন করার পর আমার যে অনুভূতি হয়েছিলো প্রকাশ করার জন্যে আমাকে কবির শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। কবিরা ভালো মানুষ। আমরা অনেক সময় মনের ভেতর ঘাই-মারা অনুভূতি প্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পাইনে, কবিরা আমাদের মতো অক্ষম মানুষদের কথা চিন্তা করে আগেভাগে সেসব সুন্দরভাবে প্রকাশ করে রেখেছেন। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে রেডিমেড জামা-কাপড়ের মতো সেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। শামারোখকে প্রথম দেখার পর আমার মনে এই পঙ্‌ক্তিগুলো বিদ্যুতের মতো চমক দিয়ে জেগে উঠেছিলো :

'ষষ্ঠ দিন শ্রম যাচে প্রভু,
অপূর্ব বিস্ময় ভরে করে উচ্চারণ
পরবর্তী সৃষ্টি হবে দিব্যি অনুপম।
তখনই ডাগর আঁখি মেলেছে নন্দিনী
মরি, মরি দৃষ্টি হেরি,
আপন অন্তর তলে বিধাতাও
উঠেছি শিহরি।'

সেই সৌন্দর্য দেখার পর স্বয়ং স্রষ্টা মহাশয়কেও নিজের হৃদয়-গভীরে শিউরে উঠতে হয়। সেই একই স্বর্গজাত সৌন্দর্যের প্রতি তাজিমের নিদর্শনস্বরূপ শামারোখের নামের সঙ্গে কন্যা শব্দটি যোগ করলাম। প্রিয় সোহিনী, এই 'কন্যা' শব্দটি যুক্ত করে আমি মস্ত বিপাকে পড়ে গেলাম। তুমি প্রশ্ন করবে, যে মহিলা স্বামী-পুত্র ছেড়ে বেরিয়ে আসে, যেখানে-সেখানে হৃদয়ের অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়, তার কন্যাত্ব বহাল থাকে কেমন করে? আমি তর্ক করার মানুষ নই। তবু প্যাঁচালো বিতর্কে যাতে জড়িয়ে পড়তে না হয়, তাই সময় থাকতে বলে রাখতে চাই, কোনো কোনো নারী আছে যারা সবসময় কন্যাত্ব রক্ষা করে চলতে পারে। সন্তান জন্ম দিলে বা পুরুষ বদলালে তাদের কন্যা-জীবনের অবসান ঘটে না। প্রিয় সোহিনী, আমি ধরে নিচ্ছি, শামারোখ সম্বন্ধে তোমার মনে একটি সহানুভূতির ভাব সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং আমি নির্বিবাদে তার কাহিনীটা তোমার কাছে প্রকাশ করতে

পারি। সুন্দরের প্রতি সহানুভূতি জিনিশটার একটা খারাপ দিক আছে। ইচ্ছে করলেও তাকে খারাপভাবে আঁকা সম্ভব হয় না। তাই, শামারোখ আসলে যা ছিলো, আর আমি যা বয়ান করছি, তার মধ্যে একটা হেরফের থেকেই যাচ্ছে।

কন্যা শামারোখের সঙ্গে কিভাবে পরিচয় ঘটলো, সে ঘটনাটি আমি তোমার কাছে তুলে ধরতে চাই। ঘটনা বললে সুবিচার করা হবে না। পেছনে একটা ইতিহাস আছে। সেটা বিবৃত করছি। একদিন বিকেল বেলা হোস্টেলে ঘুম থেকে উঠে স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। ঘুমের মধ্যে আমি মাকে স্বপ্ন দেখলাম। তিন মাস আগে মা মারা গেছেন। আমি তাঁর একমাত্র ছেলে। মায়ের মৃত্যুর সময় আমি কাছে ছিলাম না। মৃত্যুর পর এই প্রথমবার তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম। পুরো স্বপ্নটা অস্পষ্ট এবং ঝাপসা। বারবার একাগ্র মনোযোগে স্বপ্নটা জীবিত করার চেষ্টা করছি। এই সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। দরজা খুলে দেখি ইংরেজি বিভাগের পিয়ন বাটুল। এই লম্বা লিকলিকে চেহারার তরুণটির নাম বাটুল কেনো, আমি বলতে পারবো না। যাহোক, সে আমাকে সালাম করার পর জানালো বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরী আমাকে সালাম দিয়েছেন। অতএব, আমাকে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে পায়ে স্যান্ডেল গলিয়ে আর্টস বিল্ডিংয়ের দোতলায় সালামের তত্ত্ব নিতে ছুটতে হলো।

আমি দরজা ঠেলে বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. শরিফুল ইসলামের অফিস ঘরে প্রবেশ করলাম। কারেন্ট নেই, পাখা চলছে না। বেশ গরম। ড. চৌধুরী জামার বোতাম খুলে ফেলেছেন। তাঁর বুকের লম্বা লম্বা লোমগুলো দেখা যাচ্ছে। বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর ছড়ানো বই-পুস্তক। তিনি কিছু একটা লিখছিলেন। আমাকে দেখে হেসে উঠতে চেষ্টা করলেন। ড. চৌধুরীকে হাসতে দেখলে আমার একটা কথা মনে হয়। ভদ্রলোক ওই হাসিটা যেনো দোকান থেকে কিনে এনেছেন। এমনিতে কৃষ্ণকান্তি, যখন গাম্ভীর্য অবলম্বন করেন, বেশ মানিয়ে যায়। কিন্তু তিনি যখন বড়ো দাঁতগুলো দেখিয়ে এক ধরনের যান্ত্রিক শব্দ তুলে হেসে ওঠেন, সেটাই আমার কাছে ভয়ঙ্কর বিদ্ঘুটে মনে হয়।

আমার ভাগ্য ভালো বলতে হবে। হাসিটা অল্পের মধ্যেই তাঁর প্রসারিত মুখগহ্বরের ভেতর কোথাও উধাও হয়ে গেলো। তিনি একটু তোয়াজ করেই বললেন, বসো জাহিদ। পকেটে সিগারেট থাকলে খেতে পারো। কোনোরকম সঙ্কোচ করার প্রয়োজন নেই। আমি বাটুলকে চা আনতে বলেছি। আর পাঁচ-ছ'টা লাইন লিখলেই হাতের লেখাটা শেষ হয়ে যাবে।

আমি সিগারেট ধরালাম। তিনি লেখা শেষ করছেন। এরই মধ্যে বাটুল চা দিয়ে গেলো। হাতের লেখা কাগজের স্লিপগুলো পিন দিয়ে গেঁথে একটা ফাইলের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন। ততোক্ষণে পাখা চলতে আরম্ভ করেছে। তিনি গ্লাস থেকে পানি খেয়ে মন্তব্য করলেন, বাঁচা গেলো। আজ সারাদিন যা গরম পড়েছে। তারপর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, তোমার চেয়ারটা একটু এদিকে নিয়ে এসো। আমি চেয়ারটা তাঁর মুখোমুখি নিয়ে গেলাম। চা খাওয়া শেষ হলে তিনি জামার খুঁটে চশমার কাচ দুটো মুছে আমার দিকে ভালো করে তাকালেন। তারপর বললেন, তোমাকে একটা দুঃখের কথা বলতে

ডেকে এনেছি। আমার শরীরে একটা আনন্দের লহরি খেলে গেলো। তাহলে তিনি আমাকে তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখের কথা বলার উপযুক্ত মানুষ ধরে নিয়েছেন। নিজের কাছেই আমার মূল্য অনেকখানি বেড়ে গেলো। কোনো সুন্দরী মহিলা যদি বলতেন, আমি তোমাকে ভালোবাসি, অতোখানি খুশি হয়ে উঠতাম কি না সন্দেহ। ড. চৌধুরীর বুকের ভেতরে নিবিড় যত্নে পুষে রাখা দুঃখের কথাটা শোনার জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

বাটুলকে ডেকে চায়ের খালি কাপ এবং গ্লাস নিয়ে যেতে বললেন। তারপর আমার দিকে তাকালেন, শোনো, তামার গুরু আবুল হাসানাত সাহেবকে থামাও। তিনি আমাদের ডিপার্টমেন্টকে নষ্ট করে ফেলার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন। তাঁর কথা শুনে আমি তো সাত হাত জলে পড়ে গেলাম। আবুল হাসানাত বুড়ো মানুষ। বেশ কিছুদিন আগে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে রিটায়ার্ড করেছেন। চিরকুমার। রান্নাবান্না, বাজার, দাবা এবং বই নিয়ে সময় কাটান। কারো সাতে-পাঁচে থাকেন না, তিনি কী করে ইংরেজি ডিপার্টমেন্টকে নষ্ট করবেন। ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরীর অভিযোগটা আমার কাছে হেঁয়ালির মতো শোনালো। সত্যি সত্যিই বলছি, এরকম একটা কথা তাঁর মুখ থেকে শুনবো, তার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

ড. চৌধুরীর কথার মধ্যে উত্তাপ ছিলো, ঝাঁঝ ছিলো। দেখতে পেলাম তার কালো মুখমণ্ডলটা লাল হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। আমি বুঝতেই পারছিলাম না, তিনি আবুল হাসানাত সাহেবের ওপর অতোটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন কেনো? অবশেষে ড. চৌধুরী আমার কাছে তাঁর ক্ষোভ-দুঃখ এবং মনোকষ্টের আসল কারণটা খুলে বললেন। এই ঢাকা শহরে বীণা চ্যাটার্জির মতো এক সুন্দরী মহিলা এসেছে এবং এসেই মহিলা আবুল হাসানাত সাহেবের ঘাড়ের ওপর চেপে বসেছে। আবুল হাসানাত সাহেব সেই সন্দেহজনক চরিত্রের মহিলাটিকে ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে চাপিয়ে দিতে চাইছেন। ভাইস চ্যান্সেলর আবুল হাসানাতের আপন মানুষ। চেষ্টা করেও কোনোভাবে ঠেকাতে পারছেন না। যদি একবার এই মহিলা ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক হওয়ার সুযোগ পায়, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক চরিত্র বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

আমি একটুখানি ভাবনায় পড়ে গেলাম। বীণা চ্যাটার্জি সম্পর্কে আমি জানতাম। এই মহিলার আদি নিবাস কলকাতায়। এখন আমেরিকা, বিলাত, না ফ্রান্স—কোথায় থাকেন, সঠিক কেউ বলতে পারে না। মহিলার খেয়াল চেপেছিলো, তাই সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশে এসেছিলেন। চেষ্টা-চরিত্র করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর কপালে ভাইফোঁটা পরিয়ে দিয়েছিলেন। এই দৃশ্যটি টিভিতে দেখানো হয়েছিলো। দু'দিন পরেই রয়টার একটি সংবাদ প্রকাশ করে সবাইকে জানিয়ে দেয়, বীণা চ্যাটার্জি আসলে একজন আন্তর্জাতিক পতিতা। তাই নিয়ে একটা মস্ত কেলেঙ্কারি হয়েছিলো। একজন সুন্দরী পতিতা কী করে প্রধানমন্ত্রী অবধি পৌঁছুতে পারে, একটা দৈনিক প্রশ্ন তুলেছিলো। কিন্তু একজন সুন্দরীর গতিবিধি কতোদূর বিস্তৃত হতে পারে, সে ব্যাপারে সেই দৈনিকের কলাম লেখক ভদ্রলোকের কোনো ধারণা ছিলো না।

আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত স্বরে ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরীকে বললাম, বীণা চ্যাটার্জির সঙ্গে ওই মহিলার মিল থাকতে পারে, কিন্তু আবুল হাসানাত সাহেবের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? কী সম্পর্ক এখনো বুঝতে পারলে না, তিনি চোখ ছোট করে একটা ইঙ্গিত করলেন। কী সম্পর্ক যদি এখনো বুঝতে না পারো, তাহলে তুমি মায়ের পেটে আছো। বুঝলে, মেয়েমানুষ, তাও আবার যদি সুন্দরী হয়, তার ফাঁদ থেকে আর কারো রক্ষে নেই। তোমার গুরু ওই মেয়েমানুষটার পাল্লায় পড়ে সব ধরনের অপকর্ম করে বেড়াচ্ছেন। ঠ্যাকাও। এখনো যদি ঠ্যাকাতে না পারো, সামনে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না।

আমি বললাম, স্যার, আপনার কথা যদি সত্যিও হয়, আমি কি করতে পারি? তিনি পেপার ওয়েটটা তুলে নিয়ে টেবিলে দুম করে রাখলেন। তোমরা চারদিকে বলে বেড়াচ্ছো মুক্তিযুদ্ধ করেছো, যদি এতো বড় অন্যায়টা আটকাতে না পারো, তাহলে মুক্তিযুদ্ধ যে করেছো, আমরা কি করে সেটা বিশ্বাস করবো? স্পষ্টত বিরক্ত হয়েই ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরীর অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। তাঁর চরিত্রের একটা নতুন দিক দেখতে পেলাম। আবুল হাসানাত সাহেব একজন মহিলার সৌন্দর্যে অবিভূত হয়ে তাঁকে ইংরেজি ডিপার্টমেন্টের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরের চাকরি দেয়ার জন্যে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন, কথাটা আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হেঁটে হেঁটে আমি শাহবাগের দিকে যাচ্ছিলাম। আমার মনে নানা রকম চিন্তা ঝিলিক দিচ্ছিলো। এক সময়ে ভাবতে আরম্ভ করলাম, আবুল হাসানাত সাহেব যদি সত্যি সত্যিই সুন্দরী এক মহিলার প্রেমে পড়েও থাকেন, তাতে দোষের কি আছে? তাঁর বয়স সবে ষাট পেরিয়েছে। বৃটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল উননব্বুই বছর বয়সে উনিশ বছরের মেয়েকে বিয়ে করেছেন। আবুল হাসানাত সাহেবকে সারাজীবন নারী সঙ্গ বর্জিত অবস্থায় কাটিয়ে কেনো অন্যের প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে? ব্যাপারটা চিন্তা করতে পেরে আমার ভীষণ ভালো লাগলো। নিজে নিজেই হাততালি দিয়ে উঠলাম। আবুল হাসানাত স্যার যদি হুট করে একটি সুন্দরী মহিলাকে বিয়েও করে ফেলেন, বেশ হয়। নতুন একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হবে। যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখলে অনেক কিছুই তো সম্ভব মনে হয়। বাস্তবে কি সব তেমনি ঘটে?

ড. শরিফুল ইসলামের কথাগুলো কতোদূর সত্যি পরখ করে দেখার একটা ইচ্ছে আমার মনে তীব্র হয়ে উঠলো। আমি সরাসরি শাহবাগ থেকে রিকশা চেপে টিচার্স ক্লাবে চলে এলাম। ক্লাবের লাউঞ্জে ঢুকে দেখি আবুল হাসানাত সাহেব দৈনিক বাংলার সালেহ চৌধুরীর সঙ্গে দাবা খেলছেন। আমি সেখানে গিয়ে বসলাম। তাঁরা দু'জন খেলায় এমন বিভোর যে, আমি পাশে বসেছি কারো চোখে পড়ে নি। দান শেষ হওয়ার পর সালেহ চৌধুরী আমাকে জিগ্যেস করলেন, কখন এসেছো? আবুল হাসানাত সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মৌলবী জাহিদ হাসান, কি খবর? তিনি আমাকে কেন মৌলবী সম্বোধন করেন, তার কারণ আমি কোনোদিন নির্ণয় করতে পারি নি। হাতের ইশারায় বেয়ারাকে ডাকলেন। বেয়ারা এসে দাঁড়ালে তিনি বললেন, মৌলবী জাহিদ হাসানকে এক পেয়ালা চা দাও, আর কি খাইবার চায় জিগাইয়া দ্যাখো। খেলা শেষ হতে সাড়ে দশটা বেজে গেলো।

আবুল হাসানাত যখন বাড়ির দিকে পথ নিয়েছেন আমি তাঁকে অনুসরণ করতে থাকলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর তিনি আমাকে অনুসরণ করতে দেখে জিগ্যেস করলেন, আপনে কিছু কইবেন নিকি? আবুল হাসানাত সাহেব সবসময় ঢাকাইয়া ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। ঢাকাইয়া ভাষায় যে কোনো ভদ্রলোক পরিপাটি আলাপ করতে পারেন, আবুল হাসানাত সাহেবের কথা না শুনলে কেউ সেটা বিশ্বাস করতে পারবে না। আমি বললাম, স্যার, আমি কি আপনার সঙ্গে আপনার বাড়িতে আসতে পারি? তিনি বললেন, কোনো জরুরি কাম আছে নিকি? আমি বললাম, একটু আছে। তিনি বললেন, ঠিক আছে, আইয়েন। তারপর আর কথাবার্তা নেই, দু'জন হাঁটতে থাকলাম।

বাড়িতে পৌঁছুবার পর তিনি বললেন, আপনে একটু বইয়েন। তিনি পাজামাটা ছেড়ে লুঙ্গি পরলেন। লুঙ্গিটা নানা জায়গায় ছেঁড়া দেখে আমার অস্বস্তি বোধ হচ্ছিলো। তাঁর সেদিকে খেয়াল নেই। হুঁকোয় টান দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আইছেন কিয়রলায়, হেইডা কন। আমার শরীর ঘামতে আরম্ভ করেছে। বার বার চেষ্টা করলাম। ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরী যে কথাগুলো আমাকে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, সেভাবে উচ্চারণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আমতা আমতা করতে আরম্ভ করলাম। আবুল হাসানাত স্যার মোলায়েম একটা ধমক দিয়ে বললেন, কি কওনের আছে কইয়া ফ্যালেন। আমি কোনোরকমে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে বলতে থাকলাম, আজ বিকেল বেলা ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরী আমাকে হোস্টেল থেকে তাঁর অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর বলেছেন, আপনি নাকি ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে একজন খারাপ অথচ সুন্দরী মহিলাকে চাকরি দেয়ার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। তাছাড়া আরো অনেক খারাপ কথা বলেছেন, সেগুলো আমি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারবো না।

আমার কথা শুনতে শুনতে তাঁর হুঁকো টানা বন্ধ হয়ে গেলো। তিনি চশমা জোড়া খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর আমার চোখের ওপর তাঁর চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ইংরেজিতেই বলতে থাকলেন, ওয়েল আই ইউজড টু নো দ্যাট ইয়ংম্যান সালমান চৌধুরী। ফর সামটাইম উয়ি শেয়ারড সেম ফ্ল্যাট ইন লন্ডন। মোস্ট অফটেন দ্যাট গার্ল শামারোখ ইউজড টু ভিজিট সালমান এ্যান্ড দে ওয়ার ভেরি ক্লোজ। তারপর ঢাকাইয়া জবানে বলতে থাকলেন, চার-পাঁচ দিন আগে দুইজন একলগে আমার বাড়িতে আইস্যা কইলো, শামারোখের নিকি ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে চাকরি অইছে। কিন্তু শরীফ তারে জয়েন করতে দিতাছে না। দে রিকোয়েস্টেড মি টু ইনকোয়ার হোয়েদার শরীফ ওয়ান্টস হার এ্যাট অল ইন হিজ ডিপার্টমেন্ট। আমি শরীফরে জিগাইলাম, বাবা, মাইয়াডারে তুমি চাকরি দিবা। শরীফ প্লেইন জানাইয়া দিলো, হে তারে নিবো না। দিজ ইজ অল। হোয়েন সালমান কেম এগেইন, আই টোল্ড হিম, শরীফ ডাজ নট ওয়ান্ট হার ইন হিজ ডিপার্টমেন্ট। আমি বললাম, তিনি তো আমাকে অনেক আজেবাজে কথা বলেছেন। আবুল হাসানাত সাহেব আমার চোখের ওপর চোখ রেখে বললেন, মৌলবী জাহিদ হাসান, আই ন্যারেটেড দ্যা ফ্যাক্ট টু ইউ। লেট শরীফ টেল, হোয়াটেভার হি ওয়ান্টস। তারপর

তিনি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে হুঁকো টানতে আরম্ভ করলেন। সেই দিনই ড. শরিফুল ইসলামের প্রতি একটা খারাপ মনোভাব জন্ম নিলো। মুখ দিয়ে তেতো ঢেকুর উঠতে থাকলো। আমি যখন চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি, আবুল হাসানাত সাহেব বললেন, অতো রাইতে খাবার পাইবেন না, খাইয়া যাইবেন।

প্রতিটি ঘটনার একেকটা মর্মবেগ থাকে। যখন ঘটতে আরম্ভ করে এক জায়গায় স্থির থাকে না, অনেক দূর গড়িয়ে যায়। কন্যা শামারোখের সঙ্গে আমিও জড়িয়ে গেলাম। আবুল হাসানাত সাহেবের সঙ্গে কথা বলার তিন-চারদিন পর আমি বাংলা একাডেমিতে গিয়েছিলাম। আমাদের একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। সে উপলক্ষে বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে চাঁদা ওঠাচ্ছিলাম। আসলে কেউ স্বেচ্ছায় চাঁদা দিতে চাইছিলো না। বলতে গেলে, টাকাটা আমি কেড়েই নিচ্ছিলাম।

সুয়িং ডোর ঠেলে ইব্রাহিম সাহেবের ঘরে ঢুকে দেখি একজন অনিন্দ্য সুন্দরী বসে রয়েছেন। পরনে শিফনের শাড়ি। বয়স কতো হবে? তিরিশ, পঁয়ত্রিশ, এমন কি চল্লিশও স্পর্শ করতে পারে। এ ধরনের মহিলার বয়স নিয়ে কেউ চিন্তা করে না। প্রথমে চোখে পড়লো তাঁর বড়ো বড়ো চোখ। চোখের কোটরের ভেতরে মণি দুটো থর থর কাঁপছে। সামান্য পানিতে পুঁটি মাছ চলাচল করলে পানি যেমন আস্তে আস্তে কাঁপতে থাকে, তেমনি তার চোখের ভেতর থেকে এক ধরনের কম্পন অনবরত বেরিয়ে আসছে। আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। আমি চলে আসবো কি না, চিন্তা করছিলাম। টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে ইব্রাহিম সাহেব কথা বলে উঠলেন, জাহিদ ভাই, আপনি এসেছেন খুব ভালো হয়েছে। আসুন, আপনাকে এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। তারপর তিনি একজন জনপ্রিয় গায়িকার নাম উল্লেখ করে বললেন, এই মহিলা তাঁর ছোটো বোন। নাম মিস . . .। মিস আর ইব্রাহিম সাহেবকে তাঁর মুখের কথা শেষ করতে দিলেন না। তিনি ফুঁসে উঠলেন, আপনি আমাকে বোনের নামে পরিচয় করিয়ে দেবেন কেনো? আমার নিজেরও একটা নাম আছে। বসুন ভাই, আমার নাম শামারোখ। আমি প্রতিটি বর্ণ আলাদা করে উচ্চারণ করলাম, শা মা রো খ। ছোটোবেলায় শোনা একটা পুঁথির কয়েকটা চরণ মনে পড়ে গেলো : 'আহা কন্যা শামারোখ, / নানান মতে দিলা দুঃখ। / আসিলাম বিয়ার কাজে, / ঘরে যাইবো কোন্ লাজে, / মোকে জিজ্ঞাসিলে কি দিব উত্তর।' আমি চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, আমি আপনাকেই খুঁজছি। ভদ্রমহিলার সেই বিশাল চোখের তারা কেঁপে উঠলো। তিনি মাথাটা একপাশে এমন সুন্দরভাবে হেলালেন, দেখে আমার মনে হলো, পৃথিবীতে বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব ঘটেছে, অথবা সমুদ্রের জোয়ারে পূর্ণিমার ছায়া পড়েছে। তিনি বললেন, বলুন, কি কারণে আপনি আমাকে খুঁজছেন। আমি চাঁদার রসিদ বইটা তাঁর সামনে এগিয়ে ধরে বললাম, আমাদের অনুষ্ঠানের জন্যে আপনাকে পাঁচশ' টাকা চাঁদা দিতে হবে। ভদ্রমহিলা অপেক্ষাকৃত ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন, আমার চাকরি নেই, বাকরি নেই, বেকার মানুষ। অতো টাকা আমি কেমন করে পাবো? আমি বললাম, আপনি অনেক টাকা রোজগার করেন, আমি শুনেছি। কে বলেছে? আমি বললাম ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরী আমাকে বলেছেন আপনার হাতে অনেক টাকা। আমার শেষের কথাটা শুনে মহিলা হু হু

করে কেঁদে ফেললেন। কান্নাজড়ানো কণ্ঠেই তিনি বললেন, ড. শরিফুল ইসলাম আমাকে চাকরিতে জয়েন করতে দিচ্ছেন না, আর ওদিকে প্রচার করছেন আমার হাতে অনেক টাকা। তার দু'চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল নেমে সুন্দর গাল দুটো ভিজিয়ে দিয়ে গেলো। ফোটা গোলাপের পাপড়ির ওপর স্থির শিশির বিন্দুর মতো দেখাচ্ছিলো চোখের জলের সেই ফোঁটাগুলো। আমার যদি ক্ষমতা থাকতো অশ্রুবিন্দুগুলো কোনোরকমে উঠিয়ে নিয়ে সারাজীবনের জন্য সঞ্চয় করে রাখতাম। আরো পাঁচশ' টাকা আমাকে চাঁদা ওঠাতে হবে। সুন্দরীর চাঁদপানা মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে কাব্য রচনা করলে সে টাকা আমার হাতে আসবে না। টাকা যদি তুলতে না পারি, আগামীকালকের অনুষ্ঠান বন্ধ থাকবে। অগত্যা উঠতে হলো। ভদ্রমহিলাকে সান্ত্বনার কোনো বাক্য না বলেই আমি গোঁয়ারের মতো ইব্রাহিম সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

দুপুরের তাতানো রোদে পুড়ে, ক্লান্ত-বিরক্ত হয়ে হোস্টেলে ফিরলাম। চাঁদা ওঠানোর চাইতে শহরের কুকুর তাড়িয়ে বেড়ানো, পেশা হিসেবে যে অনেক ভালো একথা হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শরীর ছড়িয়ে দিয়ে দেখি চোখে কিছুতেই ঘুম আসছে না। কন্যা শামারোখের পুরো চেহারাটা বারবার মানস দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠছিলো। তার শরীরের রূপ আমার মনের ভেতর জোছনার মতো জ্বলছে। তার পদ্মপলাশ দুটো চোখ, চোখের ভুরু, আলতোভাবে কোলের ওপর রাখা দুধে-আলতা রঙের দুটো হাত, হাত সঞ্চালনের ভঙ্গিমা আমার মনে ঘুরে ঘুরে বার বার জেগে উঠছিলো। কোমর অবধি নেমে আসা ঢেউখেলানো কালো চুলের রাশি, তাতে মাঝে মাঝে রুপোলি আভাস, অবাক হয়ে ভাবি, এতো অল্প সময়ের মধ্যে আমি এতোকিছু দেখে ফেললাম কেমন করে! ফোটা গোলাপের পাপড়ির ওপর স্থির হয়ে থাকা শিশির বিন্দুর মতো অশ্রুবিন্দুগুলো আমার মানসপটে অনপনেয় ছাপ রেখে গেছে। একটা অপরাধ বোধের পীড়নে আমার শরীর অসম্ভব রকম ভারি হয়ে উঠছিলো। মহিলার সঙ্গে আমি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি।

আমার কিছু একটা করা দরকার। বিছানা থেকে তড়াক করে উঠে জামা-কাপড় পরলাম। তারপর ড. শরিফুল ইসলামের অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। তিনি অফিসেই ছিলেন। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। বুঝতে বাকি রইলো না তিনি বিরক্ত হয়েছেন। কোনো ভূমিকা না করেই আমি বললাম, স্যার, আপনি যে মহিলার ব্যাপারে কথা বলেছিলেন, তাই নিয়ে আমি আবুল হাসানাত সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি। আজ সকাল বেলা বাংলা একাডেমিতে সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে। আমি সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে দু'চার মিনিট কথা বলতে চাই। তিনি কী একটা লিখছিলেন, কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললেন, এক্ষুনি আমার অফিস থেকে বেরিয়ে যাও। তাঁর হুকুম শুনে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। আমার ইচ্ছে হচ্ছিলো টেবিল থেকে পেপার ওয়েটটা তুলে নিয়ে চুলের মাঝখানে যেখানে তাঁর সিঁথি, সেখানটায় সজোরে একটা আঘাত করে রক্ত বের করে আনি। আমার মাথাটা ঠিকমতো কাজ করেছিলো। নইলে অন্যরকম কিছু একটা ঘটে যেতো। এই ধরনের কিছু একটা অঘটন

যদি ঘটিয়ে ফেলি সব অধ্যাপক সাহেবদের সবাই মিলে আমাকে জেলখানা অথবা পাগলা গারদ—দুটোর একটাতে পাঠাবেন। রাগে-অপমানে আমার নিজের শরীর কামড়াতে ইচ্ছে করছিলো। এই ভদ্রলোক আমাকে ঘর থেকে তাঁর অফিসে ডেকে এনে তাঁর লেঠেল হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন, আজ যখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে সরাসরি বিষয়টা সম্বন্ধে জিগ্যেস করেছি, তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত না করেই বলে দিলেন, আমার অফিস থেকে বেরিয়ে যাও। মুশকিলের ব্যাপার হলো, আমি তাঁকে পেটাতে পারছি নে, শালা-বানচোত বলে গাল দিতে পারছি নে, অথচ অপমানটাও হজম করতে কষ্ট হচ্ছে খুব।

খুব তাড়াতাড়ি ডানে-বাঁয়ে না তাকিয়ে হোস্টেলে ফিরে গিয়ে একটানে একখানা চিঠি লিখে বসলাম। তার বয়ান এরকম : জনাব, আমাদের এই যুগে এই দেশে মানুষে মানুষে সমান মর্যাদার ভিত্তিতে সম্পর্ক এক বছর, এক মাস, এমন কি এক সপ্তাহও স্থায়ী হয় না। কেনোনা মর্যাদা বিনাশকারী শক্তিগুলো সমাজের শরীরের মধ্যেই ওঁৎ পেতে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতেও আপনার সঙ্গে অন্যূন আট বছর আমি কাজ করেছি। আমার চরিত্রের মধ্যে কোনো শক্তি ছিলো এ দাবি আমি করবো না। আপনি যে দয়া করে আমাকে আপনার সঙ্গে কাজ করতে সম্মতি দিয়েছেন, সেটা নিঃসন্দেহে আপনার মহানুভবতার পরিচায়ক। এই সমস্ত কথা স্মরণে রেখে আমি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই। যে কথাটা আপনি আমাকে ঘর থেকে লোক পাঠিয়ে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেন, সেই একই বিষয় আপনার ঘরে গিয়ে জিগ্যেস করলে, এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়! আমি আশা করছি, আপনি একটা জবাব দেবেন। নইলে আমার পদ্ধতিতে আপনার এই আচরণের জবাব দেবার চেষ্টা করবো। আপনারা আমাকে তুচ্ছ মনে করলেও নিজের কাছে আমার একটা মূল্য আছে। চিঠিটা লিখে একটা খামে ভরলাম। ওপরে নাম লিখলাম ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরী। পকেটে চিঠিটা নিয়ে আবার ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে ফিরে এলাম। দেখি বাইরে বাটুল বসে বসে ঢুলছে। তাকে ভালো করে জাগিয়ে চিঠিটা দিলাম। বললাম, তোমার সাহেবকে দেবে এবং সন্ধের আগে একটা জবাব নিয়ে আসবে, মনে থাকে যেনো। আমি ঘরেই আছি।

আমার ধারণা ছিলো আমার চিঠি পাঠ করে ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরী আরো বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন এবং আমাকে কি করে বিপদে ফেলা যায়, তার উপায় উদ্ভাবনের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। ওমা, সন্ধের একটু আগে দেখি সত্যি সত্যিই বাটুল আমার চিঠির জবাব নিয়ে এসেছে। খামটা ছিঁড়ে বয়ানটা পাঠ করলাম। ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন, জাহিদ, আমি সত্যি সত্যিই দুঃখিত। নানা কারণে মন খারাপ ছিলো। কিছু মনে করো না। হঠাৎ করে কিছু একটা করে বসবে না। তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। শেষ কথা, তোমাকে বলতে চাই যে, অ্যাপিয়ারেন্স এবং রিয়্যালিটির মধ্যে অনেক ফারাক, সেটা তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করো। চিঠিটা পাঠ করে আমার রাগ কিছু পরিমাণে প্রশমিত হলো। সে সন্ধের কোথাও গেলাম না। হোস্টেলের সামনের লনে বসে কন্যা শামারোখের কথা চিন্তা করে কাটিয়ে দিলাম।

তার পরদিন সন্ধেবেলা ড. মাসুদের বাড়িতে আমার খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিলো। বেগম মাসুদ অত্যন্ত স্নেহশীলা। আমার মায়ের মৃত্যুর পর অনেকবার বাড়িতে ডেকে নিজের হাতে রান্না করে খাইয়েছেন। তিনি রাঁধেনও চমৎকার। এই ভদ্রমহিলার বাড়ি থেকে যখনই খাওয়ার নিমন্ত্রণ আসে আমি মনে মনে ভীষণ উল্লসিত হয়ে উঠি। খাওয়ার লোভটা ততো নয়, যতোটা তাঁর নীরব মমতার আকর্ষণ। সেদিন সন্ধেয় ড. মাসুদের বাড়ির দরোজায় বেল টিপতেই তিনি স্বয়ং দরোজা খুলে দিলেন। কোনোরকম ভূমিকা না করেই বললেন, জাহিদ মিয়া, আবার তুমি একটা দুর্ঘটনার জন্ম দিয়েছো। কোথায় কখন কি করে আরেকটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসলাম, বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি আমার মনোভাব খানিকটা আঁচ করে নিজেই বললেন, তুমি দু' তিনদিন আগে ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরীর কাছে গিয়ে শামারোখকে চাকরি দিতে হবে এই মর্মে নাকি ধমক দিয়েছো! তিনি তোমাকে তাঁর অফিস থেকে বের করে দিলে, আবার চিঠি লিখে ক্ষমা প্রার্থনা করেছো। তাঁর কথা শুনে আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। জানতে চাইলাম, একথা আপনাকে কে বলেছে? ড. মাসুদ জানালেন, আজকের মর্নিং ওয়াকের সময় ড. চৌধুরী নিজে তাঁকে একথা বলেছেন। তখন আমি বাধ্য হয়ে তাঁর কাছে ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরী আমাকে বিকেলবেলা কীভাবে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে আবুল হাসানাত সাহেবের কুকীর্তির কথা বয়ান করলেন, সবকিছু জানালাম। আরো বললাম, কথাটা আমি হাসানাত সাহেবের কাছেও উত্থাপন করেছিলাম। হাসানাত সাহেব কি জবাব দিয়েছেন, সেটাও প্রকাশ করলাম। গতবছর বাংলা একাডেমিতে চাঁদা তুলতে গিয়ে কোন্ পরিস্থিতিতে কন্যা শামারোখের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, কিছুই বাদ দিলাম না। অবশ্য স্বীকার করলাম, আমি ড. শরিফুল ইসলামের অফিসে গিয়ে বিষয়টা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে কিছুই না বলে অফিস থেকে বের করে দিয়েছেন। তারপর আমি হোস্টেলে এসে একটা চিঠি লিখে তাঁর বেয়ারার কাছে রেখে এসেছিলাম এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমার চিঠির একটা জবাব পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমার কথা শেষ হলে ড. মাসুদ কন্যা শামারোখ সম্পর্কে বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি জানালেন, শামারোখদের বাড়ি যশোর। তার বাবা একজন গোবেচারা ধার্মিক মানুষ। তারা সাত বোন। সব ক'টি বোন লেখাপড়ায় অসম্ভব রকম ভালো এবং অপূর্ব সুন্দরী। শামারোখ করাচিতে লেখাপড়া করেছে। করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে লেকচারার হিসেবে কাজ করতো। সে সময়ে এক সুদর্শন সিএসপি অফিসারের সঙ্গে তার বিয়ে হয় এবং শামারোখ একটি পুত্র সন্তানের মাও হয়। কিন্তু বিয়েটা টেকে নি। বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর ধরপাকড় করে একটা স্কলারশিপ যোগাড় করে লন্ডনে চলে যায় এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ট্রাইপস শেষ করে। সে সময় সে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-সহায়ক কার্যকলাপে জড়িত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সহায়তায় সে ইংরেজি বিভাগে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরের চাকরিটি পেয়ে যায়। তাকে চাকরি পেতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় নি। কারণ আবু সাঈদ চৌধুরী সাহেব ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর এবং বাংলাদেশের বর্তমান

রাষ্ট্রপতি। প্রয়োজীয় যোগ্যতা যখন রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মোতাহের আহমদ চৌধুরী প্রাক্তন উপাচার্য এবং দেশের রাষ্ট্রপতির সুপারিশ রক্ষা করা একটি কর্তব্য বলে মনে করলেন। তাকে যখন চূড়ান্ত নিয়োগপত্র দেয়া হলো, ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরী একেবারে কঠিনভাবে বেঁকে বসলেন। তিনি তাঁর ডিপার্টমেন্টের সব শিক্ষক সঙ্গে নিয়ে ভাইস চ্যান্সেলরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানিয়ে দিলেন, এই মহিলা যদি শিক্ষক হয়ে ডিপার্টমেন্টে আসে, তাহলে ডিপার্টমেন্টের সব শিক্ষক একযোগে পদত্যাগ করবেন।

ড. মাসুদ তাঁদের কাজের লোক আকবরকে তামাক দিতে বললেন। আকবর তামাক সাজিয়ে দিলে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, শোনো, তারপরে একটা মজার কাণ্ড ঘটলো। ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবের তো ছুঁচো গেলার অবস্থা। একদিকে তিনি নিয়োগপত্র ইস্যু করেছেন, অন্যদিকে ইংরেজি ডিপার্টমেন্টের সব শিক্ষক মিলে পদত্যাগের হুমকি দিচ্ছেন। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার বুদ্ধি সরবরাহ করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ রেজিস্ট্রার সাঈদ সাহেব। তিনি অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম্ তন্ন তন্ন করে ঘেঁটে একটা খুঁত আবিষ্কার করলেন। শামারোখ, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা। কিন্তু চাকরির দরখাস্তে সে নিজেকে কুমারী বলে উল্লেখ করেছে। এই খুঁতটি ধরা পড়ার পর ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন এই নিয়োগপত্র বাতিল করা হয়েছে, এ মর্মে একখানা চিঠি লিখে জানিয়ে দেয়া হবে, যেহেতু প্রার্থিনী তার নিজের সম্পর্কে সত্য গোপন করেছেন, তাই তার নিয়োগপত্র বাতিল করা হলো। কিন্তু চিঠিটি ইস্যু করার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার বুড়ো আবু আব্দুল্লাহ গোলমাল বাধিয়ে বসলেন। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বললেন, প্রার্থিনী সত্য গোপন করেছেন, একথা চাকরির নিয়োগপত্র দেয়ার আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেনো চিন্তা করেন নি। প্রার্থিনী সত্য গোপন করে অন্যায় করলেও বিশ্ববিদ্যালয় যদি সে অপরাধে নিয়োগপত্র বাতিল করে বসে, তাহলে তার চাইতেও বড়ো অন্যায় করা হবে। আবু আব্দুল্লাহ সাহেব এক কথার মানুষ। তিনি ভেবে-চিন্তে যা স্থির করেন, তার থেকে এক চুল টলানো একরকম অসম্ভব। এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে সবার শরীর থেকে যখন কালো ঘাম দরদর ঝরছিলো, আবারো মুশকিল আসানের ভূমিকা গ্রহণ করলেন রেজিস্ট্রার সাঈদ সাহেব। তিনি সবাইকে পরামর্শ দিলেন, আপনারা আব্দুল্লাহ সাহেবের বড় জামাই আজিজুল হাকিম সাহেবের কাছে যান। তিনি আমার ক্লাস ফ্রেন্ড। আমি একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। আজিজুল হাকিম সাহেব যদি আব্দুল্লাহ সাহেবকে বোঝাতে রাজি হন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মহিলার চাকরি হলে, ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক চরিত্র বলতে কিছুই থাকবে না। তাদের নৈতিক চরিত্র সুরক্ষার স্বার্থেই তাকে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে আসতে দেয়া উচিত হবে না। আবু আব্দুল্লাহ সাহেব ভীষণ পিউরিটান স্বভাবের মানুষ। কোনোরকমের স্খলন-পতন তিনি একেবারে বরদাশত করতে পারেন না। রেজিস্ট্রার সাহেব আশ্বাস দিলেন, আপনারা হাকিম সাহেবের কাছেই যান, কাজ হবে। ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরীরা যখন আজিজুল হাকিম সাহেবের মাধ্যমে আবু আব্দুল্লাহকে সবিস্তারে বললেন এবং বোঝালেন, তখন আবু আব্দুল্লাহ সাহেবও অন্য সবার সঙ্গে একমত

হয়ে জানিয়ে দিলেন, অবিলম্বেই ভদ্রমহিলাকে জ্ঞাত করা হোক, সত্য গোপন করার জন্য আপনার নিয়োগপত্র বাতিল করা হলো। ড. মাসুদ জানালেন, তোমাকে যখন ড. চৌধুরী ডেকে নিয়েছিলেন, তখনো আবু আব্দুল্লাহ্ সাহেবের মতামতটা পাওয়া যায় নি। তোমাকে যেদিন অফিস থেকে বের করে দিলেন, সেদিন নিয়োগপত্র বাতিলের চিঠিটা ইস্যু করা হয়ে গেছে। ড. মাসুদ তাঁর দীর্ঘ বক্তব্য যখন শেষ করলেন, আমার মনে হতে থাকলো, আমি একটা উল্লুক। কতো কম জেনে আমি ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি। নিজের গালে নিজের চড় মারতে ইচ্ছে হলো। সবাই যতোটা বিশদ জানে, আমি তার বিন্দুবিসর্গও জানিনে কেন ? আমার কপালে অনেক দুঃখ আছে। সবকিছুই আমি সবার শেষে জানতে পারি। আমি আমার মায়ের গর্ভ থেকে সবার শেষে জন্ম নিয়েছি। পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি ফুরিয়ে যাবার পর দুর্গতির বোঝা বয়ে বেড়াবার জন্যেই যেনো আমার জন্ম হয়েছে। আমার অজান্তে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

আমরা খেতে বসলাম। বেগম মাসুদের মাংস রান্না বরাবরের মতোই চমৎকার হয়েছে। অনেকদিন এমন ভালো খাবার খাই নি। বলতে গেলে গোগ্রাসে গিলছিলাম। আর পেটে খিদেও ছিলো খুব। ড. মাসুদ তার দুর্বল দাঁতে হাড় চিবনোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন এবং সেই ব্যর্থতা চাপা দেয়ার জন্য ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরীর কাছে আমার লেখা চিঠিটার কথা উত্থাপন করলেন, তাহলে তুমি ড. চৌধুরীর কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠিটা লিখেছো ? আমি বললাম, স্যার, কথাটা ঠিক নয়, বরং তিনিই আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছেন। তিনি দুধের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে বললেন, কার কথা বিশ্বাস করবো, তোমার, না ড. চৌধুরীর ? আমি বললাম, কার কথা বিশ্বাস করবেন সে আপনার মর্জি। আপনি যদি দেখতে চান, তাহলে চিঠিটা দেখাতে পারি। তিনি হেসে বললেন, তুমি তো একজন রিসার্চ স্কলার আর ড. চৌধুরী একজন পুরোদস্তুর প্রফেসর। আমাকে ড. চৌধুরীর কথাই বিশ্বাস করতে হবে। কথাটা শুনে আমার সারা শরীরে আগুন লেগে গেলো। আমি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিগ্যেস করলাম, সত্যি বলার একচেটিয়া অধিকার কি শুধু প্রফেসরদের ? রিসার্চ স্কলাররা কি সত্যি বলতে পারে না ? তিনি বললেন, তোমার অতো কথার জবাব আমি দিতে পারবো না। একজন প্রফেসর এবং একজন রিসার্চ স্কলার একই বিষয়ে যখন কথা বলে, আমি প্রফেসরের কথাকেই সত্যি বলে ধরে নেবো, যেহেতু আমি নিজে একজন প্রফেসর। তাঁর সত্যাসত্য নির্ণয়ের এই আশ্চর্য থিয়োরির কথা শুনে আমি পাতের ভাত শেষ না করেই উঠে দাঁড়ালাম। রাগের চোটে সুস্বাদু মাংসের বাটিটা হাতে করে তুলে নিয়ে নিচে ফেলে দিলাম এবং একবারো পেছন ফিরে না তাকিয়ে হোস্টেলে চলে এলাম।

তার পরের দিন কয়েকটা কাজ করে বসলাম। আমার সম্প্রতি প্রকাশিত প্রবন্ধ বইয়ে ড. মাসুদ যে মন্তব্য লিখে দিয়েছিলেন 'জাহিদ হাসানের মতো পাঁচটি মেধাশালী তরুণ পেলে আমি বাংলাদেশ জয় করতে পারি', আমার প্রকাশককে সেটা বাদ দিতে অনুরোধ করলাম। সেদিন সন্ধেবেলা একটা কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান ছিলো। আমি অনুষ্ঠানে ঘোষণা দিয়ে বসলাম, ড. মাসুদ এ পর্যন্ত আমাকে তাঁর লিখিত যে সমস্ত বই-পুস্তক উপহার দিয়েছেন, সবগুলো পঁচিশ পয়সা দামে এই অনুষ্ঠানে বেচে দিতে যাচ্ছি।

১০

প্রিয় সোহিনী, আমার জীবন নিতান্তই দুঃখের। তবুও আমি ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেবো। এই দুঃখের কথাগুলো আমি নিতান্ত সহজভাবে তোমার কাছে প্রকাশ করতে পারছি। তুমি আমার মধ্যে সঞ্চারিত করেছো যে সাহস, আমাকে তা আমার গভীরে ডুব দেয়ার প্রেরণা যুগিয়েছে। এখন আমার মনে হচ্ছে, যদি তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ না হতো, আমি কস্মিনকালেও নিজের ভেতরে এই খোঁড়াখুঁড়ির কাজে প্রবৃত্ত হতে পারতাম না। তুমি আমার অস্তিত্বের শিয়রে দাঁড়িয়ে আছো। তাই প্রতিদিনের সূর্যোদয় এমন সুন্দর রঙিন প্রতিশ্রুতি মেলে ধরে, প্রতিটি সন্ধ্যা অমৃতলোকের বার্তা বহন করে আমার কাছে হাজির হয়, পাখির গান এমন মধুর লাগে, বাতাসের চলাচলে প্রাণের স্পন্দন ধ্বনিত হয়, পাতার মর্মরে কান পাতলে চরাচরের গহন সঙ্গীত একূল-ওকূল প্লাবিত করে দোলা দিয়ে বেজে ওঠে। আমার ভেতরটা সুরে বাঁধা তার-যন্ত্রের মতো হয়ে উঠেছে, যেনো একটুখানি স্পর্শ লাগলেই অমনি বেজে উঠতে থাকবো। তুমি আমাকে বাজিয়ে দিয়েছো, জাগিয়ে দিয়েছো। যে ঘনীভূত আনন্দ প্রতিটি লোমকূপে তুমি সঞ্চার করেছো, সেই স্বর্গজাত অশরীরী প্রেরণার বলে আমার কাহিনী তোমার কাছে চোখের পানিতে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে বয়ান করে যাচ্ছি।

প্রিয় সোহিনী, এমন অনেক ভাগ্যবান মানুষ আছে, কোনো রকমের বিপদ-আপদ যাদের একেবারেই স্পর্শ করে না। শহরের নির্ঝঞ্ঝাট রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার মতো গোটা জীবন তারা অত্যন্ত মসৃণভাবে কাটিয়ে যায়। কোনো রকম দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় না, বিপদ-আপদের মোকাবেলা করতে হয় না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সারাটা সময় তারা যেনো সিনেমা দেখেই কাবার করে। আমি কোন্ রাশির জাতক বলতে পারবো না। আমার জীবন ভিন্ন রকম। আমি যেখানেই যাই না কেনো, বিপদ-আপদ আমাকে অনুসরণ করতে থাকে। প্রিয় সোহিনী, আমি হলাম গিয়ে সেই ধরনের মানুষ, যারা পুকুর পাড়ের লাশ পুকুর পাড়ে কবর না দিয়ে ঘরে বয়ে নিয়ে আসে। এখন আমি তোমার কাছে, কন্যা শামারোখকে নিয়ে যে জটিলতায় জড়িয়ে গেলাম, সে কথাটা বলবো। কবিতা পাঠের আসরে আমাকে উপহার দেয়া ড. মাসুদের সবগুলো বই পঁচিশ পয়সা দামে বেচে দিলাম। সে কথা তো বলেছি। ক্রেতা পেতে আমার অসুবিধে হয় নি। কারণ ড. মাসুদ অনেকগুলো বই লিখেছেন, তার কোনোটার কলেবরই নেহায়েত তুচ্ছ করার মতো নয়। সবগুলোই ঢাউস এবং পরীক্ষার পুলসিরাত পার হওয়ার মোক্ষম সহায়। সুতরাং পঁচিশ পয়সা দামে তার চাইতেও বেশি দামের কিছু বই কিনে নেয়ার লোকের অভাব হলো

না। আমি তো ড. মাসুদের সত্য নির্ণয়ের অভিনব পদ্ধতির প্রতিবাদ করেই তাঁর উপহার করা বইগুলো বেচে দিলাম। বেচে দিয়ে মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম। ড. মাসুদকে যা হোক সুন্দর একটা শিক্ষা দিলাম তো। একজন প্রফেসর মিথ্যে বললেও সত্য মনে করতে হবে, কারণ তিনি নিজে একজন প্রফেসর। আর একজন রিসার্চ স্কলার সত্য বললেও তিনি ধরে নেবেন বিষয়টা আসলে মিথ্যে! ড. মাসুদ আমার শিক্ষক। তাঁকে আমি প্রকাশ্যে গালাগাল করতে পারি নে। আচমকা তাঁর ওপর হামলা করে বসতে পারি নে। অথচ একটা অপমান বোধ আমার ভেতরে দাবানলের মতো জ্বলছিলো। কিছু একটা না করে কিছুতেই স্বস্তিবোধ করতে পারছিলাম না। তাঁর উপহার করা বইগুলো স্রেফ পঁচিশ পয়সা দামে বেচে দিয়ে আমি অনুভব করতে থাকলাম, শিক্ষক হিসেবে তিনি যে স্নেহ-মমতা আমাকে দিয়েছেন, তার সবকিছু আজ ঝেড়ে ফেলে দিলাম।

তারপর কি ঘটলো, শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার মহলে রটে গেলো, আমি ড. শফিকুল ইসলাম চৌধুরীর অফিসে ঢুকে তাঁকে ধমকে দিয়ে বলেছি, তিনি যদি কন্যা শামারোখকে ডিপার্টমেন্টে আসার পথে কোনো রকমের বাধা দেন, তাহলে তার বিপদ হবে। আর আমার ধমকে একটুও ভয় না পেয়ে তিনি বেয়ারা দিয়ে আমাকে অফিস থেকে বের করে দিয়েছেন। এ খবর ড. মাসুদের কানে গেলো। তিনি আমাকে এরকম কোনো কিছু করা ভালো নয়, সেটা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য বাড়িতে ডেকে নিয়েছিলেন। আমি ড. মাসুদকে অপমান করেছি, তার স্ত্রীকে অপমান করেছি, কাজের লোককে ধরে মেরেছি এবং ডাইনিং টেবিল থেকে ভাত-তরকারি তুলে নিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছি—দেখতে-না-দেখতে এসব গল্প পাঁচ কান হয়ে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো।

আমি একজন সামান্য রিসার্চ স্কলার। মাসের শেষে মোট বারোশ' টাকা আদায় করার জন্য ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান এবং সুপারভাইজার—দু'জনের দ্বারস্থ হতে হয়। দু'জনের একজন যদি সই দিতে রাজি না হন, তাহলে স্কলারশিপের টাকা ওঠানো সম্ভব হয় না। এর পর পরই যখন কন্যা শামারোখ ঘটিত সংবাদ ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানের কানে গেলো, তিনি আমার স্কলারশিপ ওঠানোর ফরমে সই করতে অস্বীকৃতি জানালেন। প্রিয় সোহিনী, চিন্তা করে দেখো কী রকম বিপদের মধ্যে পড়ে গেলাম। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করা বলতে যা দাঁড়ায়, আমার অবস্থাও হলো সেরকম। শিক্ষকেরা জাতির বিবেক এ কথা সত্য বটে। এই বিবেক নামীয় ভদ্রলোকেরা সময়বিশেষে কী রকম নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারেন, আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।

সর্বত্র আমাকে নিয়ে নানারকম কথা হতে থাকলো। কেউ বললেন, আমার সঙ্গে কন্যা শামারাখের বিশ্রী রকমের সম্পর্ক রয়েছে। আবার কেউ কেউ বললেন, না, প্রত্যক্ষভাবে তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। তবে কন্যা শামারোখ ঢাকা শহরে বিনা মূলধনে যে একটি লাভের ব্যবসা ফেঁদে বসে আছে, তার খদ্দের জোগাড় করাই আমার কাজ। নিষিদ্ধ গালির পরিভাষায় ভেড়ুয়া। যে ভদ্রলোক জীবনে কোনোদিন কন্যা শামারোখকে চোখে দেখেন নি, তিনিও তাকে নিয়ে দুয়েকটি আদিরসাত্মক গল্প অনায়াসে ফেঁদে

বসলেন। আমি শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের মুখ থেকেই শুনলাম, কন্যা শামারোখ অর্ধেক রাত ঢাকা ক্লাবে কাটায়। নব্য-ধনীদের গাড়িতে প্রায়শই তাকে এখানে-ওখানে ঘুরতে দেখা যায়। মাত্রাতিরিক্ত মদ্য পান করলে যেমন তার মুখ দিয়ে অনর্গল অশ্লীল বাক্য নির্গত হয়, তেমনি বস্ত্রের বন্ধন থেকে শরীরটাও আলগা হতে থাকে। এই সমস্ত কথা যতো শুনলাম, ততোই ভয় পেতে আরম্ভ করলাম। কোথায় আটকে গেলাম আমি! অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলাম। জেনেশুনে এমন একজন মহিলার সঙ্গে কীভাবে জড়িয়ে গিয়ে এমনি করে প্রত্যেকের বিরাগভাজন হয়ে উঠলাম! কোনো কোনো মানুষের রাশিই এমন যে বিপদ তাদের প্রতি আপনিই আকৃষ্ট হয়। সুন্দরী শামারোখের মূর্তি ধরে একটা মূর্তিমান বিপর্যয় আমার ঘাড়ে চেপে বসলো। আপনা থেকে ডেকে এনে যখন ঘাড়ে বসিয়েছি, তখন ভাবতে আরম্ভ করলাম, আমি, একমাত্র আমিই শামারোখের ত্রাণকর্তা। তাকে সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করার পবিত্র ব্রত আমি গ্রহণ করেছি। তার পদ্মপলাশ অক্ষিযুগল থেকে বেরিয়ে পড়া গোলাপ পাপড়ির ওপর শিশির বিন্দুর মতো অশ্রু কণাগুলো দৃষ্টিপটে ক্রমাগত জেগে উঠতে থাকলো। আমরা ঢাকা শহরের একটা সঙ্কীর্ণ বৃত্তের মধ্যে বাস করি। এই বৃত্তের সবাই সবাইকে চেনে। কোনো কথা গোপন থাকে না। এখানে কেউ যদি প্রচণ্ড জোরে হ্যাঁচ্চো করে তার আওয়াজ সবার কানে এসে লাগে। আবার যদি কেউ অস্বাভাবিকভাবে বায়ু ত্যাগ করে বাতাস তার কটু গন্ধ অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে অন্য সবার নাসারন্ধ্রে বয়ে নিয়ে যায়। কন্যা শামারোখের ব্যাপারে প্রফেসর সাহেবদের সঙ্গে আমার যে একটা ভজকট বেধে গেলো, সে কথাও সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো। শিক্ষক সাহেবদের পরিমণ্ডলে আমার ভয়ঙ্কর দুর্নাম রটে গেলো। এমনকি অতিরিক্ত মর্যাদা-সচেতন কেউ কেউ ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরী এবং ড. মাসুদের দিকে আঙুল তুলে বললেন, আপনারা দু'জনেই আশকারা দিয়ে দিয়ে এ অসভ্য ছেলেটাকে এমন দুঃসাহসী করে তুলেছেন, ডিপার্টমেন্টে একটা নষ্ট মহিলাকে চাকরি দিতে হবে, তাই নিয়ে হুমকি-ধমক দেয়ার স্পর্ধা রাখে। এখন বুঝুন ঠ্যালা!

এই আপাত নিরীহ শিক্ষকদের ক্রোধ তেঁতুল কাঠের আগুনের মতো। সহজে নিভতে চায় না, নীরবে নিভৃতে জ্বলতে থাকে। পাথরের তলায় হাত পড়লে যে রকম হয়, আমারও সে রকম দশা। তবু আমি স্কলারশিপটা ছেড়ে দিয়ে শিক্ষক সাহেবদের আওতা থেকে পালিয়ে যেতে পারছি নে। আবার প্রশান্ত মনে গবেষণার কাজেও আত্মনিয়োগ করবো, তারও উপায় নেই। পরিণাম চিন্তা না করে ভীমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়ে বসে আছি। অবশ্য আমাকে উৎসাহ দেয়ার মানুষেরও অভাব ছিলো না। কন্যা শামারোখ অত্যন্ত সুন্দরী। এই সময় আমি আবিষ্কার করলাম তার সম্পর্কে আমি যতো জানি অন্য লোকেরা তার চাইতে ঢের ঢের বেশি জানে। তারা বললো, ঠিক আছে জাহিদ, তুমি লড়াই চালিয়ে যাও। আমরা তোমার সঙ্গে আছি। সুন্দরী হওয়া কি অপরাধ? একজন ভদ্রমহিলাকে চাকরির নিয়োগপত্র দিয়ে বাতিল করার কি অধিকার আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ভুল স্বীকার করে নিয়ে ভদ্রমহিলাকে অবশ্যই চাকরিতে পুনর্বহাল করতে হবে।

এক সময় কন্যা শামারোখের কানে এই সব রটনার কথা গিয়ে পৌঁছুলো। আমি একটা চিঠি পেলাম। চিঠিটা এসেছে হোস্টেলের ঠিকানায় এবং লিখেছে কন্যা শামারোখ। লিখেছে, প্রিয় জাহিদ, বাংলা একাডেমিতে আপনার কথাবার্তা শুনে আমার মনে আপনার সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা জন্ম নিয়েছিলো। পরে বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, আপনি আমার ব্যাপারে সুপারিশ করতে গিয়ে শক্তিমান মানুষদের কোপদৃষ্টিতে পড়ে গেছেন। ব্যাপারটা আমাকে ভীষণ ব্যথিত করেছে। আপনার সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় হয় নি। বাংলা একাডেমিতে এক ঝলক দেখেছিলাম বটে, কিন্তু তাকে পরিচয় বলা চলে না। সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন মহিলার পক্ষে কথা বলতে গিয়ে আপনি যে স্বেচ্ছায় বিপদ ঘাড়ে নিলেন, আপনার এই মহানুভবতা আমাকে মুগ্ধ এবং বিস্মিত করেছে। আমি আগামী ৪ অক্টোবর শুক্রবার সকাল দশটায় আপনার হোস্টেলে এসে ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। আমরা এক আজব সময়ে বসবাস করছি। নিজের স্বার্থের প্রশ্ন না থাকলে কেউ কারো জন্য সামান্য বাক্য ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হয়। সুতরাং অনুরোধ করছি শুক্রবার দশটায় আপনি হোস্টেলে থাকবেন। তখন আপনার সঙ্গে ভালো করে পরিচয় হবে।

কন্যা শামারোখের হাতের লেখা খুবই সুন্দর। সচরাচর মেয়েলি হাতের লেখা যে রকম হয়, তার চাইতে একটু আলাদা। সুন্দর কাগজে সবুজ কালিতে চিঠিটা লিখেছে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেকবার পড়লাম। মামুলি অর্থের বাইরে আরো কোনো অর্থ আছে কি না, বার বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করতে চেষ্টা করলাম। কন্যা শামারোখের চিঠিটা পাওয়ার পর মনে হতে থাকলো, আমার সমস্ত অপমান-লাঞ্ছনার পুরস্কার পেয়ে গেছি। এর বেশি আর কি চাইবার ছিলো! কন্যা শামারোখ আগামী ৪ অক্টোবর শুক্রবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আমার হোস্টেলে আসবে এর চাইতে বড় সংবাদ আমার জন্য আর কি হতে পারে! বিপদের আশঙ্কা, অসহায়তার ভাব এক ফুৎকারে কোথায়ও উধাও হয়ে গেলো! বুকের ভেতর সাহসের বিজলি ঝিলিক দিতে থাকলো। কন্যা শামারোখের জন্যে আমি সমস্ত বিপদআপদ তুচ্ছ করতে পারি।

১১

আজ সেপ্টেম্বর মাসের সাতাশ তারিখ। চার অক্টোবরের আর কতো দিন বাকি? দিনগুলো অসম্ভব রকম মন্থর এবং ভারি। কিছুতেই পার হতে চায় না। আমার প্রতীক্ষার যন্ত্রণা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। কন্যা শামারোখ অক্টোবরের চার তারিখে আসবে বলেছে। কিন্তু ঐ তারিখটাই তাকে আঁকড়ে থাকতে হবে এমন কোনো কারণ আছে? চলে

আসুক না যে কোনোদিন এবং সুন্দর একটা কৈফিয়ৎ হাজির করুক। বলুক না কেনো আমার দিন-তারিখের ভীষণ গোলমাল হয়ে যায়। দেখতেই পাচ্ছেন কি রকম একটা খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি। যেসব মানুষের সঙ্গে আমার কোনোদিন চাক্ষুস পরিচয় পর্যন্ত ঘটে নি, তারা একজোট হয়ে আমার শত্রুতা করছে। আমি বেচারি দিন-তারিখ কেমন করে মনে রাখি ? আমি আসলে ভেবেছিলাম, সাতাশ তারিখেই আসবো। ভুল করে অক্টোবরের চার তারিখ লেখা হয়ে গেছে। সেপ্টেম্বরের সাতাশ তারিখে চলে এসেছি বলে আমি কি আপনাকে অসুবিধায় ফেলে দিলাম ? দয়া করে মাফ করে দেবেন, আমি কি করতে গিয়ে কি করে বসি নিজেও বলতে পারিনে। ভীষণ ভুলো মনের মহিলা আমি।

শিশুর মতো নিজেকেই প্রশ্ন করি। জগতে তো এখনো অনেক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে থাকে। আশ্চর্য কাণ্ড ঘটানোর দেবতা অন্তত আরেকটিবার প্রমাণ করুন এখনো তিনি এমন কাণ্ড ঘটিয়ে তুলতে পারেন, মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা যার কোনো তল পায় না। তিনি তাঁর অঘটনঘটনপটীয়সী ক্ষমতা বলে পঞ্জিকার সেপ্টেম্বর মাসের সাতাশ তারিখকে অক্টোবরের চার তারিখে রূপান্তরিত করুন। উৎকণ্ঠাটা বেশি হলো, তার একটা কারণ আছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কারো জানতে বাকি নেই কন্যা শামারোখের চাকরির বিষয় নিয়ে ঝুনো সব শিক্ষককে আমি ক্ষেপিয়ে তুলেছি। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিচ্ছিলো, কন্যা শামারোখ আমার কাছে আসছে, এই সংবাদটা অন্য কাউকে জানালে ফল ভালো হবে না। তাই তার আগমন-সংবাদ আমি কাকপক্ষীকেও জানাই নি। কাউকে জানাই নি সেটা যেমন আমার গহন আনন্দের ব্যাপার, তেমনি তার বেদনাও অপরিসীম।

অক্টোবর মাসের চার তারিখে আমার কাছে কন্যা শামারোখ আসছে। এই সম্ভাব্য ঘটনা আমার মনে একটা তোলপাড় জাগিয়ে দিয়েছিলো। আমি যখন একা একা রাস্তায় চলাফেরা করি, আমার হৃৎস্পন্দনের মধ্যে তার নামটি বেজে উঠতে থাকে। নিজের ভেতরে এতোটা ডুবে থাকি যে, কেউ কিছু জানতে চাইলে, হঠাৎ করে জবাব দিতে পারি নে। আমি প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকি। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির তিন তলায় আমার একটা রুম আছে। একেবারেই নির্জন। মাঝে-মধ্যে কার্নিশে দুটো চড়াই এবং কয়েকটা শালিক উড়ে এসে নিজেদের মধ্যে আলাপ-সালাপ করে। আমি সারাদিন সেই নির্জন রুমেই কাটাই। শুধু দুপুরের খাবার সময় একবার হোস্টেলে আসি। রাত ন'টায় লাইব্রেরি বন্ধ হলে ঘরে এসে খেয়ে একেবারে সরাসরি বিছানায় গা এলিয়ে দিই। কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। শান্ত সরোবরে ফুটে থাকা নিটোল পদ্মের মতো কন্যা শামারাখের সুন্দর আনন আমার মানসদৃষ্টির সামনে ফুটে থাকে। ভালো ঘুম হয় না। আধো ঘুম, আধো জাগরণের মধ্যে সারারাত কাটাতে হয়। সকালবেলা অসম্ভব ক্লান্তি নিয়ে জেগে উঠি। কিছুই ভালো লাগে না। আকুল চোখে ক্যালেন্ডারের দিকে তাকাই। এখনো দু'দিন বাকি। আজ দু'তারিখ। মাত্র দু'দিন পর কন্যা শামারোখ এই ঘরে আসছে।

ঘরের যা চেহারা হয়েছে দেখে আমি আঁতকে উঠলাম। আমার একটি মাত্র চেয়ার। সেটারও একটা পায়া বুড়ো মানুষের দাঁতের মতো অবিরাম নড়বড় করছে। সাবধানে না

বসলে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে পপাত ধরণীতল হতে হয়। দেয়ালগুলোতে অসংখ্য গর্ত। প্রত্যেক গর্তে টিকটিকি বাহাদুরেরা স্থায়ী নিবাস রচনা করেছে সপরিবারে। মশারির রঙ উঠে গেছে এবং জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। গিট দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। বালিশ দুটো মোটামুটি মন্দ নয়। বিছানার ওটা নিয়ে আমি নিজে খানিকটে গর্ব করে থাকি। আমার এক বন্ধু সিঙ্গাপুর থেকে এই চাদরটা এনে দিয়েছিলো। বহু ব্যবহারে রঙটা উঠে গেলেও চাদরের জমিনের ঠাস বুনুনি এখনো চোখে পড়ে। আমার ঘরের সবচাইতে দর্শনীয় জিনিস হলো একটা হিটার। প্রথম স্কলারশিপের টাকা উঠিয়ে নিউমার্কেটের দোকান থেকে ওটা কিনেছিলাম। অনেকদিনের ব্যবহারে টিনের শরীরটাতে মরচে ধরেছে। নাড়াচাড়া করলে হিটার সাহেবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ঝরে পড়তে থাকে। একদিন চা বানাতে গিয়ে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলাম। আমি ছিটকে পড়ে গেলাম। স্পৃষ্ট হওয়া আঙুল দুটো ঢাকের কাঠির মতো নেচে নেচে উঠছিলো। হিটার সাহেব ধাক্কা দিয়ে পেছনে ঠেলে দিয়েছিলো। যদি সামনের দিকে টেনে নিয়ে যেতো, তাহলে সেদিনটাই হতো আমার হোস্টেল বাসের অন্তিম দিন। বুঝলাম এই জিনিশটা দিয়ে আর চলবে না, একে বিদেয় করতে হবে। কিন্তু হিটার ছাড়া আমার চলবে কেমন করে! আমি যে পরিমাণ চা খাই, বাইরে থেকে কিনে খেতে হলে ভাত খাওয়া বন্ধ করতে হবে। মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। বাইরে একেবারে দেয়ালের গোড়ায় দেখি একটা ভাঙ্গা টব পড়ে আছে। আমার কেমন কৌতূহল জন্মে গেলো। সেটা নিয়ে এলাম এবং তার মধ্যে হিটারের প্লেটটা বসিয়ে দিলাম। তারপর একপাশের দেয়ালে একটা ফুটো করে হিটারের তারটা বাইরে নিয়ে এসে প্ল্যাকের সঙ্গে জুড়ে দিলাম। সুইচ অন করে দেখি বেশ কাজ করে। আমার মাথা থেকে একটা দুর্ভাবনা চলে গেলো। শক লাগার কোনো সম্ভাবনা নেই। মাটি বিদ্যুৎ পরিবাহী নয়। একটা বিকল্প হিটার তৈরি করতে পেরে গর্বে আমার বুকটা ফুলে উঠলো। বন্ধু-বান্ধব সবাইকে নিজের উদ্ভাবিত জিনিসটা দেখিয়ে ভীষণ আনন্দ পেয়েছি। ভাবখানা এমন, আমি নতুন একটা জিনিস বুদ্ধি খাটিয়ে আবিষ্কার করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আমার ওই নতুন আবিষ্কার বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলো। ভেবে দেখলাম, কন্যা শামারোখকে আমার এই অপূর্ব আবিষ্কারটা ছাড়া দেখাবার কিছু নেই। সে হয়তো আমার উদ্ভাবনী প্রতিভার তারিফ করবে। অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে বলবে, ওমা তলে তলে আপনার এতো বুদ্ধি! আপনাকে তো শুধু লেখক হিসেবেই জানতাম। এখন দেখতে পাচ্ছি, আপনি একজন পুরোদস্তুর বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। কল্পনা করে সুখ। আমিও কল্পনা করলাম আমার অভাবনীয় কীর্তি দেখে তার সুন্দর দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো ললাটে কুঞ্চিত রেখা জেগে উঠবে। মুখের ভাবে আসবে পরিবর্তন।

নিজের অবস্থার কথা যখন বিবেচনা করলাম, চারপাশ থেকে একটা শূন্যতা বোধ আমাকে আক্রমণ করে বসলো। ওই অনিন্দ্য সুন্দরী যখন দেখবে আমি কতো গরিব, তার মুখমণ্ডলে যে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব জেগে উঠবে, সে কথা আগাম কল্পনা করে আমি শিউরে উঠলাম। কন্যা শামারোখ সারা ঘরে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে হয়তো ফেরত চলে যাবে এবং বলবে, না ভাই আমি ভুল করে ভুল ঠিকানায় চলে এসেছি। এখন চললাম,

আমার কাজ আছে। আমার ভীষণ আফসোস হতে থাকলো, তাকে চিঠি লিখে আসতে নিষেধ করি নি কেনো? আমার মনে ভিন্নরকম একটা চিন্তা ঢেউ দিয়ে গেলো। আমার বন্ধুর বোনের বাড়িতে গিয়ে যদি সুন্দর চাদর, বালিশ, মশারি একদিনের জন্য ধার করে নিয়ে আসি! আমার ভেতরে পরক্ষণেই একটা বিদ্রোহের ঢেউ খেলে গেলো। আমি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমার ঘরের অবস্থা যতো করুণই হোক না কেনো আমি ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারবো না। যা আমার নয়, আমার বলে প্রদর্শন করতে পারবো না। কন্যা শামারোখ যদি ওয়াক থু বলে একদলা থুথু আমার মুখে ছুঁড়ে দিয়ে অনুতাপ করতে করতে চলে যায়, তাই সই। শামারোখ ঘরে বসুক অথবা চলে যাক, কিছু যায় আসে না, আমি আমিই।

অবশেষে আকাঙ্ক্ষিত অক্টোবরের চার তারিখটি এসে গেলো। আমি সূর্য ওঠার অনেক আগে উঠে ঘরের মেঝেটা পরিষ্কার করলাম, দেয়াল এবং ছাদের ঝুল ঝাড়লাম। যতোই ভদ্রস্থ করার চেষ্টা করিনে কেনো বিশ্রী চেহারাটা আরো বেশি করে ধরা পড়ে। এক সময় গৃহ সংস্কার-কর্মে ক্ষান্তি দিয়ে বারান্দার রেলিংয়ের গোড়ায় এসে দাঁড়ালাম। আমার মনে হচ্ছিলো আজ সকালে সূর্য নতুনতরো কিরণ ধারা বিতরণ করছে। পাখি সম্পূর্ণ নতুন সুরে গাইছে। তরুলতার পত্র মর্মরে একটা অশ্রুত রাগিণী বেজে যাচ্ছে। আমার মনের তারে তার সূক্ষ্ম সুর অনুভব করছি। আমার জীবনে এমন সকাল কোনোদিন আসে নি।

ক্যান্টিনে গিয়ে নাস্তা করে রেলিংয়ের গোড়ায় বসে রইলাম। প্রতিটি রিকশা, বেবিট্যাক্সি হোস্টেলের দিকে আসতে দেখলে আমি চমকে উঠতে থাকি। আমি বসে আছি। একে একে রিকশা-ট্যাক্সি চলে যাচ্ছে, কন্যা শারারোখের টিকিটিরও দেখা নেই। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছি। দশটা বাজার আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি আছে। আমার ভেতর থেকে ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। কন্যা শামারোখ কেনো আমার ঘরে আসবে? তার কি অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই? দশটা বেজে যখন পাঁচ মিনিটে দূর থেকে রিকশায় শাড়ির আভাস লক্ষ্য করে মনে করলাম, আমার দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে কন্যা শামারোখের আবির্ভাব ঘটলো। কিন্তু রিকশাটা যখন কাছে এলো, লক্ষ্য করলাম, আলাউদ্দিনের বেগম নিউমার্কেটের কাঁচাবাজার থেকে তরিতরকারি নিয়ে ফিরছেন। ধরে নিলাম, আজ আর কন্যা শামারোখের আগমন ঘটবে না। এমন করে বসে থেকে রাস্তা জরিপ করে কী লাভ! নিজের ওপরেই আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিলো। আমি একজন রাম বোকা। সবাই আমাকে ঠকায়। কন্যা শামারোখও আমাকে ধোঁকা দিয়ে গেলো। তার ব্যাপারে জড়িয়ে যাওয়ার জন্য আমি নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকি। সাত-পাঁচ চিন্তা করতে করতে এরকম আনমনাই হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ করে আমার দৃষ্টি একটা রিকশার দিকে আকৃষ্ট হলো। প্রথমে দেখলাম শাড়ির আঁচল। তারপর ঢেউ খেলানো চুলের রাশি। আমার শরীরের অণু-পরমাণু হঠাৎ গুঞ্জন করে উঠলো। এ কন্যা শামারোখ ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। নিশ্চয়ই অন্য কেউ নয়। রিকশাটা হোস্টেলের গেটে এলো এবং সে নামলো। আমার বুকের ভেতরে রক্ত ছলকাতে আরম্ভ করেছে। ইচ্ছে হলো কন্যা শামারোখ যেখানে চরণ রেখেছে, সেখানে আমার বুকটা বিছিয়ে দিই না

কেনো? কিন্তু বাস্তবে আমি সেই তিন ঠেঙে চেয়ারে স্থাণুর মতো বসে রইলাম। আমার পা দুটো যেনো দেবে গেছে। কন্যা শামারোখ একতলার সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে আমার ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। যেখানেই পাদতল রাখছে, যেনো গোলাপ ফুটে উঠছে। আমার কাছাকাছি যখন এলো, আপনা থেকেই একটা সুন্দর হাসি তার ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠলো। তার শাদা সুন্দর দাঁতগুলো ঝিলিক দিয়ে জেগে উঠলো। আমার মনে হলো আমাদের হোস্টেলের ব্যালকনিতে সুমেরু রেখার ওপর সূর্য শিখা ঝলক দিয়ে জাগলো।

• আমি তাকে আমার ঘরে নিয়ে গেলাম। কন্যা শামারোখ এক নজরে সমস্ত ঘরের চেহারাটা দেখে নিলো, তারপর প্রথম বাক্য উচ্চারণ করলো, জাহিদ সাহেব, আমি যে আপনার ঘরে এসেছি সেজন্য আপনার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আমি যেমনটা আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম, কন্যা শামারোখ অবিকল সে কথাই বলেছে। অনুভব করলাম, কন্যা শামারোখ সুন্দরী বটে, কিন্তু তার মনে কোনো দয়া নেই। দরিদ্রের অক্ষমতাকে কেউ যখন অবজ্ঞা করে, সেটা হাজার গুণ নিষ্ঠুর হয়ে বাজে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমার চোখ-মুখ লাল হয়ে গেলো। কন্যা শামারোখকে বললাম, আপনি যে রিকশায় চেপে এসেছেন, সেটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। শামারোখ বললো, রিকশা দাঁড়িয়ে থাকলে আমি কি করবো? আমি বললাম, সেটাতে চড়ে ফেরত চলে যাবেন। আপনি নিজের ইচ্ছেয় আমার ঘরে এসেছেন। আমি গরিব বটে কিন্তু আমাকে অপমান করার কোনো স্পর্ধা থাকা আপনার উচিত নয়।

আমার কথা শুনে কন্যা শামারোখ খিল খিল করে হেসে উঠলো। সে যখন হাসে যেন জল ঝরনার কলধ্বনি বেজে ওঠে। তারপর বললো, আপনি ভীষণ বদরাগী মানুষ। আপনার নাকটা ভয়ানক ছুঁচোলো। মানুষের ওই ধরনের নাক থাকলে ভয়ানক বদরাগী হয়। আর তাছাড়া . . .। আমি বললাম, তাছাড়া আবার কি? আপনার লেখাগুলোও রাগী। একটু একটু করে আশ্চর্য হচ্ছিলাম। আমি জানতে চাইলাম, আমার লেখা আপনি পড়েছেন? সে বললো, সব পড়ে উঠতে পারি নি। ইব্রাহিম সাহেবের কাছ থেকে দুটো বই ধার নিয়েছিলাম। বাকি লেখাগুলো আপনার কাছ থেকেই ধার করবো।

তারপর সে তিন পেয়ে চেয়ারটা বসার জন্য টেনে নিলো। আমি হা হা করে উঠলাম, ওটাতে বসবেন না। সে জিগ্যেস করলো, ওটাতে বসলে কি হয়? আমি বললাম, পড়ে যাবেন যে, ওটার একটা পায়া নেই। কন্যা শামারোখ চেয়ারটা টেনে নিয়ে টেবিলের সঙ্গে ঠেস দিলো। তারপর বসে পড়লো এবং বললো, এই বসলাম, আমার পড়ে যাওয়ার ভয় নেই। তারপর আমার চোখে চোখ রেখে বললো, আপনার ভেতরে যতো রাগের কথা আছে একটা একটা করে বলতে থাকুন। আপনার বিষয়ে মানুষ আমার কাছে অনেক কথা বলেছে। তাই আপনার কথা শুনতে এসেছি। আমি বললাম, দেখছেন না কী এক হতশ্রী ঘরে আমাকে ছন্নছাড়ার মতো বাস করতে হয়। সে বললো, আপনি যে ছন্নছাড়া সে কথা নিজের মুখে বলতে হবে না। আমি দেখা মাত্রই বুঝে ফেলেছি। অন্য কথা বলুন। আমি বললাম, অন্য কি কথা বলবো, শামারোখ জিগ্যেস করে বসলো, আপনার বাবা বেঁচে আছেন? আমি বললাম, না, যে বছর আমি কলেজে ভর্তি হই. সে বছরই তিনি মারা যান।

মৃত্যুর সময় বাবাকে আমি দেখতেও পাই নি, তখন জেলে ছিলাম কিনা। কন্যা শামারোখ আমার কথা শুনে আরো বেশি মনোযোগী হয়ে উঠলো, বারে, আপনি জেলেও ছিলেন ? আমি বললাম, হ্যাঁ। কতোদিন ? বললাম, বেশি নয়। বছরখানেক। সে কথা বাড়ালো না। জানতে চাইলো, আপনার মা আছেন ? আমি বললাম, মাও নেই। মারা গেছেন এই তিন মাস হয়। মাকেও আমি দেখতে পাই নি। মা যখন মারা গেছেন তখন রাজশাহীতে একটা রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম। কন্যা শামারোখ চুকচুক করে আফসোস করলো। তারপর বললো, আপনার ভাইটাই কেউ নেই ? জবাব দিলাম, ভাইটিও পাঁচ বছর আগে গত হয়েছেন। তার একপাল নাবালক ছেলেমেয়ে আছে। আমাকে তাদের দেখভাল করতে হয়। বোন নেই ? আমি বললাম, চারজন। একজনের বর ষোলোই ডিসেম্বরের দিনেই পাকিস্তানি সৈন্যের হাতে গুলি খেয়ে মারা গেছে। সৈন্যরা কক্সবাজারের দিক থেকে জিপে করে আত্মসমর্পণ করতে ছুটে আসছিলো। আমার দুলাভাই মজা দেখতে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একজন পাকিস্তানি সৈন্য গুলি করে তাকে চিরদিনের জন্য নীরব করে দেয়। অন্য বোনেরাও গরিব। ওদের সবার খবরা-খবর আমাকেই রাখতে হয়। আমি এক নিঃশ্বাসে আমার সমস্ত কথা বলে গেলাম। কন্যা শামারোখ তার আয়ত চোখ দুটো আমার চোখের ওপর স্থাপন করলো। মনে হলো, অশ্রু চিকচিক করছে। তার চোখ দুটো যেনো চোখ নয়, থরোথরো কম্পিত হৃদয়। তারপর সে বললো, আপনার এখানে খাওয়ার কিছু নেই ? আমি বললাম, মুড়ি ছিলো। গতকাল শেষ হয়ে গিয়েছে। যদি খালি চা খেতে চান তো বানিয়ে দিতে পারি। তবে আমার এখানে দুধ নেই। সে বললো, আপনার লাল চা-ই বানান দেখি। আমার চায়ের তেষ্টা লেগেছে। আমি চা করার জন্য যেই অভিনব হিটারের গোড়ায় গিয়েছি, শামারোখ কথা বলে উঠলো, দেখি দেখি আপনার হিটারটা। তখন আমাকে তার কাছে হিটারের জন্ম বৃত্তান্তটা বলতে হলো। চা বানিয়ে তার সামনে টেবিলে রাখলে সে পেয়ালাটা তুলে নিয়ে একটা চুমুক দিয়েই বলে ফেললো, আপনি চমৎকার চা তৈরি করেন। আর ভীষণ মজার মানুষ। আমি ঠিক করেছি, আপনাকে আমার লেখা কবিতাগুলো পড়তে দেবো। আমি বললাম, আপনি কবিতা লেখেন না কি ? হ্যাঁ, একটা পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছি। আপনার সেই প্রবীণ বটের অনুসরণ করে আমি একটা কবিতার গোটা একটা বই লিখে ফেলেছি। নাম রেখেছি 'কালো মানুষের কসিদা'। একটা মজার, জিনিস দেখবেন ? আমি বললাম, দেখান। কন্যা শামারোখ মোটা মলাটের খাতাটা খুলে দেখালেন, প্রবীণ বটের কবি জনাব জাহিদ হাসানের নামে উৎসর্গ করা হলো। আমি মনে করলাম, আশ্চর্য কাণ্ড ঘটিয়ে তোলার দেবতা মারা যান নি, এখনো বহাল তবিয়তে তিনি বেঁচে রয়েছেন। আমার এমন আনন্দ হলো, হঠাৎ করে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেললাম। এই বিস্ময় বোধ কাটিয়ে ওঠার জন্য কন্যা শামারোখকে বললাম, প্রথমদিকের লেখা পড়ুন। কন্যা শামারোখ ঘাড়টা সুন্দরভাবে দুলিয়ে বললো, না, সেটি হচ্ছে না। আমি আপনার কাছে গোটা খাতাটা রেখে যাবো। আগামী শুক্রবার বিকেলবেলা এসে আপনার মতামত শুনবো। সে আস্ত খাতাটা আমার হাতে তুলে দিলো। তার হাতে আমার হাত লেগে গেলো।

এই সময় আমার বন্ধু আলতামাস পাশা ঘরে ঢুকলো। দেখলাম, তার ছায়াটা লম্বা হয়ে পড়েছে। আজ তার আসার কথা নয়। তবে এটা ঠিক যে, আলতামাসের জন্য শনি-মঙ্গলবারের বাছ-বিচার নেই। যখন খুশি সে আসতে পারে। ইকনমিক্সের মেধাবী শিক্ষক আলতামাসকে আমি বিলক্ষণ পছন্দ করি। ঘরে ঢুকেই সে কন্যা শামারোখকে দেখে থতোমতো খেয়ে গেলো। কন্যা শামারোখ শীতল চোখে তার দিকে তাকালো। কারো মুখে কোনো কথা নেই। আলতামাস নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, সরি জাহিদ ভাই, আমি না হয় অন্য সময় আসবো। আপনার বোদলেয়ারটা দিতে এসেছিলাম। বইটা টেবিলের ওপর রেখে আমাকে দ্বিতীয় কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সে ঘরের বাইরে চলে গেলো।

আলতামাস চলে যাওয়ার পর কন্যা শামারোখ সরাসরি আমার চোখের ওপর চোখ রাখলো, এ লোককে আপনি চেনেন কী করে? আমি বললাম, তিনি ইকনমিক্সের ব্রিলিয়ান্ট শিক্ষক এবং আমার বিশেষ বন্ধু। কন্যা শামারোখের চোখ দুটো বাঁকা ছুরির মতো বেঁকে গেলো, রাখুন আপনার ব্রিলিয়ান্ট শিক্ষক। এতো বাজে লোকের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব হয় কেমন করে? আমি বললাম, তাকে তো আমি ভালো রুচিবান ভদ্রলোক বলেই জানি। আপনি তার সম্পর্কে ভিন্ন রকম কোনো ধারণা পোষণ করেন নাকি? কন্যা শামারোখ চিৎকার দিয়ে উঠলো, রাখুন আপনার রুচিবান ভদ্রলোক, ওই ব্ল্যাকশিপটা লন্ডনে আমার জীবনটা নরক বানিয়ে ছেড়েছিলো। জানেন, প্রতি সপ্তাহে আট-দশটা করে কবিতা পাঠাতো আমার কাছে। সবগুলোতে থিকথিকে যৌন চেতনার প্রকাশ। পড়লে ঘেন্নায় আমার শরীর রি-রি করে উঠতো। আগামীবার যখন আপনার কাছে আসবো, সেগুলো নিয়ে আসবো। পড়ে দেখবেন বাস্টার্ড কাকে বলে। আমি বললাম, অন্যায় তো কিছু করে নি। আপনি যে রকম সুন্দরী, আলতামাসের জায়গায় আমি হলেও কবিতা না পাঠিয়ে হয়তো পারতাম না। তারপর কন্যা শামারোখ আমার কাঁধে হাত রেখে অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললো, বাট দ্যা ফ্যাক্ট ইজ আপনি আমার কাছে সেরকম কিছু পাঠান নি। আমি নিজে উদ্যোগী হয়েই আপনার কাছে এসেছি। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, এর বেশি আমার আর কি চাই! এই মুহূর্তে যদি আমার মৃত্যু ঘটে যেতো, সেটাই হতো সবচেয়ে সুন্দর।

আমার ঘরে কন্যা শামারোখের শুভাগমন ঘটেছে এই সংবাদ হোস্টেলের সর্বত্র চাউর হয়ে গেছে। একতলা থেকে দোতলা, তিনতলা-চারতলা থেকে বোর্ডাররা নেমে এসে আমার দরজায় উঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছে। অবিশ্রাম লোক আসছে এবং টুঁ দিয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ সালেহ্ আহমদের ঘরে গিয়ে আড্ডা জমিয়ে বসেছে। সালেহ্ আহমদের সঙ্গে আমার সদ্ভাব নেই। তাদের কলকল হাসি-তামাশা আমাদের কানে এসে লাগছে। কন্যা শামারোখ ফুঁসে উঠলো, এই মানুষগুলো আমাকে পেয়েছে কি? একের পর এক এসে উঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি কি চিড়িয়াখানার কোনো আজব চিড়িয়া নাকি! কন্যা শামারোখ যতো জোরে চিৎকার করে কথা বলছে, নির্ঘাৎ সবারই কানে যাচ্ছে। আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। যদি সবাই দল বেঁধে এসে আজেবাজে কথা বলে কন্যা শামারোখকে অপমান করে বসে! আমি তো তাকে রক্ষা করতে পারবো না। তাই

বললাম, ছেড়ে দিন, কুকুরওতো ঘেউ ঘেউ করে। সে কণ্ঠস্বর আরেক ধাপ চড়িয়ে বললো, আসল কুকুর আর মানুষ-কুকুরে অনেক তফাত আছে। আমি মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। এখুনি যে কোনো একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। কিন্তু কন্যা শামারোখ চড়া গলায় কথা বলে যাচ্ছে এবং তার কথা সবাই শুনতেও পাচ্ছে। কোনো রকম চিন্তা-ভাবনা না করেই হঠাৎ করে একটা সাহসের কাজ করে বসলাম। একহাত মাথার ওপর এবং একহাত তার মুখের ওপর রেখে মুখটা চেপে ধরলাম। বাধা পেয়ে তার মুখ বন্ধ হলো, কিন্তু চোখ দিয়ে পানির ধারা ঝরতে থাকলো। আমি বললাম, চলুন, আপনাকে রেখে আসি। সে কাপড়-চোপড় সামলে ব্যাগটা তুলে নিয়ে বললো, আমি নিজেই যেতে পারবো। কি মনে করেন আমাকে! আগামী শুক্রবার আমি আসবো, মনে রাখবেন।

১২

কন্যা শামারোখের অপ্রকাশিত কবিতা গ্রন্থ 'কালো মানুষের কসিদা'র ভেতর আমি আমুণ্ডু ডুবে গেলাম। তার এই কবিতাগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলে পাঁচ ফর্মা অর্থাৎ আশি পৃষ্ঠার মতো একটা বই দাঁড়াবে। ভদ্রমহিলা গ্রন্থের নামকরণ 'কালো মানুষের কসিদা' রাখলো কেনো, সেটাও আমাকে ভাবিয়ে তুললো। অনেক তরুণ কবিই স্টান্ট দেয়ার জন্য কবিতার বইয়ের জমকালো নাম রাখে। এই ধরনের বেশিরভাগ কবির রচনায় কদাচিৎ সার পদার্থ পাওয়া যায়। আর কন্যা শামারোখকে কবিতা লিখতে আসতে হলো কেনো তাও আমার চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। সে অত্যন্ত অপরূপ মহিলা, তাকে নিয়ে অন্যদের কবিতা লেখার কথা। কিন্তু তিনি এই বাড়তি কষ্টটা মাথায় তুলে নিলেন কেনো?

একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবির একটা সুন্দর মন্তব্য মনে পড়ে গেলো। কবির নাম বলতে পারবো না। কালিদাস না ভারবী না বাণভট্ট। কোনো মাহফিলে যখন চুলচেরা দার্শনিক বিতর্ক চলে, সেই সময় কেউ যদি উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে বিশুদ্ধ উচ্চারণে একটি উৎকৃষ্ট কবিতা পাঠ করে, শ্রোতারা দার্শনিক বিতর্কের কথা ভুলে যায়। কবিতাই তাদের মনোযোগের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। আর এই কবিতা পাঠের আসরে কোনো সুকণ্ঠ গায়ক যদি তাল-লয় রক্ষা করে গান গেয়ে ওঠে, শ্রোতাসাধারণ কবিতার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে গানের মধ্যে মজে যায়। গানের আসরের পাশ দিয়ে কোনো সুন্দরী যদি নীরবেও হেঁটে যায়, সবাই গান ভুলে সেই মহিলার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকবে। সংস্কৃত কবির এই পর্যবেক্ষণটির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সত্য রয়েছে। একথা নির্দ্বিধায় কবুল করে নিতে পারি।

কন্যা শামারোখের লেখাগুলো পড়ে আমি একটা ধাক্কা খেয়ে গেলাম। সুন্দর মহিলাকেও নিজের গভীর বেদনার কথা প্রকাশ করার জন্য কবিতার আশ্রয় নিতে হয়। আমি কবিতার ভালো-মন্দের বিচারক নই। আমি অত্যন্ত সরল নিরীহ পাঠক। পাঠ করে যখন প্রীত হই, ধরে নিই লাভবান হলাম। চিত্রকল্প, উপমা, বিচার করে বিশুদ্ধ কবিতার রস বিচারের ক্ষমতা আমার কস্মিনকালেও ছিলো না। আর কবিসত্তার গভীরে ডুব দিয়ে অঙ্গীকার শনাক্ত করার কাজও আমার নয়। আমি শুধু একজন মামুলি পাঠক। একটা কবিতা যখন ভালো লাগে, বার বার পাঠ করি। খারাপ লাগলে আবার মনে একটা সহানুভূতির ভাব জেগে ওঠে। হায় বেচারি ব্যর্থ কবি! ছাপা বাঁধাই, কাগজ-মলাটে তোমার কতো টাকা চলে গেলো! অথচ মানুষ তোমাকে কবি বলে মেনে নেবে না। শেক্সপিয়র একবার একজন কবিকে অপকবিতা লেখার জন্য হত্যা করার বিধান দিয়েছিলেন। এ কাজ শেক্সপিয়রকেই মানায়। কারণ ঈশ্বরের পরে তিনিই সবচাইতে বড় স্রষ্টা। আমি শুধু একজন কবিতার পাঠক, কবি নই। যখন কোনো উৎকৃষ্ট কবিতা পাঠ করি লতায়িত জলের মতো কবিতার নিরঞ্জন-সুন্দর-স্বরূপ সমস্ত সত্তা আচ্ছন্ন করে ফেলে। নির্মেঘ শরত রাতে নক্ষত্রের ভারে নত হয়ে নেমে আসা আকাশের মতো আমার হৃদয়-মনে সন্নত ভাব সৃষ্টি হয়। তখন আমার মনে এমন একটা চেতনা জাগ্রত হয়ে ওঠে, আমি মেনে নিতে বাধ্য হই, ক্ষুদ্র তৃণাঙ্কুর থেকে আকাশের কম্পমান নক্ষত্র সমস্ত কিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছি আমি। আমার সঙ্গে সৃষ্টি জগতের কোনো অন্তরাল নেই। পৃথিবীর ধুলোমাটিও আমার অনুভবে মূল্যবান হীরক চূর্ণের মতো দ্যুতিমান হয়ে ওঠে।

কন্যা শামারোখের লেখাগুলো কবিতা হয়ে উঠেছে এমন কথা বলার দুঃসাহস আমার নেই। তবে একটি কথা বলবো, শামারোখের লেখার মধ্যে এমন একটা জ্বালা, এমন একটা যন্ত্রণাবোধের সাক্ষাৎ পেয়ে গেলাম, পুরো দুটো দিন তা-ই আমাকে অভিভূত করে রাখলো। মনে মনে আমি প্রশ্ন করলাম, সুন্দরী শামারোখ, তোমার মনে কেনো এতো বেদনা! সেই সময়, যখন আমি কবিতাগুলো পড়ছিলাম, কন্যা শামারোখ যদি আমার কাছে থাকতো, আমি তার সারা শরীরে শীতল বরফের প্রলেপ দিয়ে তার মনের যন্ত্রণা হরণ করবার চেষ্টা করতাম। তাতেও যদি যন্ত্রণার উপশম না হতো, আমি আমার শরীর তার শরীরে স্থাপন করে তার সমস্ত বেদনা শুষে নেবার চেষ্টা করতাম। যতোই পড়ছি আটশ' আশি ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক্তির ধাক্কা লাগছে আমার মনে।

কন্যা শামারোখ মাত্র একটি কবিতায় পুরো একটি বই লিখে ফেলেছে। সে যদি সাধারণ অর্থে কবি যশোপ্রার্থী একজন হতো, এ কাজটা কখনো করতো না। টুকরো টুকরো কবিতায় মনের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করতো। শামারোখ ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী। কবিতা কী করে সুমিত আকার পায়, সেটা তার না জানার কথা নয়। তবুও প্রকাণ্ড এক দীর্ঘ কবিতায় তার মনের সমস্ত যন্ত্রণা ঢেলে দিতে চেষ্টা করেছে। অসহ্য কোনো যন্ত্রণা তাকে দিয়ে ওই কাজটি বোধহয় করিয়ে নিয়েছে। আমি ওই অশোধিত বেদনার কাছে মনে মনে আমার প্রণতি নিবেদন করলাম।

কন্যা শামারোখের কবিতাগুলো পাঠ করতে গিয়ে আরো একটা জিনিশ আমার চোখে ধরা পড়লো। কবিতার ঠিক ঠিক মাত্রা সে বসাতে পারে না। মাত্রা বেশি অথবা

কম হয়ে যায়। তার ছন্দের ব্যবহারও নিখুঁত নয়। দীর্ঘদিন ধরে যদি কবিতা লেখার অভ্যাস করতো, আমার ধারণা এসব ত্রুটি সে কাটিয়ে উঠতো পারতো। তার আশি পৃষ্ঠার দীর্ঘ কবিতা এক আবহ থেকে অন্য আবহে যখন পৌঁছয়, চলনের মধ্যে একটা অসংলগ্নতা অত্যন্ত প্রকট হয়ে চোখে পড়ে। এই কবিতা যেভাবে লেখা হয়েছে সেভাবে যদি পাঠিয়ে দেয়া হয়, আমার ধারণা, কোনো সাহিত্য সম্পাদক সেটা তাদের কাগজে প্রকাশ করতে কখনো রাজি হবেন না। কিন্তু আমার কাছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে এই লেখাগুলো মূল্যবান হয়ে উঠলো। এ একজন অনিন্দ্য সুন্দর নারীর অত্যন্ত গভীর মর্ম-বেদনার দলিল। মহিলা এই কবিতার বইটি আমাকে উৎসর্গ করেছেন এবং আমাকে পড়তে দিয়েছেন। ব্যাপারটাকে অত্যন্ত বিরল একটা সৌভাগ্য বলে ধরে নিলাম। এই দীর্ঘ অগ্নিগিরির লাভা স্রোতের মতো অশোধিত আবেগের ফিরিস্তি পাঠ করতে গিয়ে কোথাও কোথাও এমন কিছু জমাট অংশ পেয়ে গেলাম, পড়ে ধারণা জন্মালো, মহিলার সবটাই যন্ত্রণা নয়, যন্ত্রণা অতিক্রম করার ক্ষমতাও তার জন্মে গেছে। দুটো খণ্ড কবিতা উদ্ধৃত করছি, যেগুলো তাঁর লেখায় গানের আকারে ধরা পড়েছে। প্রথমটি এ রকম :

কমল হীরের দীপ্তি ভরা
তোমার এমন কঠিন অহংকার
ইচ্ছে করে গলায় পরি
গড়িয়ে অলংকার, আহা যদি পারতাম!
যদি পারতাম আমি মন খেলিয়ে
বানিয়ে নিতাম, মনের মতো
উজ্জ্বলতা লজ্জা দিতো
রাজ-রানীদের হার।
আমি তাদের সভায় যেতাম
দুলিয়ে শাড়ির পাড়
দেখতো লোকে অবাক চোখে
কেমন শোভা কার।
কঠিন চিকন প্রাণ গলানো
তীক্ষ্ণ হীরের ধার
মনের মতো কাটবে এমন
পাই নি মণিকার।
তাইতো থাকি ছায়ার মতো
বই যে তোমার ভার
পাছে এমন রতন মানিক
কণ্ঠে দোলাও কার।

পরের কবিতাংশটির আবেদন একটু অন্যরকম। একটা কথা বলে রাখি। কন্যা শামারোখের এই উদ্ধৃতাংশগুলো কবিতা হয়েছে এমন জোর দাবি আমি করতে পারবো

না। কিন্তু পাঠ করতে গিয়ে আমার ভেতরটা বেজে উঠেছিলো বলে উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারলাম না।

তোমার এ প্রেম সকল দিকে গেছে
যদি ডাকি
ডানা মেলে আকাশ আসে নেচে।
আমার আপন জীবন ভরা
তুচ্ছ আবিলতা
আমার যতো কলুষ গ্লানি
আমার বিফলতা
তোমার প্রেমের স্নিগ্ধ ধারা
সকল দেবে কেচে।
পারিজাতের গন্ধ ভরা
মন হারানো বাঁয়ে
নীলাঞ্জনের রেখার নিচে
শ্যামল তরুর ছায়ে
তোমার নামে হাত বাড়ালে
দলে দলে বন দেবতা
হৃদয় দেবেন যেচে।

কন্যা শামারোখের ভাবে উদ্বেল হয়ে সারাক্ষণ যদি মগ্ন থাকতে পারতাম, আমার জন্য সেটাই হতো সবচাইতে আনন্দের। কিন্তু আমরা তো মাটির পৃথিবীতে বাস করি। নিতান্ত অনিচ্ছায় হলেও দৈনন্দিন কিছু প্রয়োজনীয় কাজ সারতে হয়। এটা-সেটা কতো কিছু করতে হয়। মানুষের সমাজে মানুষের মতো বাস করতে হলে কতো দায়-উপরোধ রক্ষা আর কর্তব্য-কর্ম করে যেতে হয়। একদিন আমাকে বিকেলবেলা আবু সাঈদ এসে বললো, চলো দোস্ত নিউমার্কেট ঘুরে আসি। আবু সাঈদ সেজেগুজে এসেছে। আমার মনে হলো না, আমি তাকে নিবৃত্ত করতে পারবো। কারণ গেলো মাসে আমি তার কাছ থেকে পাঁচশ' টাকা ধার করেছি। সে টাকা এখনো শোধ করা হয় নি। আমি বললাম, হঠাৎ করে তোমার নিউমার্কেট যাওয়ার এমন কি দরকার পড়লো? সাঈদ বললো, দোস্ত স্যুট বানাবো, তোমাকে কাপড় পছন্দ করে দিতে হবে। আমি জিগ্যেস করলাম, এ অসময়ে তোমার স্যুট বানাবার দরকার পড়লো কেন? এখনতো সবে শরৎকাল। শীত আসতে দাও। সে বললো, দোস্ত ভুলে যেয়ো না এটা আমার বিয়ের বছর। আমি বললাম, বিয়ের বছর তাতে কি, সে জন্য তোমাকে স্যুট বানাতে হবে কেনো? স্যুট তো তুমি শ্বশুর বাড়ি থেকেই পাবে। সাঈদ প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে বললো, হ্যাঁ, শ্বশুর বাড়ি থেকে একটা স্যুট পাওয়া যাবে, সে কথা ঠিক বটে। তারপরও আমার একটা স্যুট বানানো প্রয়োজন। কারণ, বিয়ে করলে তো আমি ভীষণ খাই-খরচের তলায় পড়ে যাবো। তখন স্কলারশিপের বারোশ' টাকায় দু'জনের

চলবে না। এখন থেকে আমাকে চাকরির চেষ্টা করতে হবে। অফিসে অফিসে ইন্টারভিউ দেয়ার জন্যও একটা স্যুট প্রয়োজন। চলো দোস্ত, দেরি করে লাভ নেই। রাত হয়ে গেলে কাপড়ের রঙ বাছাই করতে অসুবিধে হবে।

সাঈদের স্যুটের কাপড় বেছে দিতে এসে আমি মহা মুশকিলে পড়ে গেলাম। আমি যে কাপড় পছন্দ করি, সেটা সাঈদের মনে ধরে না। সে যে সমস্ত কাপড় পছন্দ করে, দেখলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। আমি এই প্রথম অনুভব করলাম রুচির দিক দিয়ে সাঈদের সঙ্গে আমার কতো পার্থক্য! চার-পাঁচটা দোকান ঘোরার পর আমার ধারণা হলো সাঈদের সঙ্গে না আসাই ঠিক হতো। কারণ আমার জন্য সে তার পছন্দমতো কাপড় কিনতে পারছে না। এই অনুভবটা আমার মনে আসার পর বললাম, ঠিক আছে, তুমি বেছে ঠিক করো, আমি কিছু বলবো না। সাঈদ একটা রঙচঙে কাপড় পছন্দ করলো। মনে মনে আমি চটে গেলাম। কোনো রুচিবান মানুষ কী করে এতো রঙচঙে কাপড় পছন্দ করে!

দরজির দোকানে গিয়ে বিরক্তি আরো বাড়লো। স্যুট কিভাবে বানাতে হয়, তার কতো রকম পরিভাষা আছে, এই প্রথম জানতে পারলাম। কোট ডাবল কি সিঙ্গেল ব্রেস্ট হবে, প্যান্টের ঘের কতোদূর হবে, স্ট্রেইট পকেট থাকবে কিনা, হিপ পকেট একটা না দুটো হবে, পকেটের কভার থাকবে কি থাকবে না, দর্জি মহাশয়ের এবংবিধ প্রশ্নের মোকাবেলায় সাঈদ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। প্রতিবারই সে বলছিলো, দোস্ত তুমি বলে দাও। সুতরাং নিতান্ত আনাড়ি হওয়া সত্ত্বেও আমি জবাব দিতে থাকলাম। দর্জি যখন জানতে চাইলো, কোট সিঙ্গেল কি ডাবল ব্রেস্ট হবে, আমি বললাম, ডাবল ব্রেস্ট। প্যান্ট কোমরের ওপরে কি নিচে পরা হবে জানতে চাইলে আমি বললাম, ওপরে। হিপ পকেট একটা কি দুটো হবে, এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম, অবশ্যই দুটো। সে জিগ্যেস করলো, কভার থাকবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি স্যুট বানানোর প্রক্রিয়া-পদ্ধতির ব্যাপারে কিছুই জানি নে। তারপরও দর্জির প্রশ্নের জবাব এমনভাবে দিলাম যেনো হামেশাই স্যুট বানিয়ে থাকি। সাঈদ আমার ওপর ভীষণ খুশি হয়ে গেলো। দর্জির দোকান থেকে বেরিয়ে এসে সে আমার কাঁধে হাত রেখে বললো, দোস্ত, তোমার মনের খুব জোর আছে। আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম, একটা ফাঁড়া কাটলো।

নিউমার্কেট থেকে বেরিয়ে দু'জন রাস্তা পার হলাম। সাঈদকে বললাম, দোস্ত তুমি যাও। আমি পুরনো বইয়ের দোকানগুলো একটু দেখে যাবো। অন্য সময় হলে সে ঠাট্টা-তামাশা করতো। জীবনের প্রথম স্যুট বানাতে দেয়ার কারণে আজকে তার মেজাজটা খুব ভালো। সে বললো, না দোস্ত, দু'জন এক সঙ্গে এসেছি, এক সঙ্গেই যাবো। তুমি পুরনো বই দেখতে থাকো। আমি ওই ম্যাগাজিনের দোকানে আছি।

পুরনো বইয়ের দোকানে এলে আমার একটা আশ্চর্য অনুভূতি হয়। পুরনো বই নাড়াচাড়া করে দেখার কী আনন্দ, সেটা প্রকাশ করা যাবে না। একেকটা বই কতো হাত ঘুরে এসব দোকানে এসেছে। প্রতিটি পুরনো বইয়ের ভেতরে প্রাক্তন গ্রন্থ মালিকের একটা ব্যক্তিগত সান্নিধ্য অনুভব করি। যিনি এ বই কিনেছিলেন. নরম কোনো সন্ধের

নির্জনে একাকী সেটা পাঠ করে কিভাবে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলেন, সে কথা অনুভব করার চেষ্টা করি। বইয়ের জগতে সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিয়ে আধারাত কাবার করে দিয়ে কিভাবে জীবনের একটা অর্থ খুঁজতে চেষ্টা করেছিলেন, সে কথাও মনে ঢেউ দিয়ে জেগে ওঠে। এ বই কিভাবে মালিকের ব্যক্তিগত সংগ্রহের ভাণ্ডার থেকে বেরিয়ে এসে পুরনো বইয়ের দোকানে ঠাঁই করে নিলো, সে বিষয়েও নানা ভাবনা আমার মনে আসে। গ্রন্থ মালিক বৃদ্ধ বয়সে জীবন ধারণের কোনো অবলম্বন না পেয়ে ব্যক্তিগত সংগ্রহের গ্রন্থগুলো কি বেচে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ? নাকি তার চাকর বিড়ির পয়সা জোগাড় করার জন্যে ফেরিঅলার কাছে হাজার টাকার বই পাঁচ-দশ টাকায় বেচে দিয়েছে! ইদানীং যে কথাটা বেশি মনে হয়, গ্রন্থ মালিকের অপোগণ্ড নেশাগ্রস্ত ছেলেটি তার বাপের বুকের পাঁজরের মতো আদরের ধন বইগুলো পুরনো দোকানে বেচে প্যাথেড্রিন কিংবা হেরোইন কেনার পয়সা সংগ্রহ করেছে কিনা। একবার এই পুরনো বইয়ের দোকান থেকে আমি মহাকবি গ্যেটের 'সাফারিংস অব ইয়ং ভেরথার'-এর ইংরেজি অনুবাদের প্রথম সংস্করণেরও একটি কপি সংগ্রহ করেছিলাম। বইটা খুলে মালিকের সীলমোহরাঙ্কিত নাম-ঠিকানা দেখে চমকে উঠেছিলাম। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ৪০ মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা। নিজেকেই প্রশ্ন করেছিলাম ওই মসজিদ বাড়ি লেনের সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্রলোকটি কি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ? আমি আবেগে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলাম। আমার মনে হয়েছিলো, স্বয়ং মহাকবি গ্যোটে কবি সত্যেন্দ্রনাথ মারফত ওই বইটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দান্তের রচনাবলির একটা ইংরেজি অনুবাদ দোকানে এসেছে। এ ধরনের বই ধরে দেখতে কী যে আনন্দ! আমি ঝুঁকে পড়ে বইটার ঘ্রাণ নিচ্ছিলাম। ঠিক এই সময় আবু সাঈদ পেছন থেকে আমার জামা ধরে টান দিলো, দোস্ত, দেখে যাও একটা মজার জিনিস।

আবু সাঈদ আমাকে হিড় হিড় করে ম্যাগাজিনের দোকানটায় টেনে নিয়ে এলো। তারপর পাক্ষিক চিত্রিতা পত্রিকাখানা টেনে নিয়ে দেখিয়ে বললো, এই যে দোস্ত, কভার দ্যাখো, তোমার প্রিয়তম মহিলার পুরো পাতা জোড়া তিন রঙের ছবি। আমি দেখলাম, কভারে সত্যি সত্যি কন্যা শামারোখের ছবি। তিন রঙে ছাপা হয়েছে। মনে মনে একটা চোট পেয়ে গেলাম। আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ করে কোনো কথা বের হলো না। সাঈদ তার বড়ো বড়ো দাঁত দেখিয়ে হেসে বললো, দোস্ত, আমি বলি নি, ওই মহিলা দুই নম্বরী জাল মাল। তুমি শুধু শুধু ধূর্ত এই মহিলার পক্ষ নিয়ে, অকারণে লোকজনের শত্রুতে পরিণত হচ্ছো। দোস্ত, ওকে প্লেগ রোগের জীবাণুর মতো বর্জন করো। নইলে তুমি অনেক বিপদে পড়ে যাবে। তার অনেক বৃত্তান্ত আমি জানি। কাল সকালে আমার ঘরে এসো। সব কথা জানাবো। সাঈদের কথার কোনো জবাব দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। আমার মনের এখন এমন এক অবস্থা তার সঙ্গে কোনোরকম বাদানুবাদ করতে ইচ্ছেও হলো না। কন্যা শামারোখের যতোই ত্রুটি বা কলঙ্ক থাকুক না কেন, সেটা নিয়ে সাঈদের সঙ্গে কোনো কথা বলতে আমার মন রাজি হলো না। আমি কিছুই বললাম না। হোস্টেলের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। সাঈদ বললো, একটু দাঁড়াও। একটা ম্যাগাজিন কিনে নিই, পরে কাজে আসতে পারে।

সে রাতে হাজার চেষ্টা করেও আমি দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। কন্যা শামারোখ সম্বন্ধে হাজার চিন্তা করেও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না। মহিলা কেমন? যার হৃদয়ে এমন তীব্র যন্ত্রণা, জীবন জিজ্ঞাসা যার এমন প্রখর, সে কি করে একটি আধাপর্নো ম্যাগাজিনে নিজের ছবি ছাপতে পারে? বার বার ঘুরেফিরে একটা কথাই আমার মনে জেগে উঠতে থাকলো, আমি একটা বোকা। কিন্তু আমি যে বোকা সে কথাটা নিজেই জানিনে। আমি সব ব্যাপার এমন দেরিতে জানতে পারি কেনো? সবাই আমাকে ঠকিয়ে যাবে এই কি আমার ভাগ্য, নিজের গভীর দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে করতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন ঘুম ভাঙে অনেক দেরিতে। প্রাতঃকৃত্য সেরে ক্যান্টিনে গিয়ে দেখি ক্যান্টিন খালি। আমি ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে ন'টা বাজে। ইস্ এতোক্ষণ আমি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম! কোনোরকমে নাস্তা খেয়ে নিলাম। দোতলায় উঠবো বলে সিঁড়িতে পা দিয়েছি, এমন সময় মনে পড়ে গেলো, সাঈদ আমাকে গতকাল সন্ধেবেলা বলেছিলো, আমি যদি জানতে চাই তাহলে কন্যা শামারোখ সম্বন্ধে সে অনেক গোপন সংবাদ জানাতে পারে। আমি চরণে চরণে তিন তলায় উঠে ভেজানো দরোজা ঠেলে সাঈদের ঘরে প্রবেশ করলাম। কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখি, সাঈদ বিছানার ওপর উপুড় হয়ে রয়েছে। পরনের লুঙ্গি খোলা। তার বিছানার চাদরটার একটা বিরাট অংশ ভিজে গেছে। বালিশের কাছটিতে কন্যা শামারোখের ছবিসহ ম্যাগাজিনটা পড়ে আছে। এই দৃশ্য দেখার পর আমার বুঝতে বাকি রইলো না সাঈদ হারামজাদা কন্যা শামারোখের ছবির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মাস্টারবেট করেছে। আমাকে দেখামাত্রই সাঈদ চমকে উঠলো। তাড়াতাড়ি বালিশ টেনে চাদরের ভেজা অংশ ঢেকে ফেললো। সে আমার চোখের দিকে তাকাতে পারছিলো না। আমি কিছু না বলে তার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এলাম। আমার মনে কন্যা শামারোখ সম্বন্ধে একটা নির্বেদ জন্ম নিলো। যে ভদ্রমহিলা আধাপর্নো ম্যাগাজিনে ছবি ছাপতে দেয় এবং সে ছবি দেখে মানুষ মাস্টারবেট করে, তার নামের সঙ্গে কিছুতেই কন্যা যুক্ত হতে পারে না। শামারোখ এখন থেকে শুধু শামারোখ, কন্যা শামারোখ নয়।

শামারোখের সঙ্গে কন্যা শব্দটি যুক্ত রাখতে আমার মন আর সায় দিচ্ছে না। শামারোখ বিবাহিতা, এক সন্তানের জননী এবং স্বামীর সঙ্গে অনেকদিন হলো সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। তার বয়স হয়েছে, আমি তার কানের গোড়ায় বেশ ক'টা পাকা চুল দেখেছি। যদিও সে আশ্চর্য কৌশলে সেগুলো আড়াল করে রাখতে জানে। প্রচলিত সংজ্ঞা অনুসারে তাকে কুমারী বলা কিছুতেই সঙ্গত নয়। তারপরও এ পর্যন্ত তাকে আমি কুমারী বলেই প্রচার করে আসছি। শামারোখের সৌন্দর্যের মধ্যে আমি সন্ধান পেয়েছিলাম এমন এক বস্তুর, যা অত্যন্ত নিরীহ এবং সরল বন্য হরিণীকে মানায়, ঋতুবতী হওয়ার আগে কিশোরীর শরীরকে যা আলোকিত করে রাখে। আমি মনে করেছিলাম, শারীরিক বিবর্তনের মধ্যেও সেই মৌলিক জিনিসটি শামারোখ ধরে রেখেছিলো। এখন দেখছি আমার সেই ধারণা সঠিক নয়। আধাপর্নো ম্যাগাজিনে সে ছবি ছাপিয়ে আনন্দ পায় এবং সেই ছবি দেখে দেখে ইতর মানুষেরা মনের সুখে মাস্টারবেট করে। নিশ্চয়ই তার গহন

মননে এমন এক কামনা কাজ করে, সে চায়, ইতর মানুষেরা তার ছবির সঙ্গে যৌন সঙ্গম করতে থাকুক। আমি নিজে শামারোখ সম্পর্কিত যে ভাবমূর্তি তৈরি করেছিলাম তার ওপরের নিকেলগুলো ঝরে গেলো এবং কন্যা শামারোখের অর্ধেক অস্তিত্ব আমার মন থেকে মুছে গেলো। লোকে আমাকে বোকা মনে করতে পারে। আসলে আমি তো বোকাই। কিন্তু শামারোখের সঙ্গে কন্যা যোগ করাটাকে যদি কেউ বোকামো মনে করেন, আমি মেনে নেবো না। তাহলে পঞ্চ স্বামীর ঘরণী দ্রৌপদীকে মানুষ সতী বলবে কেনো? খ্রিস্ট জননীকেও-বা কেন কুমারী বলবে? আমার বেদনা হলো আমার কন্যাত্বের ধারণাটা শামারোখের বেলায় বেজায় রকম মার খেয়ে গেছে।

শামারোখকে আর কন্যা শামারোখ বলতে পারছিনে। তারপরও আমার কাছে তার একটা বিশেষ মূল্য রয়েছে। কারণ শামারোখ কবিতা লেখে। অবশ্য এ কথা ঠিক, যারা কবিতার ভালো-মন্দ বিষয়ে মতামত প্রদান করেন, তাঁরা শামারোখের লেখাগুলো কবিতা হয়েছে বলে মেনে নিতে চাইবেন না। শামারোখ যদি দীর্ঘকাল চর্চা করে ছন্দ, মাত্রা এইসব ঠিকমতো বসাতে শিখতো, তাহলে তারা ভিন্নরকম ধারণা পোষণ করতে বাধ্য হতেন। তার মনে ভাবনাগুলো যেভাবে এসেছে, অদলবদল না করে সেভাবেই প্রকাশ করেছে কবিতায়। তার শক্তি এবং সততা নিয়ে আমি অণুমাত্র সন্দেহও পোষণ করি নে। আমার মনে হলো তারপরও শামারোখের সঙ্গে একটা সম্পর্ক রক্ষা করতে পারবো। কারণ, নিজেকে, সে যা নয়, তেমন দেখাতে চায় না। আমি অপেক্ষা করছিলাম, শামারোখ আগামী শুক্রবার এলে তার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলা যাবে। একটা ব্যাপার তার সঙ্গে আমি স্পষ্ট করে নিতে চাই। ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরী তার চাকরির ব্যাপারটার সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ফেলেছেন। আমি জানি, আমি নিতান্তই তুচ্ছ এবং আদনা মানুষ। এই আদনা মানুষটাকেই তিনি ঘুম থেকে জাগিয়ে অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ডিপার্টমেন্টে শামারোখ যাতে না আসতে পারে, সে জন্য আমার সাহায্য কামনা করেছিলেন। নেহায়েত ঘটনাক্রমে বাংলা একাডেমিতে আমার সঙ্গে শামারোখের সাক্ষাৎ হয়েছিলো। ওই সাক্ষাৎটাই আমার বিপদের কারণ হয়েছে। ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরী, ড. মাসুদের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঘা বাঘা কর্তা আমার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এই সমস্ত মানুষ ও এলাকায় আমাকে আর কোনোদিন মাথা তুলতে দেবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমাকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবেন, আত্মহত্যা করেও আমি আত্মরক্ষা করতে পারবো না। এক কাজ করি নে কেনো, যে শামারাখের চাকরিকে কেন্দ্র করে আমার ওই দুর্গতির শুরু, শামারোখকে সেটা পাইয়ে দেবার লড়াইটা আমি করি নে কেনো? সেটা আমার আযোগ্য কাজ হবে না। কিছু মানুষ আমার শত্রু হবে বটে, অধিকাংশই তারিফ করবে। বলবে, ছেলেটার বুকের পাটা আছে, সুন্দর মহিলার জন্য বিপদ ঘাড়ে নিতে একটুও ভয় পায় না। আমার দুর্বলতা এবং আমার শক্তির কথা আমি জানি। দুর্বুদ্ধি এবং কূটকৌশলে আমি পণ্ডিতদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবো না। কিন্তু সাহস এবং ধৈর্যবলে এদের সবাইকে পরাজিত করতে পারি। মনে মনে স্থির করে নিলাম, শুক্রবারে শামারোখ এলে

বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে ঢুকিয়ে দেয়ার একটা সুরঙ্গ পথ তৈরি করার কলাকৌশল নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

১৩

শামারোখ শুক্রবার ঠিক বেলা তিনটের সময় আমার ঘরে এলো। আমি ভেবেছিলাম সে চারটেয় আসবে। আজকে তার পোশাকের সামান্য পরিবর্তন দেখলাম। সে হাতের কনুই অবধি লম্বা ব্লাউজ পরেছে। চুলগুলো বেঁধেছে টেনে খোঁপা করে। তার দোল দোলানো খোঁপাটা প্রতি পদক্ষেপে আন্দোলিত হচ্ছে। শামারোখ যাই পরুক না কেনো, তাকে সুন্দর দেখায়। রোদের ভেতর দিয়ে আসায় তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। সে আমার তিনপায়া চেয়ারটা টেবিলে ঠেস দিয়ে বসতে বসতে বললো, জাহিদ হাসান সাহেব, আপনার বিষয়ে একটা মাত্র প্লাস পয়েন্ট আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি। নইলে আপনার সবটাই নেগেটিভ। আপনি একটা বিশ্রী ঘরে থাকেন, নোংরা জামা-কাপড় পরে ঘুরে বেড়ান। আর দেখতেও আপনি সুন্দর নন। আমি বললাম, নেগেটিভ দিকগুলো তো জানলাম। এখন প্লাস পয়েন্টটার কথা বলুন। সে বললো, আপনি শুনলে আবার চটে যাবেন না তো? বললাম, না চটবো কেন? সে কপালের ঘাম ছোটো রুমালে মুছে নিয়ে বললো, শুধু লিকার চিনি দিয়ে চা-টা আপনি এতো ভালো বানান যে আপনার অন্যসব অপূর্ণতা ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে করে। আমি খুব খুশি হয়ে গেলাম। বললাম, আপনাকে কি এক কাপ বানিয়ে দেবো? শামারোখ বললো, আপনি হিটারে পানি গরম করতে থাকুন, আমি টয়লেটে গিয়ে হাত-মুখটা ধুয়ে আসি। আমি কেতলিটা পরিষ্কার করে হিটারটা জ্বালালাম। শামারোখ হাত-মুখ ধোয়ার জন্য টয়লেটে ঢুকলো। টয়লেট থেকে বেরিয়ে বললো, হাত-মুখ মোছার মতো আপনার ঘরে কিছু আছে? আমি গামছাটা বাড়িয়ে দিলাম। সে হাত-মুখ মুছতে মুছতে বললো, এইমাত্র আপনার আরো একটা প্লাস পয়েন্ট আমি আবিষ্কার করলাম। আমি বললাম, বলে ফেলুন। শামারাখ বললো, আপনার টয়লেটটিও ভারি খড়খড়ে। একটু হাসলাম। চা-টা বানিয়ে তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। সে কাপটা হাতে তুলে নিয়ে বললো, আমার বইটা পড়েছেন? আমি বললাম, পড়তে চেষ্টা করেছি। কিছু বলবেন? হ্যাঁ আমার লেখাগুলোর ব্যাপারে কথা বলতেই তো এলাম। আমি বাক্স খুলে তার কবিতার খাতাটা হাতড়ে বের করলাম। শামারোখ চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললো, এখন নয়, এখন নয়। এই বদ্ধ ঘরে, এমন গুমোট গরমের মধ্যে কি কবিতা আলোচনা চলে? রোদটা একটু পড়ুক। আপনাকে নিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গিয়ে বসবো। তখন কবিতা পড়ে শোনাবো। আমার এক বন্ধুও আসবে।

শামারোখ আমাকে নিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাবে এবং কবিতা পড়ে শোনাবে শুনে ভেতরে ভেতরে খুবই উল্লসিত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু তার একজন বন্ধুর আসার সংবাদে আমার উৎসবে ভাটা পড়ে গেলো। তবে শামারোখকে সেটা জানতে দিলাম না। সে আমার কাছে জানতে চাইলো, আচ্ছা জাহিদ সাহেব, আপনি কি কাজ করেন? আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, আপনি জানেন না? সে জবাব দিলো, আপনি তো আমাকে বলেন নি, জানবো কেমন করে? আমি বললাম, পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে রিসার্চ স্কলার হিশেবে নামটা রেজিস্ট্রেশন করেছি এবং মাসে মাসে সামান্য স্কলারশিপ পেয়ে থাকি। শামারোখ চা শেষ করে কাপটা টেবিলে রাখলো, তারপর বললো, আপনি এতো ট্যালেন্টেড মানুষ হয়েও এমন পোকা বাছার কাজটি নিলেন কেনো? আমি বললাম, আর কি করতে পারতাম, সংবাদপত্রের চাকরি? হঠাৎ করে শামারোখ জিগ্যেস করলো, আপনার সিগারেট আছে? আমি একটুখানি হকচকিয়ে গেলাম, আপনি সিগারেট খান? সে বললো, কেনো সিগারেট খেলে দোষ কি? গ্রামে দেখেন নি, মেয়েরা সবাই ঘরে হুঁকো টানে। আসলে আপনাদের পুরুষদের চিন্তাগুলো এমন একপেশেভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, মনে করেন সবতাতেই আপনাদের একচেটিয়া অধিকার। আমি জবাব দিতে পারলাম না। পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সবাই এমন উঠে পড়ে লেগেছে, মাঝে মাঝে মনে হয়, পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে মস্ত অপরাধ করে ফেলেছি। জন্মগ্রহণ করাটা যদি আমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করতো, আমি নারী হয়েই জন্মগ্রহণ করতাম। ঘরে সিগারেট ছিলো না। দোকানে গিয়ে এক প্যাকেট স্টার সিগারেট কিনে আনলাম। প্যাকেট খুলে তাকে একটা দিলাম এবং নিজে একটি ধরালাম। শামারোখ সিগারেটে টান দিয়ে খক খক করে কেশে ফেললো এবং কাশির বেগটা কমে এলে বললো, আপনি বাজে সিগারেট খান কেনো? বললাম, আমার ক্ষমতা যা তাতে ওই স্টারই কিনতে পারি। শামারোখ আধপোড়া সিগারেটের বাটটি এ্যাশট্রেতে রাখতে রাখতে বললো, আমি আপনাকে এক কার্টন ভালো সিগারট গিফ্ট করবো। আমি বললাম, তারপর কি হবে? সে বললো, আপনি অমন করে কথা বলছেন কেনো? আপনি আপনার দারিদ্র্য নিয়ে বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি করেন। দারিদ্র্যকে গ্লোরিফাই করার মধ্যে মহত্ত্ব কিছু নেই।

আমি শামারোখকে কিছুতেই আসল বিষয়ের দিকে টেনে আনতে পারছিলাম না। যে কথাগুলো ভেবে রেখেছি কি করে তা প্রকাশ করা যায়, তার একটা উপলক্ষ সন্ধান করছিলাম। সে বার বার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলো। এভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়ে দেয়ার পর আমি কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। শামারোখ জানতে চাইলো, আপনি এখন লিখছেন না? আমি বললাম, লেখা আসছে না। বেশ কিছুদিন থেকে একটা নাটক লেখার কথা ভাবছি। বিষয়টা আমার মনে ভীষণ ধাক্কা দিচ্ছে। শামারোখ বললো, আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি পা দুটো আপনার বিছানায় একটু টেনে দিচ্ছি। তারপর পা দুটো প্রসারিত করে টেবিলের ওপর রাখলো। কী সুন্দর ফরসা শামারোখের পা। আমার ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠলো। খুব কষ্টে সে ইচ্ছেটা দমন করলাম। সে বললো, আপনার নাটকের থিমটা বলুন দেখি। আমি বললাম, একটুখানি কমপ্লিকেটেড। গল্পটা আমি

'মডার্ন মাইন্ড' বলে একটা সাইকোলজিক্যাল রচনার সংকলনে পেয়েছি। শামারোখ বললো, বলে যান। আমি বলে যেতে লাগলাম : খোদা বক্স নামে একটি তরুণ ছাত্র কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ছিলো। অত্যন্ত গরিব। একটি বাড়িতে খাওয়া-পরার জন্য তাকে জায়গির থাকতে হতো। সেখানে সে একটি মেয়েকে পড়াতো। মেয়েটি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। মেয়েটির প্রতি খোদাবক্সের মনে এক ধরনের উষ্ণ অনুরাগ জন্ম নিয়েছিলো। খোদা বক্স একদিন কলকাতা ময়দানে একটি জাদুকরকে খেলা দেখাতে দেখে। জাদুকর শূন্য টুপি থেকে কবুতর উড়িয়ে দিলো। ঘুঁটে থেকে তাজা গোলাপ ফুল বের করে আনলো। এরকম আরো নানা আশ্চর্য জাদুর খেলা দেখার পর খোদা বক্সের মনে একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন এলো। সে চিন্তা করলো অস্থি ঘেঁটে আর মড়া কেটে কি ফল ? জাদু যদি না শিখতে পারি তো জীবনের আসল উদ্দেশ্যই মাটি হয়ে গেলো। সে কাউকে কিছু না বলে জাদুকরের সাগরেদ হয়ে শহরে শহরে ঘুরতে আরম্ভ করলো।

গল্প বলার মাঝখানে শামারোখ আমাকে থামিয়ে দিলো, আপনি বলেছেন যে, সে এক বাড়িতে জায়গির থাকতো। সে বাড়ির মেয়েটিকে ভালোবাসতো। সেই মেয়েটির কি হলো ? আমি বললাম, একটু অপেক্ষা করুন, বলছি। বলতে আরম্ভ করলাম। খোদা বক্স জাদুকরের সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা শহর ঘুরতে ঘুরতে পেশোয়ার চলে এলো। জাদুকরের কাছ থেকে সব খেলা শেখার পর বললো, আপনি এখন আমাকে আসল জাদু শেখান। জাদুকর বললো, আমার যা জানা ছিলো সব শিখিয়ে দিয়েছি তোমাকে, আমি এর বেশি আর কিছু জানিনে। খোদা বক্স বললো, আপনি যা শিখিয়েছেন সব তো হাতের চালাকি। আমি আসল জাদু শিখতে চাই। জাদুকর বললো, আসল জাদু বলতে কিছু নেই। এই হাতের চালাকির ওপর দিয়েই জগৎ চলছে। খোদা বক্সের মন প্রতিবাদ করে উঠলো। এতো বিশাল জগৎ এর সবটা চালাকির ওপর চলতে পারে না। নিশ্চয়ই এক অদৃশ্য শক্তি এই জগৎকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি সেই শক্তির সঙ্গে পরিচিত হবো এবং সেই শক্তি আমার মধ্যে ধারণ করবো। জাদুকর বললো, হীরের মতো কঠিন তোমার জেদ এবং আকাশস্পর্শী তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তুমি হিমালয়ের জঙ্গলে গিয়ে সন্ধান করে দেখতে পারো। প্রাচীনকালের জ্ঞানী মানুষদের খাঁটি শিষ্য এক-আধজনের সঙ্গে, ভাগ্য ভালো থাকলে, দেখা হয়েও যেতে পারে।

তারপর খোদা বক্স হিমালয়ের জঙ্গলে জঙ্গলে সন্ধান করতে আরম্ভ করলো। অনেক সন্ন্যাসী-ফকিরের সঙ্গ করলো। কিন্তু খোদা বক্সকে অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে এই সত্য মেনে নিতে হলো যে, তারা ঝুটা এবং জাল। সে আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলো। ভুটানের এক গুহায় সে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর দেখা পেয়ে গেলো। সন্ন্যাসী তার পিঠে হাত দিয়ে বললো, তুমি যা সন্ধান করছো, কারো কাছে পাবে না। তোমাকে নিজের ভেতর ডুব দিয়ে সে জিনিসটা বের করে আনতে হবে। তারপর খোদা বক্স কিছুটা তার মন থেকে এবং কিছুটা প্রাচীন যোগশাস্ত্রের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে ধ্যান করার একটা নতুন পদ্ধতি তৈরি করলো। দীর্ঘদিন ধ্যান করে সে একটা আশ্চর্য শক্তির অধিকারী হয়ে গেলো। এই শক্তিটা

পুরোপুরি রপ্ত করার পর মানুষের সমাজে ফিরে আসে। তখন ওই শক্তির খেলা দেখিয়েই সে জীবিকা নির্বাহ শুরু করে। সে বিনা চোখে দর্শন করারও একটা পদ্ধতি বের করেছে। লোমকূপ দিয়েই খোদা বক্স সবকিছু দেখতে পায়। চোখ বেঁধে দেয়ার পরও সে গাড়ি-ঘোড়া-পূর্ণ জনাকীর্ণ রাজপথে সাইকেল চালিয়ে যেতে পারে। একটি বন্ধ ঘরের দরোজার ফাঁক দিয়ে একটিমাত্র আঙুল বের করে বাইরে কি আছে বলে দিতে পারে। খোদা বক্সের বক্তব্য হলো, মানুষ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চোখকে দেখার কাজে ব্যবহার করে আসছে বলেই চোখ দিয়ে সে দেখতে পায়। একইভাবে মানুষ কানকে শোনার কাজে লাগিয়েছে বলেই সে কান দিয়ে শুনতে পায়। আসলে মানুষের দেখার ক্ষমতা চোখে নয়, শোনার ক্ষমতা কানে নয়, ক্ষমতা ভিন্ন জায়গায় অধিষ্ঠান করেছে। যেমন পুলিশ চোর ধরে এটা পুলিশের ক্ষমতা নয়, সে একটা বিশেষ ক্ষমতার নির্দেশ পালন করছে। আমাদের গল্পের খোদা বক্সের সঙ্গে ওই বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় হয়েছে। এতোদূর পর্যন্ত শোনার পর শামারোখ বললো, বাহ ভয়ংকর কমপ্লিকেটেড এবং একেবারে ওরিজিন্যাল আইডিয়া। দিন, আপনার পচা সিগারেট আরেকটা। আমি সিগারেট ধরিয়ে দিলাম। শামারোখ টানতে থাকলো। আমি বললাম, আমার কাহিনীতো এখনো শেষ হয় নি। শামারোখ বললো, বলে যান।

আমি বলে যেতে থাকলাম : ওই আশ্চর্য শক্তি অর্জন করার জন্যে খোদা বক্সকে চূড়ান্ত মূল্য দিতে হয়েছে। এখন খোদা বক্স ফুলের রঙ দেখতে পায় না, সঙ্গীত তার চিত্ত চঞ্চল করে না, শিশুর হাসি তার মনে সুখানুভূতি সৃষ্টি করে না, নারীর যৌবন তাকে উদ্দীপিত করে না। নিজের ভেতর আশ্চর্য শক্তি ধারণ করে ঈশ্বরের মতো একা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে। খোদা বক্সের এই যে সবরকমের অনুভূতির লুপ্তি ঘটলো, এটাই হলো তার ট্র্যাজেডি। আসলে সে এখন আর মানুষ নেই। খোদা বক্সের কাহিনীর ভেতর দিয়ে আমি আধুনিক মানুষের জীবনের ট্র্যাজিক দিকটি তুলে ধরতে চাই। আধুনিক মানুষ তার জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে সেই আশ্চর্য শক্তির সন্ধান করে যাচ্ছে, ফলে সে আর মানুষ থাকছে না। শামারোখ তার বড়ো বড়ো চোখ দুটো মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। তার দৃষ্টি থেকে প্রশংসা ঝরে পড়ছে। সে বললো, সঠিক ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে গোটা বিষয়টা যদি পরিস্ফুট করে তুলতে পারেন, ফাউস্টের মতো একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত তৈরি হবে। আমি বললাম, রাতের স্বপ্ন যদি দিবসে কোনোদিন আকার লাভ করে, হয়তো একদিন এই নাটক আমি লিখবো। শামারোখ বললো, আপনি লিখতে পারেন-বা না পারেন সেটা পরের ব্যাপার। এরকম একটা উজ্জ্বল আইডিয়া আপনার মনে এসেছে, সে জন্যে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাবো। এরপর আরেক কাপ চা হয়ে যাক। এবার আমিই বানাই। আমি বললাম, আমার হিটারটা অত্যন্ত খেয়ালি। অনভিজ্ঞ মানুষকে পছন্দ নাও করতে পারে। সুতরাং আমি রিস্ক নিতে পারবো না। শামারোখ বললো, আচ্ছা আপনি হিটারে পানি বসান, আমি/কাপগুলো ধুয়ে নিয়ে আসি। শামারোখ বেসিনে কাপ ধুতে গেলো।

এই সময় আমার ঘরে একজন দীর্ঘকায় ভদ্রলোক প্রবেশ করে বললেন, আচ্ছা, এই ঘরে কি জাহিদ হাসান থাকেন ? ভদ্রলোক চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলেন। দীর্ঘদিন বিলেতে

আমেরিকায় থাকলে বাঙালির উচ্চারণ পদ্ধতির মধ্যে যে একটা ধাতবতা জন্মায় এবং টেনে টেনে নাসিকাধ্বনি সহকারে বাংলা বলেন, এই ভদ্রলোকের কথা বলার ঢঙে তার একটা আভাস পাওয়া গেলো। আমি বললাম, আমার নামই জাহিদ হাসান। ভদ্রলোক এবারে আমার দিকে হাতের অর্ধেকটা বাড়িয়ে দিলেন। আমি বিরক্ত হলাম, তবুও পাঁচ আঙুলের সঙ্গে করমর্দন করে বিলেত ফেরতের মর্যাদা রক্ষা করলাম। ভদ্রলোকের মেরুদণ্ডটি একেবারে সোজা, মনে হয় বাঁকাতে পারেন না। চোখ দুটো ঘোলা ঘোলা। তিনি তাঁর ইঙ্গ-বঙ্গ উচ্চারণে জানালেন, আমার নাম সোলেমান চৌধুরী। আপনার এখানে শামারোখ বলে এক মহিলার আসার কথা ছিলো, আমি তার খোঁজেই এসেছি। এই সময় কাপগুলো হাতে করে শামারোখ বেরিয়ে এলো। সোলেমান চৌধুরীকে দেখে সে বললো, তোমার চিনতে তো অসুবিধে হয় নি তো? সোলেমান চৌধুরী বললেন, অসুবিধে হবে কেনো, আমি কি ঢাকার ছেলে নই, চলো, সবাই অপেক্ষা করছে। শামারোখ বললো, এতো গরমের মধ্যে যাবো কোথায়? বসো, চা খাও, বেলা পড়ে আসুক। সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে যাবো এবং জাহিদ হাসান সাহেবকে আমার কবিতাগুলো পড়ে শোনাবো। নিতান্ত অনিচ্ছায় সোলেমান চৌধুরী সাহেব আমার খাটে তাঁর দামি নিতম্বের একাংশ স্থাপন করে বললেন, কবিতা পড়ে শোনাবে, তাহলে তো হয়েছে, আমার পুরনো মাথা ব্যথাটা আবার নতুন করে জেগে উঠবে। তোমার যখন মাথা আছে, ব্যথাও আছে এবং সে ব্যথা জেগেও উঠতে পারে, কিন্তু আমি জাহিদ সাহেবকে কবিতা না শুনিয়ে কোথায়ও যেতে চাইনে, একথা বলে শামারোখ চেয়ারটা টেনে বসতে গেলো, অমনিই সে উল্টে মেঝের ওপর পড়ে গেলো। আঘাতটা তার বেজেছে, যদিও সে মুখে কিছু বললো না, কিন্তু মুখের ভাবে সেটি প্রকাশ পেলো। সোলেমান চৌধুরী শ্লেষ মিশিয়ে বললেন, কবিতা শোনাতে গেলে মাঝে মাঝে এমন আছাড় খেতে হয়। দু'জনের বাদানুবাদের মধ্যে আমার বলার কিছু খুঁজে পেলাম না। অবশ্য আমার বুঝতে বাকি রইলো না, ইনিই সেই সোলেমান চৌধুরী, যাঁর কথা আবুল হাসানাত সাহেব আমাকে বলেছিলেন। শামারোখকে নিয়ে তিনিই হাসানাত সাহেবের কাছে চাকরির ব্যাপারে অনুরোধ করেছিলেন। শামারোখ একটা চমৎকার গোলাপ, কিন্তু তার অনেক কাঁটা—কথাটা আমার মনে ছ্যাৎ করে ভেসে উঠলো। হাতে ময়লা লেগে যাবে এই ভয়ে অতি সন্তর্পণে সোলেমান চৌধুরী কাপটা হাতে নিয়ে আমার তৈরি আশ্চর্য চায়ে মাত্র দুটো চুমুক দিয়ে কাপটা রেখে দিলেন। বুঝলাম তাঁর রুচিতে আটকে যাচ্ছে।

আমরা চা খেয়ে হেঁটে হেঁটে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে চলে এলাম। শরতের অপূর্ব সুন্দর বিকেল। ঝিরিঝিরি হাওয়া বইছে। চারপাশের প্রকৃতি জীবন্ত। যেদিকেই চোখ যায়, মনে হবে কোথাও শূন্যতা, কোথাও অপূর্ণতা নেই। সর্বত্র প্রাণ যেনো তরঙ্গিত হয়ে উঠছে। আমরা উদ্যানের পুকুরের পশ্চিম দিকের পুকুর পাড়টির কাছে ঘাসের ওপর বসলাম। এতো সুন্দর জাজিমের মতো নরম ঘাস যে আমার শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিলো। সোলেমান চৌধুরী ইতস্তত করছিলেন, তিনি জুতোর ডগা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখছিলেন, ঘাসের তলা থেকে পানি-কাদা উঠে এসে তাঁর প্যান্টটা ময়লা করে দেবে

কিনা। অগত্যা তাঁকেও বসতে হলো। শামারোখ সোলেমান চৌধুরীকে বললো, এবার তুমি একটা সিগারেট জ্বালাও এবং একটু টেনে আমাকে দাও। সোলেমান চৌধুরী সিগারেট ধরালেন এবং শামারোখ কবিতার খাতাটার পাতা ওল্টাতে লাগলো। তারপর চুলের গোছাটা টেনে পেছনে ফিরিয়ে কবিতা পড়ার জন্য প্রস্তুত হলো। তার মুখের ভাবেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। সোলেমান চৌধুরী জ্বালানো সিগারেটটা শামারোখের হাতে ধরিয়ে দিলো। সে তাতে ক'টা নিবিড় টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কবিতা পড়তে আরম্ভ করলো।

শামারোখের কণ্ঠস্বরটি মার্জিত। উচ্চারণে কোনো জড়তা নেই। এতো তন্ময় হয়ে পাঠ করে যে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। প্রতিটি পঙ্‌ক্তি মনের ভেতর গেঁথে যায়। যেখানে আবেগ দেয়ার প্রয়োজন, সেখানে এমন সুন্দরভাবে এমন একটা গাঢ় আবহ সৃষ্টি করে, তার মাথায় হাত দিয়ে আদর করে দেয়ার ইচ্ছে জেগে ওঠে। কোনো কোনো অংশ পড়ার সময় তার স্বর জলতরঙ্গের মতো বেজে ওঠে। আমি নিজে নিজে যখন ওই কবিতাগুলো পাঠ করেছিলাম, তখন অনেক জায়গায় ছন্দের ভুল, এবং মাত্রায় বেশ-কম ধরতে পেরেছিলাম। কিন্তু শামারোখ যখন পড়ে গেলো, মাত্রা দোষ এবং ছন্দের ভুল হয়েছে একথা একবারও মনে হলো না। একসঙ্গে পাঁচটি ছোটো-বড় কবিতা পড়লো সে। আমি না বলে পারলাম না আপনার পড়ার ভঙ্গিটি এতোই চমৎকার যে ছন্দের ভুল, মাত্রা দোষ এগুলো একেবারেই কানে লাগে না। শামারোখ বললো, আমার ছন্দ, মাত্রা এসব ভুল হয়, আমি জানি। এই বড়ো কবিতাটি যখন পড়বো আপনি দেখিয়ে দেবেন, কোথায় কোথায় ত্রুটি আছে। এবার সোলেমান চৌধুরী বললেন, শামারোখ, তুমি বড়ো কবিতাটাও পড়বে নাকি ? শামারোখ বললো, অবশ্যই। সোলেমান চৌধুরী বললেন, তাহলে তো সন্ধে হয়ে যাবে, আমার বন্ধুরা অপেক্ষা করে আছে। শামারোখ জবাব দিলো, থাকুক, তোমার বন্ধুদের তো আর নতুন দেখছি নে। সোলেমান চৌধুরীও ক্ষেপে গিয়ে বললেন, তুমিও তো আর নতুন কবিতা পড়ছো না। এ পর্যন্ত কতো মানুষকে শোনালে। শামারোখ জবাব দিলো, আমার যতো লোককে ইচ্ছে ততো লোককে শোনাবো। তোমার মাতাল বন্ধুদের কাছে রোজ রোজ হাজিরা দিতে আমার প্রাণ চায় না। তোমার তাড়া থাকে যাও। আমি জাহিদ সাহেবকে সবগুলো কবিতা পড়ে শোনাবো। সোলেমান চৌধুরী উত্তেজনাবশত উঠে দাঁড়িয়ে শামারোখের দিকে কটমটে চোখে তাকালেন। তারপর এক পা এক পা করে চলে গেলেন। শামারোখ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

সোলেমান চৌধুরী তো চলে গেলেন। আমি চরম বেকায়দার মধ্যে পড়ে গেলাম। আমার মনে একটা অস্বস্তিবোধ পীড়া দিচ্ছিলো। শামারোখ এবং সোলেমান চৌধুরীর সম্পর্কের রূপটা কেমন, সে বিষয়ে আমি বিশেষ জ্ঞাত নই। হাসানাত সাহেবের কথা থেকে শুধু এটুকু জানতে পেরেছি, বিলেতে সোলেমান চৌধুরী এবং হাসানাত সাহেব একই ফ্ল্যাটে থাকতেন। এই সোলেমান চৌধুরীই একবার শামারোখের চাকরির তদ্বির করতে হাসানাত সাহেবের কাছে এসেছিলেন। সোলেমান চৌধুরী এবং শামারোখের

ভেতরকার সম্পর্কের ধরনটা কেমন, সেটা নিয়ে হাসানাত সাহেব কোনো কথা বলেন নি। মনে মনে আমি নানা কিছু কল্পনা করলাম। এমনও হতে পারে সোলেমান চৌধুরী শামারোখের বন্ধু। আবার নারী-পুরুষের বন্ধুত্বেরও তো নানা হেরফের রয়েছে। বিয়ে না করেও হয়তো তারা একসঙ্গে একই ছাদের তলায় বাস করেছে। অথবা এমনও হতে পারে বিয়ে করবে বলে উভয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে। দু'জনের সম্পর্কের মাঝখানে আমি কেমন করে এসে গেলাম। এই কথাটা চিন্তা করে আমি মনে মনে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলাম। আমি যদি এ জায়গায় না আসতাম, তাহলে দু'জনের মধ্যে এমন একটা খাপছাড়া ব্যাপার ঘটতে পারতো না। আমার সম্পর্কে সোলেমান চৌধুরী কি জানি ধারণা নিয়ে গেলেন। আমি তো আর বাচ্চা ছেলে নই। প্রথম থেকেই ভদ্রলোক যে আমাকে অপছন্দ করেছেন, সেটা বুঝতে কি বাকি আছে? ভদ্রলোক হাত মেলাবার সময় হাতের পাঁচটি আঙুল মাত্র বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। নিতান্ত অনিচ্ছায় তাঁর মহামূল্যবান নিতম্বের একটি অংশমাত্র আমার খাটে রেখেছিলেন। মুখে দিয়েই আমার বানানো চায়ের কাপটি সরিয়ে দিয়েছিলেন। এই রকম একটি মানুষ, যিনি প্রতিটি ভঙ্গিতে আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন, তাঁর সঙ্গে বিকেলবেলায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এলাম কেনো? আমাকে এখানে না আনলে কি শামারোখের চলতো না? ভদ্রমহিলা আমাকে নিয়ে কি করতে চান? আমি শামারোখের দিকে তাকালাম। সে চুপটি করে বসে আছে। মুখে কোনো কথা নেই। হাত দিয়ে টেনে টেনে পেছন থেকে চুলের গোছাগুলো মুখের ওপর ছড়িয়ে দিচ্ছে। কালো চুলে তার মুখের অর্ধেক ঢাকা পড়ে আছে। আলুলায়িতা শামারোখকে এই গোধূলিবেলায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পটভূমিকায় একটি সুন্দর ধাঁধার মতো দেখাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে আমার মনে একটা আতঙ্কের ভাব জাগলো। এই মহিলা তার অপরূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে জড়িয়ে আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে যেতে চাইছে! হঠাৎ ঝালমুড়ি বিক্রেতা, সফ্ট ড্রিংকঅলা এবং অন্য হকারদের চিৎকারে আমাকে উঠে দাঁড়াতে হলো। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বিশেষ সুবিধের জায়গা নয়। এখানে যে-কোনো অঘটন যে-কোনো সময় ঘটে যেতে পারে। দশ-বারোজন কিশোর চিৎকার করছে সাপ সাপ বলে এবং ইটের টুকরো, মাটির ঢেলা হাতের কাছে যা পাচ্ছে ছুঁড়ে মারছে। সাপের কথা শুনে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে আতঙ্কের একটা শীতল স্রোত প্রবাহিত হলো। শামারোখকে বললাম, তাড়াতাড়ি উঠে আসুন। সে সামনের চুলগুলো পেছনে সরাতে সরাতে বললো, কেনো কি হয়েছে? আমি বললাম, ফিরিঅলারা সাপ সাপ বলে চিৎকার করছে শুনতে পাচ্ছেন না। যেনো কোথাও কিছু হয় নি, শামারোখ এমনভাবে ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে শাড়ি ঠিক করতে করতে বললো, অতো ভয় পাচ্ছেন কেনো? সাপতো অত্যন্ত সুন্দর জিনিশ। তার ঠোঁটে একটা রহস্যময় হাসি খেলে গেলো। ফিরিঅলারা ইট-পাটকেল ছুঁড়তে ছুঁড়েতে মার মার বলে এগিয়ে আসছে। আমরা পলায়মান সাপের মাথাটি দেখতে পেলাম। লিকলিকে শরীরটা ঘাসের জন্য দেখা যাচ্ছে না। মাথাটা অন্তত আধ হাত খানেক তুলে ধরে দ্রুতবেগে পালিয়ে প্রাণে বাঁচতে চাইছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঘনায়মান অন্ধকারেও

দেখা গেলো সাপের মাথা থেকে একটা সোনালি রেখা শিরদাঁড়ার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। শরীরের রং ঘাসের মতো সবুজ। শামারোখ অনুচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠলো, দেখছেন সাপটা কী সুন্দর! পিঠের ওপর সোনালি রেখাটি দেখেছেন? শামারোখ অবাক হয়ে ভয়তাড়িত সাপটাকে দেখছে। আমি তাকে হাত ধরে টানতে টানতে উদ্যানের বাইরে নিয়ে এলাম।

বাংলা একাডেমির গোড়ায় এসে বললাম, কোথায় যাবেন বলুন, আপনাকে রিকশা ডেকে দিই। সে বললো, এক কাজ করুন, আমাকে আপনার হোস্টেলে নিয়ে চলুন। গল্প করে একটা রাত কাটিয়ে দেয়া যাবে। আমার মনে হলো, শামারোখ আমার সঙ্গে রসিকতা করছে। তাই আমি জানতে চাইলাম, আমি হোস্টেলে নিয়ে গেলে আপনি থাকতে পারবেন? সে বললো, কেনো নয়, আমাকে তার চাইতেও আরো অনেক খারাপ জায়গায় রাত কাটাতে হয়েছে। আমি বললাম, আমাদেরটা ছেলেদের হোস্টেল, মহিলারা সেখানে থাকতে পারে না। শামারোখ ফের জিগ্যেস করলো, আপনাদের হোস্টেলে রাতে কোনো মহিলা থাকতে পারে না? আমি বললাম, কোনো কোনো মহিলা লুকিয়ে চুরিয়ে থাকে কিন্তু তারা ভালো মহিলা নয়। তার ঠোঁটে আবার সেই রহস্যময় হাসিটা খেলে গেলো, আমাকে আপনি ভালো মহিলা মনে করেন তাহলে? তার কথা শুনে ক্ষেপে গেলাম। আমি বললাম, আপনি ভালো কিংবা খারাপ, সে আপনার ব্যাপার, কিন্তু এখন যাবেন কোথায় বলুন, রিকশা ঠিক করে দিই। এবার শামারোখের উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর শুনলাম, আপনার কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই? একজন ভদ্রমহিলাকে শুধু রিকশায় উঠিয়ে দিয়ে মনে করবেন মস্ত একটা দায়িত্ব পালন করেছি। ঢাকা শহরের রাস্তাঘাটের যা অবস্থা এই ভর সাঁঝবেলা একেবারে একাকী কোথাও যাওয়ার জো আছে! রাস্তাঘাট চোর-ছ্যাচড় এবং হাইজাকারে ভর্তি। আমি তো মহা-মুশকিলে পড়ে গেলাম। ভদ্রমহিলাকে নিয়ে আমি কি করি! শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলাম, আপনি বলে দিন, আমাকে এখন কি করতে হবে? শামারোখ আমার চোখে চোখ রেখে সেই রহস্যময় হাসি হাসলো। তার ওই হাসিটি দেখলে আমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। কি করবো স্থির করতে না পেরে আচাভুয়োর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

শামারোখ হাতের ইশারায় একটা রিকশা ডেকে চড়ে বসলো। আমাকে বললো, আপনিও উঠে আসুন। আমার তো ভাবনা-চিন্তা লোপ পাওয়ার যোগাড়। আমতা আমতা করে বললাম, আপনার সঙ্গে আমি আবার কোথায় যাবো? শামারোখের ধৈর্যচ্যুতির লক্ষণ দেখা দিলো, আপনি তো কম ঘাউরা লোক নন। বলছি উঠে আসুন। অগত্যা উঠে বসতে বাধ্য হলাম। নিজেকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করে রিকশার একপাশে আড়ষ্ট হয়ে বসলাম। শামারোখ বললো, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেলো না, অমন চোরের মতো হাত-পা গুটিয়ে আছেন কেনো? আমরা যে রিকশায় উঠেছি, তার খোলের পরিসর নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। যদি আমি শরীরটা মেলে দিই, শামারোখের শরীরে আমার শরীর ঠেকে যাবে। তার স্তনের সঙ্গে আমার কনুইয়ের সংঘর্ষ লেগে যাবে। রিকশা যখন চলতে আরম্ভ করলো আমি শামারোখের শরীরের ঘ্রাণ পেতে আরম্ভ

করলাম। হাল্কা হাওয়ার টানে এক ধরনের মৃদু সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিলো। ফুরফুরে নরম এক ধরনের ইন্দ্রিয়-অবশ-করা সুগন্ধি মেখেছে শামারোখ। আমার খুবই ইচ্ছে করছিলো, হাত দিয়ে তার অনাবৃত কাঁধ দুটো স্পর্শ করি, তার আন্দোলিত স্তন দুটো ছুঁয়ে দেখি। কিন্তু বাস্তবে ভিন্নরকম কাজ করে বসলাম। রিকশাঅলাকে বললাম, ভাই, একপাশে নিয়ে রিকশা দু'মিনিট রাখবে ? শামারোখ জিগ্যেস করলো, কেনো রাখবে রিকশা ? আমি বললাম, সিগারেট জ্বালাবো। শামারোখ ঝংকার দিয়ে উঠলো, এই আপনার সিগারেট খাওয়ার সময় ? আমি বললাম, সিগারেট খেলে আপনার অসুবিধে হবে ? সে তেমনি ঝঙ্কৃত গলায় বললো, আমার সুবিধে-অসুবিধের কথা আপনি কি বুঝবেন ? ঠিক আছে জ্বালিয়ে নিন আপনার সিগারেট।

রিকশাঅলাকে কোথায় যেতে হবে সে কথা আমরা দু'জনের কেউ বলি নি। শাহবাগের কাছাকাছি এসে সে জানতে চাইলো, কোথায় যেতে হবে ? আমি বললাম, মেম সাহেবের কাছে জেনে নাও। শামারোখ ধমকের স্বরে বলে বসলো, মেম সাহেব ডাকলেন কেনো ? বললাম, কি ডাকতে হবে আপনি বলে দিন। সে বললো, আপনার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। আপনি একটা গ্রামীণ কুষ্মাণ্ড, বোধশোধ কিছুই জন্মায় নি। আমি হেসে উঠতে চাইলাম, এতোক্ষণে ঠিক ধরে ফেলেছেন, আমি একটা গ্রামীণ কুষ্মাণ্ডই বটে। শামারোখ বললো, ঢের হয়েছে, আর পাকামো করবেন না। রিকশাঅলাকে বললো, ভাই গ্রিন রোড চলো।

রিকশা যখন এলিফেন্ট রোড ছাড়িয়ে যাচ্ছে শামারোখ আমার গায়ে আঙুলের গুঁতো দিয়ে বললো, সব ব্যাপারে হে হে আপনার হে হে করার অভ্যেস। মহিলার কথা শুনে আমার পিত্তি জ্বলে গেলো। বললাম, আপনার সঙ্গে এক রিকশায় যাওয়া আমার সম্ভব হবে না। রিকশাঅলাকে বললাম, ভাই আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে যাও। শামারোখ আমার হাত দুটো ধরে ফেলে বললো, নামতে চাইলেই কি নামা যায় ? আপনি তো অদ্ভুত মানুষ। একজন ভদ্রমহিলাকে রাস্তার মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে বললেই হলো, আমি চললাম। আশ্চর্য বীরপুরুষ। আমি বললাম, আপনাার সঙ্গে আমার বনছে না, সুতরাং আমার নেমে যাওয়াই উচিত। ভদ্রমহিলা বললেন, আমার কথা শুনুন, তবেই বনবে। আমি বললাম, বলুন আপনার কথা। সে বললো, যে বাড়িতে যাচ্ছি ওরা হচ্ছে এমন মানুষ, যাদেরকে বলা যায় ফিলথিলি রিচ। টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না। সুতরাং আপনার পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় বলবো আপনার বাবার তিন কোটি টাকার সম্পত্তি আছে, সাহিত্যচর্চা করেন বলেই এমন ভাদাইম্যার মতো থাকেন। আমি চিন্তাও করতে পারছিনে, মহিলা আমাকে কোন্ ফাঁদে জড়াচ্ছেন! আমি বললাম, আমার বাবাও নেই, টাকাও নেই। আপনি তিন কোটি টাকার মালিকের পুত্র এই পরিচয় দেবেন কেনো ? শামারোখ জবাব দিলো, আপনি আমার সঙ্গে এক রিকশায় যাচ্ছেন, আমার একটা ইজ্জত আছে না ? সুন্দরী মহিলার সঙ্গে এক রিকশায় চড়ে এই এতোদূর এসেছি, তার শরীরের ঘ্রাণে বুকের বাতাস পর্যন্ত আলোড়িত হয়ে উঠেছে, শরীরের স্পর্শে সুপ্ত সব বাসনা জেগে উঠেছে। এই মহিলা আমাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে জল্লাদের হাতে

তুলে দিতে চাইলেও আমি অমত করার মতো কিছু পেলাম না। যা আছে কপালে ঘটবে।

রিকশাটা এসে গ্রিনরোডের একটা বাড়ির সামনে দাঁড়ালো। জমকালো বাড়ি। বন্ধ গেটের সামনে একজন বুড়োমতো দারোয়ান টুলের ওপর বসে আছে। শামারোখকে দেখে দারোয়ান অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো, বেগম সাহেবা আপনি? শামারোখ জিগ্যেস করলো, আদিল সাহেব আছেন? দারোয়ান বললো, জ্বি। ভেতরে ঢুকে দেখলাম, বাড়ির প্রাঙ্গণে লোহার রড এবং বালুর স্তূপ। দু'খানি বড়সড়ো ট্রাক একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। এতোসব লোহালক্কড় পেরিয়ে আমরা বাড়ির সামনে চলে এলাম। শামারোখ কলিংবেলে চাপ দিতেই দরোজা খুলে গেলো। দোহারা চেহারার একজন ফরসাপানা ভদ্রলোক সামনে দাঁড়িয়ে। শামারোখকে দেখে ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, আরে আরে শামারোখ, এতোদিন পরে, পথ ভুলে এলে নাকি? শামারোখের পেছন পেছন আমিও ড্রয়িংরুমে পা রাখলাম। আমাকে দেখামাত্রই ভদ্রলোকের উচ্ছ্বাস আপনা থেকেই থেমে গেলো। জানতে চাইলেন, ইনি কে? শামারোখ বললো, উনার কথা পরে বলছি, বাড়িতে ফরিদা আপা আছেন? ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ আছে। শামারোখ বললো, চলুন তাঁর সঙ্গে আগে দেখা করি। ভদ্রলোকের পেছন পেছন শামারোখ সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে আরম্ভ করলো। আমাকে বললো, জাহিদ সাহেব, আপনি একটু অপেক্ষা করবেন, আমি ওপর থেকে আসি।

ড্রয়িংরুমে বসে আমি একটা সিগারেট জ্বালালাম। এই বাড়ির সমস্ত কিছুতে কেবলই টাকার ছাপ, চোখে না পড়ে যায় না। সোফাসেটগুলো বড় এবং মোটাসোটা। দেয়ালে আট-নয়টা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। মনে হলো ওগুলো কোনো বিদেশী ক্যালেন্ডার থেকে কেটে বাঁধানো হয়েছে। একপাশে আরবিতে আল্লাহ এবং মুহম্মদ লেখা ক্যালিগ্র্যাফি। অন্যদিকে কাবাশরিফের আদ্ধেক দেয়াল জোড়া একটা ছবি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এই ছবিগুলো দেখলেই বাড়ির মালিকের রুচির একটা পরিচয় পাওয়া যাবে। বিদেশী ক্যালেন্ডার থেকে কেটে নেয়া অর্ধনগ্ন নারীদের ছবি গৃহস্বামী যেমন পছন্দ করেন, তেমনি ধর্মকর্মেও তাঁর মতি। আল্লাহ, মুহম্মদ এবং কাবাশরিফের আদ্ধেক দেয়াল জোড়া সোনালি ফ্রেমে বাঁধাই ছবি থেকে তার পরিচয় মেলে। ঘরের যেদিকেই তাকাই, মনে হচ্ছিলো, সবখানে কাঁচা টাকা হুঙ্কার দিচ্ছে। এই ধরনের পরিবেশের মধ্যে এসে আমি ভয়ানক অসহায়বোধ করতে থাকি। আমার অস্তিত্বের অর্থহীনতা বড় বেশি পীড়ন করতে থাকে। এই ঘরের হাওয়ার মধ্যে এমন কিছু আছে, যা আমার স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। আরেকটা সিগারেট ধরাবো কিনা চিন্তা করছিলাম। এমন সময় দেখি সেই দোহারা চেহারার ভদ্রলোক ওপর থেকে নেমে এসে আমার উল্টোদিকের সোফায় বসলেন। তারপর আমার চোখ-মুখের দিকে খুব ভালো করে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, আপনার নাম? জবাব দিলাম, জাহিদ হাসান। ভদ্রলোক মনে হয় একটা ভ্রূকুটি করলেন। আমার মনে হলো নামটা তাঁর পছন্দ হয় নি। তারপর তিনি জানতে চাইলেন, কোথায় থাকি? বললাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের

হোস্টেলে। তিনি জিগ্যেস করলেন, ওখানে কি করেন ? আমি বললাম, একজন রিসার্চ ফেলো। ভদ্রলোক এবার আরো নাজুক একটা প্রশ্ন করে বসলেন, শামারোখের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক ? আমি মনে মনে একটুখানি সতর্কতা অবলম্বন করলাম। শামারোখ আসার সময় রিকশায় আমাকে বলেছিলো, এই বাড়িতে আমার বাবা যে তিন কোটি টাকার মালিক আমার এই পরিচয় প্রকাশ করবে। মনে হলো, ভদ্রলোক প্রশ্ন করে আমি সত্যি সত্যি তিন কোটি টাকার মালিকের ছেলে কিনা, সেই জিনিসটি যাচাই করে নিতে চাইছেন। এবার আমি ভালো করে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। তাঁর মাথার সবগুলো চুল পেকে যায় নি আবার চুল কাঁচাও নেই। তাঁর গলার ভাঁজের মধ্যে তিনটি শাদা রেখা দেখতে পেলাম। বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক নিয়মিত ঘাড়ে-বগলে এবং গলায় পাউডার মেখে থাকেন। গলার মধ্যে শাদা তিনটি রেখা, ওগুলো পাউডারেরই দাগ। আমি এবার ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়েই জবাব দিলাম, শামারোখ আমার বন্ধু। তিনি ফের চানতে চাইলেন, কি ধরনের বন্ধু ? আমি বললাম, কি ধরনের বন্ধু বললে আপনি খুশি হবেন ?

এই সময় পর্দা ঠেলে শামারোখ ড্রইংরুমে প্রবেশ করলো। তার হাতে একটি ট্রে। ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম এবং প্লেটে দুটো রসগোল্লা আর দুখানা নিমকি। আমি বললাম, এককাপ চা ছাড়া কিছুই খাবো না। কারণ এখনই হোস্টেলে ফিরে ভাত খেতে হবে। শামারোখ আমাকে চা বানিয়ে দিলো। আমি চায়ে চুমুক দিতে থাকলাম। সে রসগোল্লা এবং নিমকির প্লেটটা সেই দোহারা চেহারার ভদ্রলোকের সামনে বাড়িয়ে ধরে বললো, আদিল ভাই এগুলো আপনিই খেয়ে ফেলবেন। ভদ্রলোক অত্যন্ত জোরের সঙ্গে জানালেন, আমি মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। কিছুদিন হয় ডায়াবেটিসের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তারপর কথাটা ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করলেন, মানে ডাক্তার বলছিলেন, সময়-অসময়ে মিষ্টি খেলে ডায়াবেটিস হয়ে যেতে পারে। তাই আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন করছি। আমার মনে হলো, ভদ্রলোকের ডায়াবেটিস হয়েছে, কিন্তু সেটা শামারোখের কাছ থেকে গোপন করতে চান।

আমি চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। ভদ্রলোক সম্পর্কে আমার মনে একটা বিশ্রী ধারণা জন্ম নিয়েছে। আসার সময় তাঁকে ভদ্রতা দেখাবার কথাও ভুলে গেলাম। শামারোখ আমার পেছন পেছন গেট অবধি এলো। সে জানালো, আজকের রাতটা সে এখানেই কাটাবে। কারণ আদিল ভাইয়ের স্ত্রী ফরিদা আপা তাকে খুবই স্নেহ করেন। দেখা দিয়েই চলে গেলে ফরিদা আপা ভীষণ রাগ করবেন। তারপর আমাকে বললো, পরশুদিন বিকেলবেলা আমি যেনো তাদের বাড়িতে যাই। আমার সঙ্গে তার নাকি অনেক কথা আছে। সে একটা ভাঁজ করা কাগজ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো এর মধ্যে ঠিকানা লেখা আছে। গেটের বাইরে চলে এসেছি। শামারোখ আবার আমাকে ডেকে বললো, শান্তিনগর বাজারে গিয়ে আবুলের হোটেলের তালাশ করবেন। হোটেলের বাঁ দিকের গলিতে আমাদের বাড়ি। গ্রিন রোডের সেই বাড়ি থেকে আসার পর আমি মস্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলাম। শামারোখের সঙ্গে সোলেমান চৌধুরীর

সম্পর্কের ধরনটা কি ? সেদিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে রাগারাগি করে তিনি চলেও বা গেলেন কেনো ? শামারোখ আমাকে গ্রিনরোডের বাড়িটায় নিয়ে গেলো কেনো, আমার বাবা তিন কোটি টাকার মালিক—ও-বাড়িতে এই পরিচয়ই-বা দিতে হবে কেনো ? আমার মনে হচ্ছে আমি একটা অদৃশ্য জালের মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছি। একাধিকবার এ চিন্তাও আমার মনে এসেছে। কোথাকার শামারোখ, ক'দিনেরই-বা পরিচয়, এখনো তাকে ভালো করে জানিনে-শুনিনে, তার ব্যাপারের মধ্যে আমি জড়িত হয়ে পড়ছি কেনো ? আমার কি লাভ ? বেরিয়ে আসতে চাইলেই পারি। কিন্তু আসবো কেনো ? অজগরের শ্বাসের মধ্যে কোনো প্রাণী যখন পড়ে যায় এবং আস্তে আস্তে চরম সর্বনাশের দিকে ছুটতে থাকে, আমার রক্তের মধ্যেও সর্বনাশের সে রকম নেশাই এখন কাজ করতে আরম্ভ করেছে।

১৪

দু'দিন পর শান্তিনগরে শামারোখদের বাড়িতে গেলাম। বাড়ি চিনে নিতে বিশেষ কষ্ট হয় নি। আবুলের হোটেলের সামনের পানের দোকানটিতে যখন জিগ্যেস করলাম, দোকানদার আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়েই বললো, যে বাড়িতে তিনজন সুন্দরী মাইয়া মানুষ আর একটা বুড়া মানুষ থাকে, হেই বাড়ি তালাশ করতাছেন ? নাক বরাবর সিধা যাইবেন, তারপর বামে ঘুইরবেন, গেইটের সামনে দেখবেন একটা জলপাই গাছ, সেই বাড়ি। জলপাই গাছ দেখে আমি ভেতরে ঢুকলাম। এক বিঘের মতো জমির মাঝখানে একটা ছোট একতলা ঘর। আর জমির চারপাশে বাউন্ডারি দেয়াল দেয়া আছে। একপাশে তরিতরকারির বাগান। এক ভদ্রমহিলা প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে পানি দিচ্ছেন। অনিন্দ্যসুন্দরী মহিলা, চোখ ফেরানো যায় না। মুখমণ্ডলটা ভালো করে তাকালে শামরোখের সঙ্গে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। এই ধরনের ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলতে গেলে হঠাৎ করে মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরিয়ে আসতে চায় না। আমি ডান হাতটা তুলে সালাম দেয়ার ভঙ্গি করলাম। ভদ্রমহিলা আমার দিকে মুখ তুলে তাকালে আমি জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা এটা কি শামারোখদের বাড়ি ? মহিলা কথা শুনে বিরক্ত হলেন মনে হলো। আঙুল দিয়ে সামনের দরোজা দেখিয়ে বললেন, ওদিক দিয়ে ঢোকেন।

ঘরের দরজা খোলা ছিলো। আমি জুতো না খুলেই ভেতরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম একেবারে সাধারণ একটি তক্তপাশের ওপর একজন প্রবীণ ভদ্রলোক ঝুঁকে পড়ে কি সব লিখছেন। চারপাশে ছড়ানো অজস্র ধর্মীয় পুস্তক। ভদ্রলোকের মুখের দাড়ি

একেবারে বুকের ধার অবধি নেমে এসেছে এবং সবগুলো পেকে গেছে। ভদ্রলোককে আমি সালাম দিলাম। তিনি হাত তুলে আমার সালাম নিলেন এবং কড়া পাওয়ারের চশমার ভেতর দিয়ে আমার আপাদমস্তক ভালো করে লক্ষ্য করলেন। ভদ্রলোক খুবই নরম জবানে জানতে চাইলেন, আমি কেনো এসেছি ? আমি বিনয় সহকারে বললাম, শামারোখ আমাকে আসতে বলেছিলো। এবার ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে খুব সুন্দর করে হাসলেন। গামছা দিয়ে ঝেড়ে একটা কাঠের চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন, বসুন। আমি বসলাম। কিন্তু বাড়ির ভেতরে শামারোখের উত্তপ্ত চিৎকার শুনতে পেলাম। আরেক মহিলার সঙ্গে শামারোখ চেঁচিয়ে ঝগড়া করছে। দু'জনে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা কইছে না। এমন সব খারাপ শব্দ তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে, শুনলে কানে আঙুল দেয়ার প্রয়োজন হয়। ভদ্রলোক টুনু টুনু বলে কয়েকবার ডাকলেন। ঝগড়ার আওয়াজের মধ্যে ভদ্রলোকের ডাক চাপা পড়ে গেলো। আমার দিকে তাকিয়ে করুণ হাসি হেসে বললেন, আজ সকালবেলা থেকে আমার মেয়ে এবং পুত্রবধূ তুমুল ঝগড়াঝাটি করছে। এই প্রচণ্ড চিৎকারের মধ্যেও ভদ্রলোককে নির্বিকার পড়াশোনা করে যেতে দেখে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। জিগ্যেস করলাম, আপনি কি লিখছেন ? তাঁর চোখে-মুখে একটা লজ্জার আভাস খেলে গেলো। বললেন, আমি কোরআন শরিফের ইয়াসিন সুরাটা বাংলায় অনুবাদ করার চেষ্টা করছি। আমি জিগ্যেস করলাম, আপনি আরবি জানেন ? তিনি বললেন, এক সময় তো ভালোই জানতাম। পঁচিশ বছর সরকারি চাকরি করেছি। ভাবছিলাম রিটায়ার করার পর শান্তমনে আল্লা-রসুলের কাজ করবো। তা আর হচ্ছে কই! সব সময় অশান্তি। দেখছেন না মেয়ে এবং ছেলের বউ কিভাবে ঝগড়া করছে। ভদ্রলোককে আমার মরুভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা মসজিদের নির্জন গম্বুজের মতো মনে হলো। ভদ্রলোক অনুবাদের কিছু অংশ আমাকে দেখালেন। পড়তে আমার বেশ লাগলো। তিনি বললেন, কোরআনের ভাষা-রীতির মধ্যে একটা কবিত্ব আছে। সেই জিনিসটা ফুটিয়ে তুলতে না পারলে অনুবাদ সঠিক হয় না। আমি ভাষার অর্থটা বুঝি, কিন্তু সুপ্ত কবিত্ব বোধটুকু বাংলা ভাষায় আনতে পারিনে, আল্লাহ আমাকে সে শক্তি দান করেন নি।

তরকারি বাগানে যে ভদ্রমহিলা পানি দিচ্ছিলেন, তিনি এসে বললেন, আব্বুজান, আজ বিকেলে আমি মেজো আপার কাছে চলে যাচ্ছি। এই জাহান্নামের মধ্যে আমার থাকা সম্ভব হবে না। ভদ্রলোক বললেন, আজ বিকেলেই যেতে চাও ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ভদ্রলোক বললেন, আচ্ছা। ভদ্রমহিলা কেঁদে ফেললেন, তার আয়ত চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠলো, আপনি যে যাই করুক সব সময়ে আচ্ছা বলে পাশ কাটিয়ে যান। আম্মুজান বেঁচে থাকলে এরকম আচ্ছা বলে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারতেন ? ভদ্রলোক কোনোরকম উচ্চবাচ্য না করে চুপ করে রইলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার ছোট মেয়ে বানু।

ভেতরের ঘর থেকে আর কোনো আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হয় দু'জনেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমি চলে আসবো কিনা চিন্তা করছিলাম। শামারোখের বাবা

বললেন, আপনি একটু বসুন, আমি ভেতরে গিয়ে দেখে আসি কি অবস্থা। ভদ্রলোক ভেতরে গেলেন। অতর্কিতে শামারোখ বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বললো, এই যে জাহিদ সাহেব, কখন এসেছেন ? সহসা আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। শামারোখকে এই অবস্থায় না দেখলে আমাদের দু'জনের জন্যই ভালো হতো। শামারোখ বললো, আপনি এসেছেন, খুবই ভালো হয়েছে। আমাকে থানায় নিয়ে চলুন। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম, থানায় কেনো ? শামারোখ তার ডান বাহুটা আমার সামনে তুলে ধরে দেখালো, দেখছেন, হারামজাদি কামড়ে আমার কি দশা করেছে। আমি দেখলাম শামারোখের সুন্দর বাহুর মাংসের ওপর মনুষ্য দন্তের ছাপ। মাংস কেটে ভেতরে প্রবেশ করেছে এবং দরদর করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। আমি কি করবো ঠিক করে উঠতে পারলাম না। বললাম, বাড়িতে ডেটল জাতীয় কিছু থাকলে লাগিয়ে আগে রক্তপাত বন্ধ করুন। শামারোখ বললো, না না, রক্তপাত বন্ধ করলে থানা কেস নিতে চাইবে না। আগে হারামজাদিকে অ্যারেস্ট করাই, তারপর অন্য কিছু।

শামারোখের ছোট বোন বানু এসে আমাকে সরাসরি বললো, আমাদের বাড়ির ব্যাপারে আপনি নাক গলাবার কে ? আমার বোন, আমার ভাবির সঙ্গে ঝগড়া করেছে, সেও আমার চাচাতো বোন। আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে আপনি বাইরে থেকে এসে বাগড়া দেবার কে ? বানুর কথায় কোনোরকম কান না দিয়ে আমি শামারোখকে নিয়ে আমার এক পরিচিত ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে গেলাম।

শামারোখ আমাকে মস্ত একটা গোলকধাঁধার মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে। তার ব্যাপারে আমি কোনো ধারণা নির্মাণ করতে পারছি নে। তার কবিতা পড়ে মনে হয়েছে সে খুবই অসহায় এবং দুঃখী মহিলা। এই দুঃখবোধটাই তার কবিতায় অগ্নিশিখার মতো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠে। প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের পাপড়িতে শেষ রাতের ঝরে-পড়া শিশিরের মতো সূর্যালোকে দীপ্তিমান হয়। তার মুখমণ্ডলের অমলিন সৌন্দর্যের প্রতি যখন দৃষ্টিপাত করি, পিঠময় ছড়িয়ে পড়া কালো কেশের দিকে যখন তাকাই, যখন নিশি রাতের নিশ্বাসের মতো তার আবেগী কবিতা পাঠ শ্রবণ করি, আমার মনে ঢেউ দিয়ে একটা বাসনাই প্রবল হয়ে জেগে ওঠে, এই নারীর শুধু অঙ্গুলি হেলনে আমি দুনিয়ার অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে যেতে পারি।

এই সময়ের মধ্যে শামারোখের বিষয়ে আমার কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতাও হয়েছে। শামারোখ আমার ঘরে সোলেমান চৌধুরীকে নিয়ে এসেছিলো। এই চৌধুরীর সঙ্গে আমাকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত যেতে হয়েছে এবং একসঙ্গে বসে শামারোখের কবিতা পাঠ শুনতে হয়েছে। শামারোখ এবং সোলেমানের বিশ্রী ঝগড়া অত্যন্ত কাছে থেকে আমি দেখেছি। শামারোখ এবং সোলেমানের সম্পর্কটি কি ধরনের ? শামারোখ যদি আমাকে টেনে না নিতো, এই ধরনের নাসিক্য উচ্চারণে কথা বলা বঙ্গীয় ইংরেজের সঙ্গে কখনো আমি সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অবধি যেতাম না। তারপর শামারোখ আমাকে কি কারণে সেই গ্রিন রোডের উদ্ধত অর্থবান আদিলের বাড়িতে নিয়ে গেলো, তাও আমার বোধবুদ্ধির সম্পূর্ণ বাইরে। একবার সোলেমান, একবার আদিল, এই ধরনের

মানুষদের সামনে শামারোখ আমাকে উপস্থিত করছে কেনো? তার কি কোনো গোপন মতলব আছে? মাঝে মাঝে মনের কোণে একটা সন্দেহ কালো ফুলের মতো ফুটে উঠতে চায়। শামারোখ আমাকে এসব মানুষকে আটকাবার জন্য টোপ হিশেবে ব্যবহার করতে চায় কিনা।

শামারোখদের শান্তিনগরের বাড়িতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হলো, তাতে মহিলার মানসিক সুস্থতার ব্যাপারে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে। ক্যামব্রিজ থেকে পাস করে আসা একজন মহিলা কী করে তার আপন ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গে জন্তুর মতো কামড়াকামড়ি করে থানা-পুলিশ করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে পারে! মনে মনে ভেবে দেখতে চেষ্টা করি, এই মহিলা আমাকে কতোদূর নিয়ে যেতে পারে। এই দুই বিপরীতমুখী ভাবনায় আমার ভেতরটা দু'টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

শামারোখের মুখটা যখন আমার স্মরণে আসে, সমগ্র শরীরের মধ্য দিয়ে একটা আবেগ প্রবাহিত হয়। আমি থর থর করে কেঁপে উঠতে থাকি। আমার ইচ্ছে হয়, এই সুন্দর নারী, প্রতি চরণপাতে যে পুষ্প ফুটিয়ে তোলে, তার জন্য জীবন মনপ্রাণ সবকিছু উজাড় করে দিই। আবার যখন তার বিবিধ অনুষঙ্গের কথা চিন্তা করি এক ধরনের বিবমিষা আমার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই মহিলাকে প্রাণের ভেতরে গ্রহণ করা যেমন অসম্ভব, তেমনি প্রাণ থেকে ডালেমূলে উপড়ে তুলে বিষাক্ত আগাছার মতো ছুঁড়ে ফেলাও ততোধিক অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তার সম্পর্কে চোখ বন্ধ করে চিন্তা করলে কখনো অনুভব করি সে অমৃতের পেয়ালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে, আবার কখনো মারাত্মক প্লেগের জীবাণুর মতো অস্পৃশ্য মনে হয়। এই দোলাচলবৃত্তির মধ্যেই আমি দিন অতিবাহিত করছিলাম।

১৫

আমার গ্রামের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বায়তুল মোকাররম গিয়েছিলাম। ভদ্রলোক গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছেন। পরিবার-পরিজনের কাপড়-চোপড় কেনার জন্য আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাজার থেকে কাপড়-চোপড় কেনার কাজটি আমি অপছন্দ করি। অথচ মানুষ সেই অপছন্দের কাজটি করার জন্য আমাকে বার বার ধরে নিয়ে যায়। এ-দোকান সে-দোকান ঘুরে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঘোরার চাইতে পাঁচমিশেলি মানুষের ভিড়ই হয়রান করেছে বেশি। গ্রামের ভদ্রলোককে বিদেয় করার পর ভাবলাম, যাক বাঁচা গেলো!

আমি বায়তুল মোকাররমের সামনে এসে মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিলাম। সন্ধের বাতি জ্বলে উঠেছে। গাড়ি-ঘোড়ার আওয়াজ, মানুষের আওয়াজ, বিচিত্র বর্ণের আলোর উদ্ভাস

সবকিছু মিলিয়ে আমার মনে হলো, সন্ধেবেলার ঢাকা যেন ভূতপ্রেতের বাগানবাড়ি। এখানে সবকিছুই ভুতুড়ে। আমি পথ দিয়ে হেঁটে আসছিলাম। একা একা পথ চলার সময় মনে নানারকম ভাবনার উদয় হতে থাকে। জেনারেল পোস্টাফিস ছাড়িয়ে আমি আব্দুল গনি রোডে চলে এলাম। এই রাস্তাটিতে রিকশা চলে না। সুতরাং অল্পস্বল্প ফাঁকা থাকে। হঠাৎ করে পেছন থেকে কে একজন আমার শরীরে হাত রাখলো। আমি চমকে উঠলাম। হাইজ্যাকারের পাল্লায় পড়ে গেলাম না তো! এ মাসের স্কলারশিপের পুরো টাকাটা এখনো আমার পকেটে। যদি নিয়ে যায় সারা মাস আমার চলবে কেমন করে? পেছনে তাকিয়ে দেখি অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর তায়েবউদ্দিন সাহেব। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছেন। অদূরে তাঁর শাদা ফিয়াটখানা দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন, কি ভায়া, তোমার ভাবনার ব্যাঘাত ঘটালাম নাকি? বেশ হেলতে দুলতে যাচ্ছো একাকী। আমি একটুখানি লজ্জিত হলাম। বললাম, না স্যার, এই সন্ধেবেলায় এই ফাঁকা রাস্তায় হাঁটতে ভালো লাগে। তিনি বললেন, তুমি তো আবার ভাবুক মানুষ। গাড়িতে উঠতে বললে রাগ করবে? আমি বললাম, রাগ করবো কেন স্যার। আমি গাড়ির পেছনে বসতে যাচ্ছিলাম। তায়েবউদ্দিন সাহেব তাঁর পাশের সিটটি দেখিয়ে বললেন, এখানেই বসো, কথা বলতে সুবিধে হবে। গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো। তিনি বনানীর স্কাইলার্ক রেস্টুরেন্ট-কাম বারের গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বললেন, তোমাকে পেয়ে খুবই ভালো হলো। আজকে তোমার সঙ্গেই চুটিয়ে আড্ডা দেবো। এতো ব্যস্ত থাকতে হয় শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে কোনো খবরাখবর রাখাই সম্ভব হয় না। তোমার মুখ থেকেই এ বিষয়ে কিছু শুনবো। প্রফেসর তায়েবউদ্দিন লিফ্‌টে উঠে বোতাম টিপলেন। আমার কেমন বাধো বাধো ঠেকছিলো। একজন নামকরা প্রফেসরের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে এসে আড্ডা দেয়া, এরকম কিছু আমাদের দেশে সচরাচর ঘটে না।

রেস্টুরেন্টে ঢুকে আমি অবাক হয়ে গেলাম। দেশী-বিদেশী নারী-পুরুষ জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে। প্রায় প্রত্যেক টেবিলের সামনেই গ্লাস। কোনোটা ভর্তি, ফেনা উঠছে। কোনোটা অর্ধেক শেষ হয়েছে। এ ধরনের জায়গায় আমি আগে কোনোদিন আসি নি। রেস্টুরেন্টটিতে প্রবেশ করার পর আমার মনে হলো আমি অন্য কোনো দেশে এসে গেছি। তায়েবউদ্দিন সাহেব উত্তর-পশ্চিম কোণার দিকের একটা খালি টেবিলের সামনে এসে বসলেন। আমাকে তাঁর বিপরীত দিকের চেয়ারটি দেখিয়ে বললেন, ওখানেই বসো। আমি যখন বসলাম, তিনি জানালার দিকে আঙুল প্রসারিত করে বললেন, এই জায়গাটা খুবই ভালো। এখান থেকে ঢাকা শহরের স্কাই লাইন খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। প্রফেসর তায়েবের পর্যবেক্ষণ শক্তির তারিফ করতে হয়। সত্যিই, এই জানালার সামনে দাঁড়ালে ঢাকা শহরের একটা সুন্দর ছবি চোখে পড়ে। এই সন্ধেবেলায় রাজপথের ছুটন্ত গাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হলো যেন দ্রুতগামী গবাদিপশুর সারি। ধাতব আওয়াজ, কর্কশ চিৎকার, ট্রাক ড্রাইভারের খিস্তি কোন্ মায়াবশে যেনো উধাও। এয়ারকন্ডিশন্ড রেস্টুরেন্টের কাচের জানালা দিয়ে গমনাগমনের মৃদুমন্দ ছন্দটিই শুধু ধরা পড়ছিলো। ইউনিফর্ম পরা বেয়ারা সামনে এসে দাঁড়ালে

তায়েবউদ্দিন সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি একটু হুইস্কি খাবো। তুমি কি খাবে বলো ? আমি বললাম, আমি এককাপ চা খেতে চাই। তিনি বললেন, চা খেতে গেলে নিচের তলায় যেতে হবে। আমি বললাম, তাহলে স্যার আমি কিছুই খাবো না। তিনি বললেন, তা কি করে হয়, অন্তত একটা বিয়ার খাও। বেয়ারাকে বললেন, আমাকে চার পেগ হুইস্কি দাও, সঙ্গে সোডা। আর এই সাহেবকে একটা বিয়ার। সঙ্গে খাবার কি আছে ? বেয়ারা কাছে এসে বললো, বটি কাবাব এবং হাঁসের ফ্রাই করা মাংস আছে। তায়েবউদ্দিন সাহেব বললেন, হাঁসের ফ্রাই-ই দাও।

তায়েবউদ্দিন সাহেব চেয়ার থেকে উঠে বললেন, তুমি বসো। আমি একটু টয়লেট থেকে আসি। বেয়ারা গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে দিলো। সোডার গ্লাসটি পাশে রাখলো। তারপর বিয়ারের টিনটি আমার সামনে রেখে ভেতরে চলে গেলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই ড্রাগন আঁকা সোনালি বর্ডার দেয়া চীনেমাটির প্লেটে ফ্রাই করা হাঁসের মাংস অত্যন্ত তরিবৎ সহকারে বসিয়ে দিলো। তায়েব উদ্দিন সাহেব ন্যাপকিনে হাত মুছতে মুছতে চেয়ারে বসে বললেন, বাহ্ হাঁসের মাংসের গন্ধ তো ভারি চমৎকার! আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। কারণ এই স্বপ্নপুরীর রেস্টুরেন্ট, এই তরল হুইস্কির গ্লাস, ড্রাগন আঁকা প্লেটে ধূমায়িত হাঁসের মাংসের ফ্রাই, বুকে সোনালি তকমা আঁটা বেয়ারা—সবকিছুই আমার কাছে নতুন এবং অপরিচিত। এই পরিবেশে আমার আসার কথা নয়। যদিও আমি টেবিলের সামনে হাজির আছি, আমার একটা অংশ মনে হচ্ছে আব্দুল গনি রোডে রেখে এসেছি। প্রফেসর তায়েব হুইস্কিতে সোডা মিশিয়ে চুমুক দিলেন এবং কাঁটা চামচ দিয়ে এক টুকরো হাঁসের ফ্রাই মুখের মধ্যে পুরে দিলেন। তাঁর মুখ থেকে আহ্ শব্দটি বেরিয়ে এলো। বোঝা গেলো মাংসের স্বাদ তাঁর ভালো লেগেছে। তাঁর দেখাদেখি আমিও কাঁটা চামচ দিয়ে এক খণ্ড হাঁসের ফ্রাই মুখে ঢুকিয়ে দিলাম। প্রফেসর সাহেব হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। গ্লাসটা টেবিলে রেখে হঠাৎ তিনি আমাকে জিগ্যেস করে বসলেন, ওকি, তুমি বিয়ারের টিনটা খোল নি কেনো ? আমি চুপ করে রইলাম। বিয়ারের টিন কি করে কোন্‌দিক দিয়ে খুলতে হয়, তাও আমি জানি নে। তিনি সেটা বুঝে গেলেন এবং নিজেই টিনটা খুলে আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি টিনটা কাত করে গ্লাসে ঢালতে গিয়ে দেখি ভুস ভুস করে ফেনা বেরিয়ে এসে টেবিলে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আমি রীতিমতো অপ্রস্তুত বোধ করতে থাকলাম। প্রফেসর তায়েব বললেন, ও কিছু না, এক মিনিটের মধ্যেই কেটে যাবে। আমি যখন বিয়ারের গ্লাস তুলে সামান্য পান করলাম, এক ধরনের তেঁতো স্বাদে আমার জিব একরকম অসাড় হয়ে গেলো। বমি বমি ভাব অনুভব করছিলাম। অন্য জায়গায় অন্য পরিবেশে হলে হয়তো হড়হড় করে বমি করে ফেলতাম। কিন্তু এই রেস্টুরেন্টে আসার পর থেকেই একটা ভীতি আমার শরীরে ভর করেছে, সেই কারণেই বমি করে সবকিছু উগড়ে দেয়া সম্ভব হলো না। থেমে থেমে আমি বিয়ার গলায় ঢেলে দিচ্ছিলাম।

প্রফেসর তায়েব একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললেন, তোমরা যারা শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত আছো, মাঝেমধ্যে এসব জায়গায় আসা উচিত। মানুষ কিভাবে লাইফ এনজয়

করে, সেটাও তোমাদের জানা উচিত। অভিজ্ঞতা না থাকলে ইনসাইট জন্মাবে কেমন করে ? হুইস্কির ঘোরেই তিনি জিগ্যেস করলেন, তা তুমি এখন কি লিখছো ? আমি বললাম, কিছুদিন থেকে লিখতে পারছিনে। মনে মনে আমি প্রফেসর তায়েবকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনি আমার নিজের বিষয়ে বিশেষ ধারণা পোষণ করেন। আমি বললাম, স্যার, আমার মাঝে মাঝে এমন হয়। চেষ্টা করেও একলাইন লিখতে পারি নে।

প্রফেসর হাতের ইশারায় বেয়ারাকে ডেকে তাঁর গ্লাসে আরো তিন পেগ হুইস্কি দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তারপর আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, কিন্তু বাজারে তোমার নামে একটা দুর্নাম রটেছে যে আজকাল তুমি কিছুই করছো না, লিখছো না এবং গবেষণার কাজও করছো না। সকাল-সন্ধে এক সুন্দরী মহিলাকে নিয়ে নাকি কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছো!

তার মুখে এই কথা শোনার পর আমার ভেতরে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেলে গেলো। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিলো, প্রফেসর তায়েব আমাকে গাড়িতে চড়িয়ে এই রেস্টুরেন্টে নিয়ে এসেছেন শুধু এই একটি কারণে। শামারোখ সম্পর্কে সব ধরনের খবরাখবর সংগ্রহ করাই তাঁর অভিপ্রায়। এবার আমি তাঁর দিকে ভালো করে তাকালাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সম্পর্কে যতোগুলো গল্প চালু আছে, এক এক করে আমার মনে পড়তে লাগলো। প্রফেসর তায়েবের স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন এবং তিনি আলাদা বাড়িতে বাস করেন। তাঁর বাড়িতে স্থায়ীভাবে কোনো কাজের মেয়ে থাকতে পারে না। কোনোটাকে তায়েব সাহেব নিজে তাড়িয়ে দেন, কোনোটা আপনা থেকেই চলে যায়। কোনো কোনো কাজের মেয়েকে আবার ভীষণ জমকালো সাজপোশাকে সাজিয়ে রাখেন। অন্য শিক্ষকদের বেগমেরাও সেটা লক্ষ্য না করে পারেন না। এতোদিন আমি বিশ্বাস করে এসেছি এই প্রতিভাবান শিক্ষকের খোলামেলা স্বভাবের জন্য ঈর্ষাপরায়ণ শত্রুরা তাঁর নামে অপবাদ রটিয়ে দিয়েছে। এখন আমার মনে হলো, তাঁর নামে যেসব গুজব রটেছে, তার সবগুলো না হলেও অনেকগুলো সত্যি। তাঁর সম্পর্কে যে শ্রদ্ধার ভাবটি এতোদিন পোষণ করে আসছিলাম, ভেঙে খান খান হয়ে গেলো। আমার সারা শরীর থেকে ঘাম নির্গত হচ্ছিলো। নিজের অজান্তেই গ্লাসের সমস্ত বিয়ার কখন শেষ করে ফেলেছি, টেরও পাই নি।

প্রফেসর তায়েবের দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনি এখনো আমার দিকে তাকিয়ে উত্তরের প্রতীক্ষা করছেন। এই প্রথমবার তার বাঁকা নাকটা দেখে আমার শকুনের কথা মনে পড়ে গেলো, আমাদের দেশে বিশেষ সাপ এবং শকুনের বিশেষ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে—এই সংবাদ কোনো একটা প্রাণী বিষয়ক ম্যাগাজিনের মাধ্যমে জেনে গিয়েছিলাম। তায়েব সাহেবের মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে মনে হলো, পৃথিবী থেকে সাপ এবং শকুনের বিশেষ প্রজাতি বিলুপ্ত হলে কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না, একেক টাইপের মানুষের মধ্যে এই সাপ-শকুনেরা নতুন জীবনলাভ করে বেঁচে থাকবে।

তায়েব সাহেব আমাকে আব্দুল গনি রোড থেকে এই এতোদূরে নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে স্বপ্নপুরীর মতো এই রেস্টুরেন্টে নিয়ে এসেছেন। তাঁর পয়সায় জীবনে প্রথমবার

বিয়ার চেখে দেখার সুযোগ পেলাম। সুতরাং, শামারোখ সম্পর্কিত তথ্যাদি যদি তাঁর কাছে তুলে না ধরি, তাহলে নেমক হারামি করা হবে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রেখে-ঢেকে শামারোখের গল্পটা তাঁর কাছে বয়ান করলাম। সব কথা প্রকাশ করলাম না। যেটুকু না বললে গাড়িতে চড়া এবং বিয়ার পান হালাল হয় না, সেটুকুই বললাম।

শরীফুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব আমাকে ডেকে নিয়েছিলেন সে কথা জানালাম। বাংলা একাডেমিতে শামারোখের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তারপর প্রফেসর হাসানাত প্রসঙ্গ এবং ড. মাসুদের বাড়ি থেকে আমার না খেয়ে চলে আসা—এ সব কিছুই তায়েব সাহেবকে জানালাম। তিনি শুনে ভীষণ রেগে উঠলেন। বললেন, জাহিদ, শোনো, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্বর এবং স্যাডিস্ট মানুষেরা রাজত্ব করছে। একবার এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে আবার নাকচ করা, এই নোংরা প্রাকটিস আমাদের দেশেই সম্ভব। ইউরোপ-আমেরিকার কোথাও হলে সব ব্যাটাকে জেল খাটতে হতো। শামারোখ কষ্টে পড়েছে সে জন্য তিনি চুক চুক করে আফসোস করলেন।

প্রফেসর তায়েব আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, জাহিদ, আই মাস্ট থ্যাংক ইউ। তোমার উদ্দেশ্য মহৎ। তোমার নামে যা কিছু শুনেছি, এখন বুঝতে পারছি সেসব সত্য নয়। ভদ্রমহিলা কষ্টে পড়েছেন। তাঁর চাকরির ব্যাপারটা অত্যন্ত জেনুইন। কিন্তু তুমি তাঁকে সাহায্য করবে কিভাবে! বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমার কাজটাও তো হয় নি। তোমার কথা শুনবে কে? এক কাজ করো, তুমি ভদ্রমহিলাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

সোনা চোরাচালানির পেছনে গোয়েন্দা লাগলে যেমন হয়, আমারও এখন সেই দশা। আমার অনুভব শক্তি যথেষ্ট প্রখর নয়। তবুও বুঝতে বাকি রইলো না প্রফেসর তায়েব প্রক্রিয়াটির সূচনা করে দিলেন। আরো অনেক মহাপুরুষ শামারোখকে সাহায্য করার জন্য উল্লাসের সঙ্গে এগিয়ে আসবেন। তখন শামারোখকে তাদের ঠিকানায় পৌঁছে দেয়াই হবে আমার কাজ।

১৬

ইউনুস জোয়ারদার খুন হয়ে আমার মধ্যে গোপন রাজনীতির প্রতি অনুরাগের বীজটি বুনে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই বীজের রাজনীতির জল-হাওয়া লেগে অঙ্কুরিত হতে সময় লাগে নি। ইউনুস জোয়ারদারের অবর্তমানে তার পার্টিতে যোগ দেয়ার সাহস আমার হয় নি। কারণ খুন করা এবং খুন হওয়া দুটোর কোনোটার সাহস আমার ছিলো না। আমি এমন একটা পার্টি বেছে নিলাম যেটা অর্ধেক গোপন এবং অর্ধেক প্রকাশ্য। তার

মানে পার্টির গোপন সেল আছে এবং সেখান থেকে সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয়। আর প্রকাশ্য অংশের কাজ হলো সেগুলোকে চলতি রাজনীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে তার অনুকূলে জনমত সৃষ্টি করা। লেখক, সাহিত্যিক এবং শিক্ষকদের ভেতর যোগাযোগ করার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছিলো। আমার সঙ্গে প্রকাশ্য অংশের বিশেষ সম্পর্ক ছিলো না, মিটিং-মিছিলে অংশগ্রহণ করা ছাড়া। আমি সরাসরি পার্টির বস কমরেড এনামুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতাম। তিনি বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া জনসমক্ষে দেখা দিতেন না। এই রহস্যময় পুরুষ, যাঁর কথায় বিপ্লব, হাসিতে কাশিতে বিপ্লব, এমন এক মহাপুষের সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্ক আছে মনে করলে আমি মনের মধ্যে একটা জোর অনুভব করতাম। ভাবতাম, আমি কখনো একা নই। এই রহস্যময় পুরুষ অদৃশ্যভাবে আমার সঙ্গে অবস্থান করছেন। কমরেড এনামুল হকের কাছে প্রতি পনেরো দিন অন্তর আমার কাজকর্মের রিপোর্ট দিতাম। শামারোখের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর তিনমাস কোথা দিয়ে কিভাবে পার হয়ে গেলো, আমি বুঝতে পারি নি। একদিনও কমরেড এনামুল হকের কাছে যাওয়া হয় নি। অথচ তিনি তিন-চারবার দেখা করতে সংবাদ পাঠিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত আমি খিলগাঁও চৌধুরী পাড়ায় কমরেড এনামুল হকের গোপন আস্তানায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। আমাকে সংবাদ জানানো হলো কমরেড অন্য কমরেডদের সঙ্গে জরুরি বিষয়ে আলাপ করছেন। আমাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমি বাইরের ঘরে হাতল ভাঙা চেয়ারের ওপর বসে পড়লাম। ঘণ্টাখানেক পর আমাকে ভেতরে ডাকা হলো। কমরেড এনামুল হকের ঘরে দেখলাম আধোয়া প্লেটের স্তূপ। মাংসের হাড়গোড় সরিয়ে নেয়া হয় নি। সারা ঘরে ছড়ানো স্টার সিগারেটের বাট। দেয়ালে মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন এবং মাও সে তুংয়ের ছবি। আমরা যারা কমরেড এনামুল হকের চ্যালা, সঙ্গত কারণেই বিশ্বাস করি, বাংলাদেশে যদি সর্বহারার সফল বিপ্লব হয়, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাওসে তুং-এর পাশে কমরেড এনামুল হকও একটা স্থান দখল করে নেবেন। আমি তিনমাস আসি নি। এই সময়ের মধ্যে কমরেড এনামুল হকের দাড়ি-গোঁফ আরো লম্বা হয়েছে। তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির রহস্যময়তা আরো গাঢ় হয়েছে। যে হাতের বজ্রমুষ্টিতে তিনি সমাজের সমস্ত বন্ধন চূর্ণ করবেন বলে আমরা মনে করি, সেই হাত দিয়ে কমরেড এনামুল হক আমার হাত চেপে ধরলেন। পুরুষের হাত। এই হাতের স্পর্শ একবার যে পেয়েছে, কমরেড হকের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারে নি। কমরেড হক তাঁর তেজোব্যঞ্জক রহস্যময় দৃষ্টি এমনভাবে আমার ওপর প্রয়োগ করলেন, আমার মনে হলো, শরীরের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত দেখে ফেলতে পারেন। তার সেই দিব্য দৃষ্টি থেকে কোনো কিছুই আমরা লুকোতে পারি নে। এবার কমরেড হক কথা বললেন, আমরা মনে করলাম, কমরেড জাহিদ বিপ্লবী দায়িত্ব ভুলে গিয়েছেন এবং আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। আমি ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়লাম। আমতা আমতা করে একটা কৈফিয়ৎ দাঁড় করাতে চেষ্টা করলাম, শরীর ভালো ছিলো না, তাছাড়া গবেষণার কাজে মনোযোগ দিতে হয়েছিলো। আমার খোঁড়া কৈফিয়ৎ শুনে

বললেন, কমরেড জাহিদ, আপনাকে আর বানিয়ে বানিয়ে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। আমরা জানি একজন সুন্দরী মহিলাকে নিয়ে আপনাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকত হয়েছিলো না, সেজন্য আপনাকে দোষারোপ করবো না বরং আপনার তারিফ করবো। মনে আছে কমরেড, প্লেটো বলেছিলেন, সুন্দরী মহিলারা সমজের এজমালি সম্পত্তি। আপনার বান্ধবীকেও পার্টিতে নিয়ে আসুন। ভয় পাবেন না, বান্ধবী আপনার ঠিকই থাকবে, কিন্তু কাজ করবে পার্টির।

আমার মনে হলো, কমরেড এনামুল হকের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলা ভালো। আমি বললাম, কমরেড, এই ভদ্রমহিলা তো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ চাইছেন। কমরেড এনামুল হক আবার ঠা ঠা করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, কমরেড, রাগ করবেন না, আপনার চিন্তা-চেতনা এখনো বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণায় আচ্ছন্ন। এই সুন্দরী মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি করবে? আপনি কি চান ওই বস্তাপচা জিনিস পড়িয়ে মহিলা তার জীবন অপচয় করবেন? বিপ্লবের তাজা কাজে লাগিয়ে দিন। আমি বললাম, তার থাকার অসুবিধা আছে, চলার কোনো সঙ্গতি নেই। কমরেড এনামুল হক বললেন, সেই দুশ্চিন্তা আপনার নয়। পার্টি সব ভার বহন করবে। তারপর তিনি আমার কাঁধে হাত দিয়ে গোপন কিছু ফাঁস করছেন, এমনভাবে বললেন, কমরেড, জানেন, একজন সুশিক্ষিত সুন্দর মহিলা আমাদের পার্টিতে থাকলে আমাদের কতো সুবিধে হয়। আমাদের শত্রুদের খবরাখবর সংগ্রহ করতে হয়, চাঁদা ওঠাতে হয়। ভয় পাবেন না কমরেড, আপনার বান্ধবী আপনারই থাকবে, লাগিয়ে দিন পার্টির কাজে। একটু অবসর সময়ে আসবেন, আমি লেনিনের রচনাবলি খুলে আপনাকে দেখাবো, মহামতি লেনিন পরিষ্কার বলেছেন, বিপ্লব সফল করতে হলে সৌন্দর্য, শক্তি, অর্থ, মেধা, কৌশল সবকিছু একযোগে কাজে লাগাতে হবে। নিয়ে আসুন আপনার বান্ধবীকে। আমি নিস্পৃহভাবে বললাম, কমরেড, ওই মহিলার মাথার মধ্যে একটা দুটো নয়, অনেকগুলো ছিট আছে। এ ধরনের মহিলা বিপ্লবী কাজ-কর্মের মোটেই উপযুক্ত হবে না। কমরেড হক একটা চুরুট জ্বালালেন এবং টান দিয়ে বললেন, কমরেড জাহিদ, বললে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন, বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা আপনার মনে এমনভাবে শেকড় গেড়েছে যে, বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি আপনার মধ্যে এখন পর্যন্ত জন্মাতে পারে নি। মানুষের যতো রকম ব্যাধি আছে তার অর্ধেক সামাজিক ব্যাধি। বিপ্লবী কর্মকাণ্ড হলো এ ধরনের রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের মোক্ষম ওষুধ। পার্টিতে নিয়ে আসেন, দেখবেন, এক সপ্তাহের মধ্যে আপনার বান্ধবী সুস্থ হয়ে উঠবেন।

বুঝলাম, শামারোখের অবস্থা হয়েছে গোল আলুর মতো। গোল আলু যেমন মাছ, মাংস, সুটকি সব কিছুর জন্য প্রয়োজন, তেমনি শামারোখকেও সবার প্রয়োজন। বিপ্লবের জন্য, কবিতার জন্য, রাজনীতির জন্য, এমনকি লুচ্চোমি-ত্যাঁদরামোর জন্যও শামারোখের প্রয়োজন। দিনে দিনে নানা স্তরের মানুষের মধ্যে তার চাহিদা বাড়তে থাকবে। ভার বইবার দায়িত্বটুকু কেন একা আমার! যদি পারতাম কেঁদে মনের বোঝা হাল্কা করতাম।

১৭

একদিন দুপুরবেলা শামারোখ এসে বললো, আপনি আজ আমাকে খাওয়াবেন। আমি বিব্রতকর একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলাম। এই মহিলা দিনে দিনে আমার সমস্ত দীনতার কথা জেনে যাচ্ছে। আমি এই ভেবে শঙ্কিত হলাম যে, বজলুর মেসে যে খাবার খাই দেখলে ভদ্রমহিলা নিশ্চিতই তার নাক কুঁচকাবে। অথচ সে আজ নিজের থেকে কিছু খেতে চাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। এটাকে আমার সৌভাগ্য বলে ধরে নিলাম। আমি জামা-কাপড় পরতে আরম্ভ করলাম। ভদ্রমহিলা আমার দিকে বড়ো বড়ো চোখ মেলে মন্তব্য করে বললো, আপনি এরকম উদ্ভট জামা-কাপড় পরেন কেনো ? শুনে আমার ভীষণ রাগ হলো। কিন্তু সামলে নিলাম। বললাম, জামা-কাপড় আমি নিজে কিনি নে। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে যখন যেটা পাওয়া যায় পরে ফেলি। আমি আলনার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, এখানে যে শার্ট-প্যান্ট দেখছেন, তার কোনোটাই আমার কেনা নয়। সবগুলোই কারো না কারো কাছ থেকে পাওয়া। তাই আমার জামা-কাপড়ের কোনোটাই আমার গায়ের সঙ্গে খাপ খায় না। কোনোটা শরীরের মাপে ছোট, কোনোটা বড়। কিন্তু আমি দিব্যি পরে বেড়াচ্ছি। গায়ের মাপের চাইতে ছোটোবড় জামা-কাপড় পরা যেন মস্ত একটা মজার ব্যাপার, এরকম একটা ভঙ্গি করে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলাম।

মহিলা কোনো কথা বললো না। শুধু আমার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকালো একবার। আমি বললাম, চলুন। শামারোখ জানতে চাইলো, কোথায় ? আমি বললাম, বাইরে। সে বললো, বাইরে থেকেই তো এলাম। আবার বাইর যাবো কেনো ? আমি বললাম, আপনিতো খেতে চাইলেন। ওই কোনো রেস্টুরেন্টে চলুন। শামারোখ বললো, আপনার হোস্টেলে খাবার পাওয়া যায় না ? আমি বললাম, সে খাবার খেতে আপনার রুচি হবে না। শামারোখ বললো, আপনারা সবাই দু'বেলা ওই খাবার খেয়েই তো বেঁচে আছেন। আমি শামারোখের চোখে চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, আমাদের মেসের খাবার খেলে আমার প্রতি আপনার ঘৃণা জন্মাবে। সে কপট ক্রোধের ভান করে বললো, জাহিদ সাহেব, আপনি ইনকরিজিবল। চলুন, আপনাদের মেসে যাই।

আমি মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। এখন মেসের অধিকাংশ বোর্ডার খেতে বসেছে। এই সময়ে যদি তাকে নিয়ে যাই একটা দৃশ্যের অবতারণা করা হবে। আমাদের মেসে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের খেতে আপত্তি নেই। অনেক সময় স্বামী-স্ত্রী দু'জন রান্নার ঝামেলা এড়াবার জন্য দু'বেলাই মেসে এসে খাওয়া-দাওয়া করে। কেউ কেউ তাদের বান্ধবী এবং আত্মীয়দের নিয়েও মেসে খেয়ে থাকে। কিন্তু শামারোখের ব্যাপারে যে ভয়

আমি করছিলাম, তাকে যদি মেসে নিয়ে আসি, হঠাৎ কেউ কিছু বলে ফেলতে পারে। এমনিতেই শামারোখকে নিয়ে মানুষজন এতোসব আজেবাজে কথা বলে যে, শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। আজ শামারোখের উপস্থিতিতে কেউ যদি উল্টোসিধে কিছু বলে বসে, সে ঝগড়া করার জন্য মুখিয়ে উঠবে। মাঝখানে আমি বেচারি বিপদের মধ্যে পড়ে যাবো।

শামারোখকে বললাম, আপনি হাত-পা ধুতে থাকুন, আমি মেস থেকে খাবার নিয়ে আসি। সে বললো, আপনি না-হক কষ্ট করতে যাবেন কেনো ? চলুন মেসে গিয়েই খেয়ে আসি। অগত্যা তাকে নিয়ে আমাকে মেসে যেতে হলো। তখন বোর্ডাররা সবাই খেতে বসেছে। সবগুলো টেবিলই ভর্তি। তিন নম্বর টেবিলের কোণার দিকটা খালি। ওখানেই আমি শামারোখকে নিয়ে বসলাম। আমি তাকে মেসে নিয়ে যেতে পারি, এটা কেউ চিন্তাও করতে পারে নি। প্রায় সবগুলো দৃষ্টি শামারোখের দিকে তাকিয়ে আছে। সেটা তার দৃষ্টি এড়ায় নি। শামারোখ খেতে খেতে বললো, আচ্ছা, সবাই আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে কেনো, আমি কি চিড়িয়াখানা থেকে এসেছি ?

আমার বলতে ইচ্ছে হয়েছিলো, সুন্দর মহিলাদের দিকে সবাই তাকিয়ে থাকে, এটাতো খুব মামুলি ব্যাপার। কিন্তু চেপে গেলাম। আমার পাশে বসেছিলেন রিয়াজুল সাহেব। আচার-আচরণে তিনি পারফেক্ট জেন্টলম্যান। শামারোখকে উদ্দেশ করে বললেন, আপনাকে আগে কেউ দেখে নি, সে জন্যই তাকাচ্ছে। আপনি কিছু মনে করবেন না। শামারোখ রিয়াজুল হক সাহেবের সঙ্গেই আলাপ জুড়ে দিলেন। আপনি কি ভাই টিচার ? রিয়াজুল হক সাহেব জবাব দিলেন, তিনি ফিজিক্সের টিচার। কথাবার্তা আর বিশেষ এগুলো না। খাওয়ার পর যখন ঘরে এসেছি, শামারোখ বললো, আপনি এককাপ চা করে খাওয়ান। খাবারের গুণাগুণ নিয়ে কোনো কথা বললো না দেখে আমি মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। আমি চা বানিয়ে দিলে খেতে খেতে সে বললো, আজ বেশিক্ষণ বসবো না। আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। আমি বললাম, আপনি কি সরাসরি বাড়ি থেকে আসছেন ? শামারোখ বললো, নারে ভাই, অন্য জায়গা থেকে এসেছি। আমার নানা সমস্যা, যাকে বলে মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল—আমারও সে অবস্থা। আমি জানতে চাইলাম কি রকম সমস্যা। সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, বলবো একদিন। তারপর বললো, আমি মাঝে মাঝে রান্না করে আপনার জন্য খাবার নিয়ে আসবো। আমি কথাটা শুনলাম, শুনে ভালো লাগলো। কিন্তু হ্যাঁ বা না কিছু বলতে পারলাম না। একদিন সন্ধে বেলা আমার এক আত্মীয়কে ট্রেনে উঠিয়ে দিতে কমলাপুর যেতে হয়েছিলো। ট্রেন ছাড়তে অনেক দেরি করলো। ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেলো। আমি মেসে খাবার পাওয়া যাবে কিনা এ নিয়ে চিন্তিত ছিলাম। বাইরের কোনো হোটেল থেকে খেয়ে নেবো কিনা চিন্তা করেও কেনো জানি খেতে পারলাম না। হোস্টেলে যখন ফিরলাম, রাত দশটা বেজে গেছে। গেট পেরিয়ে ভেতরে পা দিতেই দারোয়ান আকর্ণ বিস্তৃত একখানা হাসি দিয়ে জানালো, ছাব আপনার কপাল বহুত ভালা আছে। সেই সোন্দর মেমছাব এই জিনিসগুলা আপনার লাইগ্যা রাইখ্যা গেছে। আমার ডিউটি শেষ, নয়টা বাজে। মগর

আপনার লাইগ্যা বইসা আছি। হাফিজ আমার হাতে একটা টিফিন ক্যারিয়ার এবং আক্কারা স্টোর্স লেখা একটা শপিং ব্যাগও গছিয়ে দিলো।

ঘরে এসে প্রথম শপিং ব্যাগটাই খুললাম। দেখি দুটো শার্ট এবং একটা পুরোহাতা সোয়েটার। আমার সেই গ্রামীণ রাগটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। আমার জামা-কাপড় মানানসই নয় বলেই ভদ্রমহিলা আমাকে দোকান থেকে শার্ট-সোয়েটার কিনে দিয়ে করুণা প্রদর্শন করেছে। ছুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু পারলাম না। সুন্দর জিনিশের আলাদা একটা মন হরণ করার ক্ষমতা আছে। পুরোহাতা শার্টটা নেড়েচেড়ে দেখে আমার মন ভীষণ খুশি হয়ে উঠলো। শার্টটা অপূর্ব! সিল্কের শাদা জমিনে লালের ছিটে। পরে দেখলাম আমার গায়ের সঙ্গে একেবারে মানিয়ে গেছে। সুতির হাফ শার্টটাও মনে ধরে গেলো। পুরোহাতা সোয়েটারটা আমাকে সবচাইতে মুগ্ধ করলো। নরোম মোলায়েম উলের তৈরি আকাশী রঙে ছোপানো। শামারোখের রুচি আছে বলতে হবে! সে অন্যের জন্যও পছন্দ করে জামা-কাপড় কিনতে জানে। হঠাৎ আমার মনে একটা শিহরণ খেলে গেলো। তাহলে শামারোখ কি আমাকে ভালোবাসে? আমার হৃৎপিণ্ডটা আশ্চর্য সাংঘাতিক ধ্বনিতে বেজে উঠতে থাকলো। শরীরের রক্ত সভায় একটা উল্লাসের সাড়া জেগেছে। আমি নিজেকে নিজের মধ্যে আর ধরে রাখতে পারছি নে। কী সুখ, কী আনন্দ! এই অসহ্য আনন্দের ভার কী করে বহন করি? কোনোরকমে জুতো জোড়া পা থেকে গলিয়ে বিছানার ওপর সটান শুয়ে পড়ি। আমি ঘুমে, না জাগরণে, সেই বোধ লুপ্ত হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ এভাবে শুয়ে থাকার পর টের পেলাম, এখনো রাতের খাওয়া শেষ করি নি। চার থাকঅলা শামারোখের টিফিন ক্যারিয়ার খুললাম। প্রথম থাকে দেখি কয়েক টুকরো কাটা শশা। একটা কাঁচামরিচ এবং একটা আস্ত পাতাসুদ্ধ পেঁয়াজ। একপাশে সামান্য পরিমাণ আমের ঝাল আচার। এগুলো মহামূল্য পদার্থ নয়। কিন্তু টিফিন ক্যারিয়ারে যেভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, সেই সুন্দর যত্নটাই আমাকে অভিভূত করে ফেললো। দ্বিতীয় থাকে সরু চালের ভাত এবং ওপরে দু'ফালি বেগুন ভাজা। তৃতীয় থাকে আট-দশটা ভাজা চাপিলা মাছ এবং চতুর্থ থাকে ঘন মুগের ডাল। সহসা আমার চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে আসতে চাইলো। আহা, কতোকাল ঘরের খাবার খাই নি!

প্রতিরাতে হোস্টেলে ফিরে দেখি, দরোজার সামনে বজলু টিফিন ক্যারিয়ার থুয়ে গেছে। ঢাকনা খুললেই দেখি বাটির মধ্যে একটা মুরগির ঠ্যাং চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে। ওই মুরগির ঠ্যাং দেখতে দেখতে, আর মুরগির ঠ্যাং খেতে খেতে স্বয়ং আল্লাহতায়ালার বিরুদ্ধে আমার মনে অনেক নালিশ জমা হয়ে গেছে। আল্লাহ খাওয়ার সময় নিছক আমার বিরক্তি উৎপাদন করার জন্য ওই দু'ঠেঙে পাখিটাকে সৃষ্টি করেছেন। শামারোখের রেখে যাওয়া ছিমছাম পরিপাটি খাবার খেতে খেতে যত্ন এবং মমতা দিয়ে ঢাকা একখানা ঘরের কথা মনে হতে লাগলো। আমার কি ঘর হবে? সে রাতে আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমি ঘুমুতে পারি নি। এক সময় ঘরে থাকা অসহ্য হয়ে দাঁড়ালো। দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম। দারোয়ানকে ঘুম থেকে জাগিয়ে গেট খোলালাম। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে টের পেলাম ভীষণ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। এই ঠাণ্ডার মধ্যেই একাকী লনে

পায়চারি করতে লাগলাম। রাতের পৃথিবী চুপচাপ। গাড়ি ঘোড়ার শব্দও কানে আসছে না। আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলাম লাখ কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের দেয়ালি চলছে। আমার হৃদয়ে যে হৃদস্পন্দন জাগছে তার সঙ্গে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের কাঁপা কাঁপা আলোর একটা সম্পর্ক আবিস্কার করলাম। এই তারা-ভরা আকাশের নিচে একা একা পায়চারি করতে করতে কেন জানি মনে হলো, গাছপালা, পশুপাখি, গ্রহ-নক্ষত্র কোনো কিছুর থেকে আমি আলাদা নই, বিচ্ছিন্ন নই। নিসর্গের মধ্যে সব সময় একটা পরিপূর্ণতা বিরাজ করছে। আমার নিজেকেও ওই চরাচর পরিব্যাপ্ত পূর্ণতার অংশ মনে হলো। আমি অনুভব করলাম, আমার ভেতরে শূন্যতা কিংবা অপূর্ণতার লেশমাত্রও নেই। এই পরিপূর্ণতার বোধটি আমার মনে মৌমাছির চাকের মতো জমেছে। শরীরে-মনে একটা আশ্চর্য শান্তির দোলা লাগছে। এক সময় অনুভব করলাম ঘুমে চোখ দুটো ভারি হয়ে আসছে।

সপ্তাহখানেক পরে হবে। এক সন্ধেবেলা শামারোখ এসে বললো, জামা-কাপড় পরে তৈরি হয়ে নিন। আপনাকে আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে। আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, শামারোখ খুব সূক্ষ্ম যত্নে সাজগোজ করে এসেছে। সূক্ষ্ম যত্ন শব্দ দুটো একারণে বললাম, সে যে সাজগোজ করেছে সেটা প্রথম দৃষ্টিতে ধরা পড়বে না। চুলগুলো পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে। একটা শাদা সিল্কের শাড়ি পরেছে এবং শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে পরেছে ব্লাউজ। তার পরনের স্যান্ডেলের স্ট্রাইপগুলো শাদা। হাতের ব্যাগটিও শাদা রঙের। ওই শুভ্রতাময়ীর দিকে আমি অপলক চোখে তাকিয়ে রইলাম। তার শরীর থেকে একটা মৃদু মন্থর ঘ্রাণ বেরিয়ে এসে ঘরের বাতাস পর্যন্ত সুবাসিত করে তুলছে। শামারোখকে এতো সুন্দর দেখাচ্ছে যে, আমি চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছিলাম না। শামারোখ বললো, অমন হাঁ করে কি দেখছেন? বললাম না, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে। আমি লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম। তারপর আবার সেই পুরনো জামা-কাপড়গুলো আবার পরতে আরম্ভ করলে সে বললো, ওগুলো আবার পরছেন কেনো? আপনার জন্য সেদিন শার্ট-সোয়েটার রেখে গেলাম না, সেগুলো কোথায়? আমি পলিথিনের ব্যাগটা শামারোখের হাতে দিয়ে বললাম, এর মধ্যে সব আছে। শামারোখ ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, এগুলো রেখে গিয়েছি পরার জন্য, ব্যাগের মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্য নয়। আমার কেমন বাধো বাধো ঠেকছিলো। শামারোখের দেয়া কাপড়-চোপড় পরে পুরোদস্তুর ভদ্রলোক সেজে তার সঙ্গে বাইরে যাওয়ার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম লজ্জার ব্যাপার আছে। সেটা আমি তাড়াতে পারছিলাম না। শামারোখের শার্ট পরবো-কি-পরবো না, এই ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। শামারোখ হঠাৎ দাঁড়িয়ে আমার শরীর থেকে এক ঝটকায় পুরনো জামাটা খুলে ফেললো। আমি বাধা দিতে পারলাম না। তারপর সে সিল্কের পুরোহাতা শার্টটার বোতাম খুলে আমার সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, শিগ্‌গির এটা পরে ফেলুন। বিনাবাক্যে শার্টটা পরে নিলাম। শামারোখ বোতামগুলো লাগিয়ে দিলো। এ সময় তার খোলা চুলগুলো এলোমেলো উড়ে আমার গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিলো। আমি তার স্পর্শ পাচ্ছিলাম। আমার ইচ্ছে করছিলো, তার সুন্দর চিবুকখানা স্পর্শ করি, মুখমণ্ডলে একটা চুমু দিয়ে বসি। শামারোখ সোয়েটারটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললো,

এটাও পরুন। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা। অগত্যা আমাকে পরতে হলো। সে আমার সামনে ঝুঁকে পড়া চুলের গোছাটি পেছনে সরিয়ে দিতে দিতে বললো, আপনি কি পরিমাণ হ্যান্ডসাম, আয়নার সামনে গিয়ে দেখে আসুন। অথচ চেহারাখানা সবসময় এমন করে রাখেন, মনে হয়, সাতজন-পাঁচজনে ধরে কিলিয়েছে।

আমরা দু'জন বাইরে এসে একটা রিকশা নিলাম। আমি জিগ্যেস করলাম, আমরা কোথায় যাচ্ছি? শামারোখ বললো, কলাবাগানের একটা বাড়িতে। ভিসিআর-এ আপনাকে একটা ছবি দেখাবো। এ ধরনের ছবি ঢাকায় দেখানো হয় না। ফরাসি বিপ্লবের নায়ক দাঁতোর ওপর ছবি। আমার এক বন্ধু বিদেশ থেকে ক্যাসেট নিয়ে এসেছে।

আমাদের কলাবাগান পৌঁছুতে বেশি সময় লাগলো না। রিকশা ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে যখন বাড়ির ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করলাম, দেখি, একপাশে বসে চারজন ব্রিজ খেলছে। টেবিলে বিয়ারের গ্লাস। এই চারজনের একজন সোলেমান চৌধুরী। আমাকে দেখামাত্রই তাঁর মুখটা কঠিন হয়ে উঠলো। শামারোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার দেরি করার কারণটা বোঝা গেলো। শামারোখ জবাব দিলো না। নাদুসনুদুস চেহারার ফ্রেঞ্চকাট দাড়িঅলা টাকমাথার ভদ্রলোকটি বিয়ার পান করতে করতে জিগ্যেস করলেন, উনি কে? শামারোখ বললো, উনি আমার বন্ধু এবং একজন ভালো লেখক। সোলেমান চৌধুরী শ্লেষাত্মক স্বরে বললেন, আসল কথাটি এড়িয়ে যাচ্ছো। বলো না কেন তোমার কবিতা লেখার পার্টনার।

আজ প্রথম নয়, শামারোখ বারবার আমাকে এমন সব পরিবেশ নিয়ে আসে, আমি কিছুতেই তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারি নে। আমার ইচ্ছে করছিলো, পালিয়ে চলে আসি। সেটা আরো খারাপ দেখাবে বলে চলে আসতে পারছিলাম না। এই ভদ্রলোকেরা বাংলাভাষাতেই কথাবার্তা বলছিলেন, কিন্তু আমার মনে হলো, সে ভাষা আমি বুঝি নে। সোফার কোণার দিকে লম্বাপানা ভদ্রলোকটি আমার গায়ের জামার দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন, শামারোখ, এখন বুঝতে পারলাম বায়তুল মোকাররমে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কেনো আমাকে দিয়ে শার্ট এবং সোয়েটার কিনিয়েছিলে। কবি সাহেবকে জামা-কাপড় গিফ্‌ট করার জন্যই আমার কাছ থেকে টাকা ধার করেছিলে। ভদ্রলোক কাটাকাটা কথায় বললেন, শার্ট এবং সোয়েটার দুটো কবি সাহেবের গায়ে মানিয়েছে চমৎকার। কবি সাহেব ভাগ্যবান। আজ থেকে আমরাও সবাই কবিতা লিখতে লেগে যাবো। ভদ্রলোক কেমন করে হাসলেন।

ভদ্রলোকের কথাগুলো শুনে আমার সারা গায়ে যেন আগুন লেগে গেলো। শামারোখ এই মানুষটার কাছ থেকে টাকা ধার করে আমার জন্য শার্ট এবং সোয়েটার কিনেছে। তারপর সেগুলো দেখাবার উদ্দেশ্যে সেই ভদ্রলোকের কাছেই আমাকে ধরে এনে হাজির করেছে। জামা-কাপড়গুলো শরীর থেকে খুলে ফেলে শামারোখের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছে করছিলো। কিন্তু তার তো আর উপায় নেই। সুতরাং বসে বসে অপমানটা হজম করছিলাম।

নাদুসনুদুস টাক মাথার ভদ্রলোক এবার সিগারেট টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে বলতে বললেন, শামারোখ হোয়াই ডু য়্যু ইনডালজ ইন পোয়েমস? য়্যু আর মোর দ্যান এ

পোয়েট্রি। তুমি কেনো কবিতা লেখার মতো অকাজে সময় নষ্ট করবে। তোমাকে নিয়েই মানুষ কবিতা লিখবে। এ্যান্ড মাইন্ড ইট, একবার যদি লাই দাও দলে দলে কবিরা এসে মাছির মতো তোমার চারপাশে ভ্যান ভ্যান করবে। ঢাকা শহরে কবির সংখ্যা কাকের সংখ্যার চাইতে কম নয়। শামারোখ চটে গিয়ে বললো, আবেদ য়্যু আর এ ফিলথি ন্যুইসেন্স। তুমি একটা হামবাগ এবং ফিলিস্টিন। মানুষের প্রতি মিনিমাম রেসপেক্টও তোমার নেই। আবেদ নামের ভদ্রলোকটি হাসতে হাসতে বললেন, মানুষের প্রতি সব রেসপেক্ট তো তুমিই দেখিয়ে যাচ্ছো। অন্যদের আর রেসপেক্ট করার অবকাশ কোথায়? পথেঘাটে যাকে যেখানেই পাচ্ছো ধরে ধরে স্ট্রিট আর্চিনদের হাজির করছো। তোমার টেস্টের তারিফ না করে পারি নে। শামারোখ বললো, তুমি একটা আস্ত ব্রুট। তারপর একটা বিয়ারের খালি টিন তুলে নিয়ে ভদ্রলোকের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলো এবং আমার হাত ধরে টানতে টানতে আমাকে ঘরের বাইরে নিয়ে এলো। গোটা ব্যাপারটা আমার চোখের সামনে ছায়াবাজির মতো ঘটে গেলো। গেটের কাছে যখন এসেছি, শামারোখ বললো, জাহিদ আপনি আস্ত একটা কাওয়ার্ড। এই আবেদ হারামজাদা আমাকে এবং আপনাকে এতো অপমানজনক কথা বললো, আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবকিছু হজম করলেন? আপনি তার মুখে একটা ঘুষি পর্যন্ত বসিয়ে দিতে পারলেন না? আমি শামারোখের কথার কি উত্তর দেবো ভেবে ঠিক করতে না পেরে তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

১৮

শামারোখ আমার মনে একটা ঝঙ্কার সৃষ্টি করে দিয়েছে। তাকে আমি মনের ভেতর থেকে তাড়াতে পারছি নে। শামারোখ শুধু সুন্দরী নয়, তার মনে দয়ামায়াও আছে। আমার প্রতি এই সময়ের মধ্যে তার একটা অনুরাগ জন্মানোও বিচিত্র নয়। শামারোখ যখন হাসে, শাদা বেজির দাঁতের মতো তার ছোট ছোট দাঁতগুলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে। সে যখন ফুঁসে ওঠে, তার মধ্যে একটা সুন্দর অগ্নিশিখা জ্বলে উঠতে দেখি। সে যখন গান করে অথবা কবিতা পাঠ করে, পৃথিবীর সমস্ত কষ্ট, সমস্ত যন্ত্রণা আমি মূর্ত হয়ে উঠতে দেখি। বড়ো বড়ো দুটি চোখ মেলে যখন দৃষ্টিপাত করে, তার অসহায়তার ভাবটি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, তখন তাকে অনেক বেশি সুন্দরী দেখায়।

শামারোখ আমার খাওয়া-দাওয়ার প্রতিও দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করেছে। আমার দারিদ্র্য, আমার অক্ষমতা, আমার অস্তিত্বের দীনতা সবকিছু এমনভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে, তার কাছে আমি কোনো রকমের দ্বিধা এবং সঙ্কোচ ছাড়াই নিজেকে মেলে ধরতে পারি।

আমার অনেক কিছু নেই, আমি জানি। কিন্তু শামারোখের সঙ্গে যখন আলাপ করি, আমার নিজেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ মানুষ মনে হয়। মনে হয়, আমার মধ্যে কোনো অক্ষমতা, কোনো অপূর্ণতা নেই। তাছাড়া আরো একটা ব্যাপার আছে। এই মাস তিন-চার শামারোখের সঙ্গে চলাফেরা করতে গিয়ে আমার ভেতরে একটা রূপান্তর ঘটে গেছে।

সেটা আমি এখন অনুভব করি। আমি ছিলাম নিতান্ত তুচ্ছ একজন আদনা মানুষ। এই রকম একজন সুন্দর মহিলা, সমাজে যার সম্পর্কে সত্য-মিথ্যে বিচিত্র ধরনের কাহিনী চালু আছে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার কারণে আমি চারপাশের সবার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছি। আমি টের পেতে আরম্ভ করেছি, মানুষের কাছে আমি একরকম ঈর্ষার পাত্র বনে গেছি। যদিও আমি বুঝতে পারি, তার মধ্যে কিছু পরিমাণে হলেও করুণা মিশে রয়েছে। যে মহিলা অঙ্গুলি হেলনে ঢাকা শহরের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিটিকে পেছনে ছুটিয়ে নিতে পারে, ক্ষমতাবান মানুষটিকে পাগল করে তুলতে পারে, আমার মতো তুচ্ছ একজন মানুষকে নিয়ে প্রায় প্রতিদিন এই যে ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছে, এটা তার একটা খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। এ-কথা আমার হিতৈষী বন্ধু-বান্ধবেরা আমাকে বারবার বলেছে, আমি এক ঘড়েল মহিলার পাল্লায় পড়েছি এবং মহিলা আমাকে লেজে খেলাচ্ছে। এক সময় আমাকে এমন উলঙ্গ করে ছেড়ে দেবে যে, তখন মানুষের কাছে আমার মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। এগুলো আমি অস্বীকার করি নে। এ পর্যন্ত শামারোখ সম্বন্ধে যেটুকু ধারণা আমার হয়েছে, তাতে করে আমি ভালোভাবে বুঝে গেছি, সে যে-কোনো সময় যে-কোনো কিছু করে ফেলতে পারে। এ রকম একটি মাদকতাময়ী সুন্দরীর সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো কি জিনিশ, তার শরীরের স্পর্শ, তার কণ্ঠস্বরের উত্তাপ, চুলের সুঘ্রাণ—এগুলোর সম্মিলিত নেশা রক্তে কেমন আগুন ধরিয়ে দিতে পারে, সেই অপূর্ব অভিজ্ঞতা বন্ধুদের কোনোদিন হয় নি। তাই তারা এমন অভাবনীয় ভয়াবহ পরিণতির কথাটা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। অনেক সময় মানুষ সত্য প্রকাশের ছলে, নিজের মনের প্রচ্ছন্ন ঈর্ষাটাই প্রকাশ করে থাকে।

যে যাই বলুক, আমার অবস্থা এমন, শামারোখ যদি আমাকে বলতো, জাহিদ, তোমাকে আমার সঙ্গে দুনিয়ার অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে যেতে হবে, পাঁচতলা দালান থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ দিতে হবে, কিছুই করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিলো না। কিন্তু ছোট্টো একটা কিন্তু সব কিছুতে বাদ সেধেছে। সেটা একটু খুলে বলি। এ পর্যন্ত শামারোখ আমাকে যে সমস্ত জায়গায় নিয়ে গিয়েছে সব জায়গাতেই আমি ভয়ঙ্করভাবে আহত বোধ করেছি। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, গ্রিন রোড, কলাবাগান—এই তিনটি জায়গায় নিয়ে গেছে। ওসব জায়গায় যে সমস্ত মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, আলাদা আলাদাভাবে তাদের চেহারাগুলো চিন্তা করলেও আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসতে চায়। এইসব মানুষের সঙ্গে শামারোখের কি সম্পর্ক তাই নিয়ে আমাকে অনেক বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়েছে। শামারোখের মনে কি আছে, তার অভিপ্রায় কি—একথা বার বার চিন্তা করেও আমি নিজের মধ্যে কোনো সদুত্তর পাই নি। আমি সবচেয়ে ব্যথিত বোধ করেছিলাম, যেদিন তার উপহার দেয়া জামা কাপড় পরিয়ে শামারোখ আমাকে কলাবাগানে

তার বন্ধুদের আড্ডায় সিনেমা দেখাবে বলে নিয়ে গিয়েছিলো। সেখানে গিয়ে আমাকে জানতে হলো এই লোকদের একজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে শামারোখ আমার জন্য শার্ট এবং সোয়েটার কিনেছে। সেদিন রাস্তার মাঝখানে ধরে তাকে পেটাতে ইচ্ছে করেছিলো। হয়তো আক্ষরিক অর্থে পেটাতে না পারলেও কিছু কড়া কথা অবশ্য বলতাম এবং সম্ভব হলে শরীর থেকে সব জামা-কাপড় খুলে তার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিতাম। আবেদের মুখের ওপর বিয়ারের টিন ছুঁড়ে মারার দৃশ্যটাই আমাকে একটা দোদুল্যমান অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো। তারপর তো শামারোখ আমাকেই আসামি ধরে নিয়ে মস্ত বড়ো একখানা নালিশ ফেঁদে বসলো। সে যখন বিয়ারের টিন ছুড়ে মারলো, আমি আবেদের মুখের ওপর ঘুষি বসিয়ে দিলাম না কেনো। এই মহিলাকে আমি কোনো হিসেবের মধ্যে ফেলতে পারছি নে। মহিলা কি পাগল, নাকি অন্য কিছু?

শামারোখদের শান্তিনগরের বাড়িতে গিয়ে আমাকে দেখতে হয়েছে বড়ো ভায়ের বউ তার বাহুতে কামড় দিয়ে মাংস তুলে নিয়েছে। সেও নিশ্চয়ই বড় ভাইয়ের বউকে অক্ষত রাখে নি। এইরকম অব্যবস্থিত চিত্তের মহিলাকে নিয়ে আমি কি করবো ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। তাকে গ্রহণ করা অসম্ভব, আবার তাকে ছেড়ে দেয়া আরো অসম্ভব। গভীর রাতে আমি যখন নিজের মুখোমুখি হই, শামারোখের সমস্ত অবয়বটা আমার মানস দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অন্তরের সমস্ত আবেগ দিয়ে ওই মহিলাকে জড়িয়ে ধরার আকাঙ্ক্ষা আমার মনে ঘনীভূত হয়ে ওঠে। মনে হয়, তার জন্য প্রাণ-মন সবকিছু পণ করতে পারি। কিন্তু যখন তার অন্য কাণ্ডকীর্তির কথা স্মরণে আসে, মহিলার প্রতি আমার একটা অনীহাবোধ তীব্র হয়ে জেগে ওঠে। মনের একাংশ অসাড় হয়ে যায়। আমি নিজেকেই প্রশ্ন করি, এই আধ পাগলা বিক্ষিপ্ত মানসিকতার মহিলাটির সঙ্গে আমি লেগে রয়েছি কেনো? প্রতি রাতেই পণ করি, এরপর যদি শামারোখ আসে, তার চোখে চোখে তাকিয়ে বলে দেবো, তার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে আমার সব কিছু লাটে উঠতে বসেছে। অকারণে মানুষ আমার শত্রুতে পরিণত হচ্ছে। এরপর তার সঙ্গে আর মেলামেশা সম্ভব নয়।

কিন্তু পরদিন যখন শামারোখ আসে, তার চুলের রাশিতে কাঁপন ধরিয়ে আমার দিকে যখন বড়ো বড়ো চোখ দুটো মেলে তাকায়, আমার সমস্ত সংকল্প পরাজিত হয়, আমি সবকিছু ভুলে যেতে বাধ্য হই। মহিলা আমার ইচ্ছেশক্তি হরণ করে ফেলে। তারপর আমাকে দিয়ে যা ইচ্ছে করিয়ে নেয়। শামারোখকে নিয়ে এমন সংকটে পড়ে গেছি যে, সে কথা কাউকে বুঝিয়ে বলারও উপায় নেই। দুঃসহ যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে দিন-রাত্রি অতিবাহিত করছি আমি। এই ডাকিনী মহিলা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?

এরই মধ্যে একদিন দুপুরবেলা শামারোখ আমার ঘরে এলো। তার আলুথালু চেহারা। চোখের কোণে কালি। পরনের শাড়ির অবস্থাও করুণ। মনে হলো সে কয়েকদিন স্নান করে নি এবং ঘুমোয় নি। এই রকম বেশে শামারোখকে আমি কোনোদিন দেখি নি। নিশ্চয়ই কোনো একটা অঘটন ঘটে গেছে। তার দিকে তাকিয়ে আমার বুকটা হু হু করে উঠলো। শামারোখ তার কাঁধের থলেটা টেবিলের ওপর রেখে খাটে বসলো।

তার বসার ভঙ্গি দেখে আমি অনুমান করলাম শরীরের ওপর শামারোখের পুরো নিয়ন্ত্রণ নেই। এই অবস্থায় কি জিগ্যেস করবো, আমি ভেবে স্থির করতে পরলাম না। আমি কিছু বলার আগে অত্যন্ত ক্লান্ত স্বরে শামারোখ বললো, জাহিদ ভাই, এক গ্লাস পানি দেবেন? আমি পানি গড়িয়ে তার হাতে দিয়ে বললাম, আপনার কি হয়েছে, মনে হচ্ছে আপনার গোসল এবং খাওয়া কোনোটাই হয় নি। শামারোখ সমস্ত পানিটা গলার মধ্যে ঢেলে দিয়ে বললো, দু'দিন ধরে আমি খেতে এবং ঘুমোতে পারছি নে। আমি বললাম, এক কাজ করুন, বাথরুমে গিয়ে আপনি হাত-মুখ ধুয়ে আসুন, আমি ডাইনিং হল থেকে খাবার নিয়ে আসি। শামারোখ বললো, খাবার আমার গলা দিয়ে নামছে না, আপনার কষ্ট করে লাভ নেই। আমি আপনার বিছানায় শুয়ে পড়লে আপনি কি রাগ করবেন? আমি একটুখানি আতঙ্কিত বোধ করলাম। শামারোখকে আমার বিছানায় শোয়া দেখলে অন্য বোর্ডাররা কি মনে করবে! হয়তো সবাই মিলে আমাকে এমন একটা অবস্থার মধ্যে ফেলে দেবে সিট রক্ষা করাটাও দায় হয়ে পড়বে। আমার আশঙ্কার কথাটা আমি শামারোখকে বুঝতে দিলাম না। আজকে ভাগ্য ভালো, হোস্টেলের বেশিরভাগ বোর্ডার টিভি রুমে ইংল্যান্ড এবং পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলা দেখতে গেছে। শামারোখকে বললাম, ঠিক আছে, আপনি শোবেন, তার আগে একটু চেয়ারটায় এসে বসুন, আমি নতুন চাদরটা পেতে দিই। শামারোখ মাথা নেড়ে জানালো, না, তার দরকার হবে না। বলেই সে সটান বিছানার ওপর শরীরটা ছুঁড়ে দিলো। শামারোখ বললো, দরোজাটা বন্ধ করে দিন। শামারোখ না বললেও আমাকে বন্ধ করতে হতো।

সামনের দরজা বন্ধ করে আমি পিছনের দরজাটা খুলে দিলাম। ঠিক এই সময় আমার কি করা উচিত স্থির করতে না পেরে সিগারেট জ্বালালাম। একটা কি দুটো টান দিয়েছি, এরই মধ্যে দেখি শামারোখ ফুলে ফুলে কেঁদে উঠছে। কান্নার তোড়ে তার শরীরটা বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে। এ অবস্থায় সিগারেট টানা যায় না। আমি সিগারেটটা ছুঁড়ে দিলাম। চেয়ারটা বিছানার কাছে নিয়ে মৃদু স্বরে জিগ্যেস করলাম, কি হয়েছে শামারোখ, কাঁদছেন কেনো? কান্নার বেগ একটু কমে এলে সে বললো, জাহিদ ভাই আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। তারপরে আবার কাঁদতে আরম্ভ করলো। আমি কিছুক্ষণ তার বিছানার পাশে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। একজন মহিলা আমারই পাশে বিছানায় কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে, অথচ আমি করার মতো কিছুই খুঁজে পাচ্ছি নে। এক সময়ে বাথরুমে গিয়ে তোয়ালে এনে তার মুখ মুছিয়ে দিলাম। এই কাজটা করতে গিয়ে আমার হাত কেঁপে গেলো, শরীর কেঁপে গেলো, কথা বলতে গিয়ে দেখি আমার কণ্ঠস্বরও কাঁপলো। আগে শামারোখের শরীরের কোনো অংশ আমি এমনভাবে স্পর্শ করি নি। আমি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে জিগ্যেস করলাম, শামারোখ, বলুন, আপনি কাঁদছেন কেনো? আমি চুলে হাত বুলিয়ে দিলাম। এলোমেলো হয়ে যাওয়া শাড়িটা এখানে-ওখানে টেনেটুনে ঠিক করে দিলাম।

শামারোখ আমাকে বললো, জাহিদ ভাই, আপনার চেয়ারটা টেনে একটু কাছে এসে বসুন। আমি চেয়ারটা খাটের একেবারে কাছে নিয়ে গিয়ে তার হাতটা তুলে নিলাম, কোমল স্বরে বললাম, বলুন শামারোখ আপনার কি হয়েছে? সে বললো, জাহিদ ভাই,

আমার সর্বনাশ হয়েছে। আমি মরে গেলেই সবচাইতে ভালো হতো। তারপর আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। আমার ইচ্ছে হয়েছিলো, তার মুখে চুমো দিয়ে বসি। কিন্তু পারলাম না। হয়তো আমার সাহস নেই। অথবা বিপদে-পড়া মহিলার ওপর কোনো সুযোগ গ্রহণ করতে আমার মন সায় দেয় নি। শামারোখের হাতটা ধরে আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। আর শামারোখ অবিরাম কেঁদে যাচ্ছে। আমি যদি চিত্রকর হতাম এই রোরুদ্যমান রমণীর একটা ছবি আঁকতাম। ক্রন্দনরত অবস্থায় শামারোখের শরীর থেকে এক বিশেষ ধরনের সৌন্দর্য ফুটে বেরিয়ে আসছিলো। তার শরীরে বয়সের ছাপ পড়েছে। তার স্তন জোড়া ঈষৎ হেলে পড়েছে। চুলের মধ্যে অনেকগুলো রুপোলি রেখা দেখতে পাচ্ছি। তারপরও শামারোখ এখনো কী অপরূপ সুন্দরী। দুধে-আলতায় মেশালে যে রকম হয়, তার গায়ের রঙ অবিকল সেরকম। উরু দুটো সুডৌল। পা দুটো একেবারে ছোটো। গোড়ালির ফর্সা অংশটাতে জানলার ফুটো দিয়ে একটা তেরছা আলোর রেখা এসে পড়েছে। বার বার তাকিয়েও আমি চোখ ফেরাতে পারছি নে। বাম হাতটা বাঁকা হয়ে বিছানায় এলিয়ে রেখেছে। কান্নার তোড়ে তোড়ে ঈষৎ হেলে-পড়া স্তন দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে। মনে মনে আমি আল্লাহকে ধন্যবাদ দিলাম। অর্ধ আবৃত এমন সুন্দরী একটা নারীর শরীর এতো কাছ থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি। বালিশের দু পাশে তার চুলগুলো ছড়িয়ে

রয়েছে। সমুদ্রের অতল থেকে দেবী ভেনাসের আবির্ভাবের যে ছবি শিল্পী এঁকেছেন, শামারোখকে কিছুটা সেরকম দেখাচ্ছে। তার নাক-মুখ-চিবুক সবকিছু যেন দেবী ভেনাসের শরীরের অংশ। আমি এই রকম শরীরের কোনো নারী জীবনে দেখি নি। শামারোখ যদি সুস্থ শরীরে সচেতনভাবে নারীর সমস্ত স্বাভাবিক লজ্জা নিয়ে শুয়ে থাকতো, তার এরকম অপরূপ সৌন্দর্য প্রকাশমান হয়ে উঠতো না। সে কেঁদে যাচ্ছে, কান্নার তোড়ে তোড়ে শরীর থেকে এক রকম করুণ দুঃখ জাগানিয়া সৌন্দর্য ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। তার ডান হাতটা হাতে নিয়ে আমি অনেকক্ষণ অভিভূতের মতো বসে রইলাম।

অবশেষে একসময় তার কান্না বন্ধ হলো। সে উঠে বসলো। আমাকে বললো, আরো এক গ্লাস পানি দিন। আমি গ্লাসটা হাতে দিলে আস্তে আস্তে পানিটা খেয়ে নিলো। তারপর তোয়ালেটা নিয়ে বাথরুমে গেলো। অনেকক্ষণ সে বাথরুমে কাটালো। যখন বেরিয়ে এলো তাকে অনেকখানি সুস্থির দেখাচ্ছিলো। ভালো করে হাত-মুখ ধুয়েছে। মাথায়ও পানি দিয়েছে। চুলের উস্কুখুস্কু ভাবটি এখন নেই। আমাকে বললো, আপনার তোয়ালেটা মোটা। এ-দিয়ে চুলের পানি বের করা যায় না। গামছা থাকলে দিন। ভাগ্যিস আমার একটা গামছা ছিলো। সেটা তাকে দিলাম। চুলের সঙ্গে গামছাটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পাক দিয়ে দিয়ে সমস্ত পানি বের করে আনলো। তারপর আমার ক্রিমের কৌটো নিয়ে আঙুলে একটুখানি ক্রিম বের করে আলতো করে মুখে লাগালো। এই সবকিছু করার পর সে আবার গিয়ে চেয়ারের ওপর বসলো। এসব কিছুই যেন সে ঘোরের মধ্যে করে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। এই পীড়াদায়ক নীরবতা আমার স্নায়ু-শিরায় চাপ প্রয়োগ করছিলো। আর চুপ করে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো।

একটু আগে তার হাতখানা হাতে নিয়ে আদর করেছি। দু'হাতে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছি। এই গম্ভীর রূপ দেখে আমি তার শরীর স্পর্শ করার সাহসও হারিয়ে

ফেললাম। নরম জবানেই বললাম, আপনার দুঃখের কথাটা জানাতে যদি আপত্তি না থাকে আমাকে বলতে পারেন। আমি তো আপনার বন্ধু। আমাকে দিয়ে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। পারলে আপনার উপকারই করবো। আমার কথা শুনে শামারোখের চোখ জোড়া ঝিকিয়ে উঠলো। আপাদমস্তক আমার শরীরে তার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো। তারপর সহসা দাঁড়িয়ে গেলো, আবার সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লো। আঙুলে চুলের একটা গোছা জড়াতে জড়াতে বললো, আপনি আমার উপকার করতে চান? তার কণ্ঠস্বরটা একটু অস্বাভাবিক শোনালো। আমি দৃঢ়স্বরে বললাম, যদি আমার সাধ্যের মধ্যে থাকে, অবশ্যই আপনার উপকার করবো। শামারোখ অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বললো, ঠিক বলছেন, আপনি আমার উপকার করবেন? আমি বললাম, অবশ্যই। শামারোখ বললো, তা'হলে আপনি আমাকে বিয়ে করুন। একী বলছে শামারোখ, তার কাছ থেকে একী শুনলাম! ঘরের মধ্যে বাজ পড়লেও আমি এতোটা আশ্চার্যান্বিত হতাম না।

তার প্রস্তাবটা শুনে আমি কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না। আমি স্বপ্নেও ভাবি নি মহিলার মুখ দিয়ে এরকম একটা কথা বেরিয়ে আসবে। আমি যদি উল্লসিত হয়ে উঠতে পারতাম, সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ বলতে পারতাম, সেটাই সবচেয়ে ভালো হতো। কিন্তু বিয়ে করতে রাজি হওয়ার কথায়, একরাশ দ্বিধা আমাকে জড়িয়ে ধরলো। শামারোখের মনে আঘাত দেয়ারও ইচ্ছে আমার ছিলো না, বিশেষ করে ওই অবস্থায়। আমি বললাম, শামারোখ, আপনি যে কোনো পুরুষ মানুষকে বিয়ে করতে বললে নিজেকে তার ভাগ্যবান মনে করার কথা। আমার মতো একজন নগণ্য মানুষের কাছে কথাটা বলেছেন, সেজন্য আমি নিজেকে খুবই ধন্য মনে করছি। আপনার মুখে এই অপূর্ব কথা শুনলাম, আমার কাছে স্বপ্ন মনে হচ্ছে। আপনার আর আমার মধ্যে যদি কিছু নাও ঘটে শুধু ওই কথাটি আমার সারাজীবনের স্মৃতি হয়ে থাকবে। আমাকে খুব কাছের এবং নির্ভরযোগ্য মানুষ মনে করেন বলেই এমন কথাটি বলতে পারলেন। কিন্তু তার আগে আমি যদি বর্তমান দুঃখের কারণটা জানতে চাই, আপনাকে কি খুব আহত করবো? শামারোখ ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললো, আপনাকে জানাতে আমার আপত্তি নেই।

তার কাহিনীটা সংক্ষেপে এইরকম : সোলেমান চৌধুরীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিলো বিলেতে। তারা পরস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো। দু'বছর এক ছাদের তলায় থেকেছেও। কথা ছিলো দেশে এসে দু'জন বিয়ে করবে। আমার এখানে আসা নিয়ে সোলেমানের সঙ্গে তার কিছুদিন খুব খিটিমিটি চলছিলো। আসলে এটা একটা উপলক্ষ মাত্র। সোলেমান আরেকটা কম বয়সের মেয়ের সঙ্গে তলায় তলায় সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলো। শামারোখের বাড়ি যাওয়া-আসা করতো। তাদের বাড়িতেই এই তরুণীর সঙ্গে সোলেমান চৌধুরীর পরিচয়। আমার সঙ্গে শামারোখের একটা বিশ্রী সম্পর্ক তৈরি হয়েছে এই অজুহাত তুলে আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্রটিকে বিয়ে করে ফেলেছে সোলেমান। আমাকে শামারোখ গ্রিন রোডের যে বাসায় নিয়ে গিয়েছিলো, তার মালিক সোলেমান চৌধুরীর খালাতো ভাই। একজন বয়স্ক ঠিকাদার এবং বিবাহিত। এখন সেই আদিলই

দাবি করছে, তুমি আমাকে বিয়ে করো, আমি আগের বউকে তালাক দেবো। শামারোখ যদি তাকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে রাজি না হয়, রাস্তাঘাট যেখানে থেকে পারে ধরে নিয়ে যাবে বলে হুমকি দিয়েছে। বাড়িতে শামারোখের বুড়ো বাবা এবং ছোট বোনটি ছাড়া কেউ নেই। কাহিনী শেষ করে সে বললো, আমি আবার একটু ঘুমোবো। সে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

শামারোখ সেদিন সন্ধেঅবধি আমার ঘরে ঘুমিয়েছিলো। আমার অন্য এক জায়গায় যাওয়ার তাড়া ছিলো। কিন্তু শামারোখের জন্য ঘর থেকে বের হওয়া আমার সম্ভব হয় নি। তাকে একা ঘুমন্ত অবস্থায় ফেলে আমি বাইরে যাই কী করে! সারাক্ষণ দরজা বন্ধ করে আমাকে ঘরের মধ্যে বসে থাকতে হলো। আমি ভয় পাচ্ছিলাম, কেউ যদি এসে পড়ে! ব্যাপারটা পাঁচ কান হয়ে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে আমাকে ভীষণ বেকায়দার মধ্যে পড়ে যেতে হবে। আমাকে অপছন্দ করার মানুষের অভাব নেই। তাদের কেউ যদি এই অবস্থায় শামারোখকে দেখে ফেলে, হোস্টেলে আমার সিটটা রক্ষা করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

সাতটা বেজে গেলো, এখনো শামারোখের ঘুম ভাঙছে না। খুন করা লাশের পাশে খুনিকে পাহারা দিয়ে জেগে থাকতে হলে যে অবস্থা দাঁড়ায়, আমার দশাও এখন অনেকটা সেইরকম।

অবশেষে শামারোখের ঘুম ভাঙলো। ঘুম ভাঙলো বুঝতে পারলাম, তার চোখ দুটো মেলেছে। শামারোখ অনেকক্ষণ ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। কোনো কথা বলছে না। আমি মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। তার যা মনের অবস্থা, কোনো ধরনের অসুখ বিসুখ যদি ঘটে যায়, আমি কি করবো! আমাদের এই পুরুষদের হোস্টেলে ভদ্রমহিলাদের থাকার নিয়ম নেই। যদি সত্যি সত্যি শামারোখ অসুস্থ হয়ে পড়ে, আমি কি করে তাকে চলে যেতে বলবো! নানারকম চিন্তা আমার মনে আনাগোনা করছিলো। মানুষতো খারাপটাই চিন্তা করে আগে। এক সময় শামারোখ কথা বললো, তার গলার স্বরটা অত্যন্ত ক্ষীণ এবং ফ্যাঁসফেঁসে শোনালো। মনে হলো, সে যেন স্বপ্নের মধ্যেই কথা বলছে, হাফিজ ভাই, আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে। আমি বললাম, পানি খাবেন? সে বললো, আপনার যদি কষ্ট না হয়, আমাকে এক কাপ চা করে খাওয়ান। আমি চায়ের কেতলি হিটারে বসিয়ে বললাম, আপনি মুখ-হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নিন। আমার কথায় সে উঠে বসলো এবং বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে এলো। আমি চায়ের পেয়ালাটা তার হাতে তুলে দিলাম। প্রথম চুমুক দিয়েই সে বললো, জাহিদ ভাই, আজ রাতটা আপনার ঘরেই কাটিয়ে দেবো। তাঁর কথা শুনে আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। তাঁকে ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি হন্যে হয়ে উঠেছি আর এখন মহিলা বলে কিনা আজ রাতটা আপনার ঘরে থেকে যাবো। আমাকে বলতেই হলো, আমাদের এটা পুরুষ হোস্টেল, ভদ্রমহিলাদের তো থাকার নিয়ম নেই। শামারোখ বললো, অনেক মহিলা তো থাকেন দেখলাম। আমি বললাম, তাঁরা বোর্ডারদের কারো-না-কারো স্ত্রী। শামারোখ বললো, তাতে কি হয়েছে! আমিও তো আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি। বিয়ে করার

প্রস্তাব দেয়া আর বিবাহিতা স্ত্রী হিশেবে সামাজিক স্বীকৃতি অর্জন করে এক ছাদের তলায় থাকা এক জিনিস নয়। ব্যাপারটা আমি শামারোখকে বোঝাবো কেমন করে? শামারোখ চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর রেখে বললো, আমার প্রস্তাবটা আপনার পছন্দ হলো না, তাই না? তাহলে তো চলেই যেতে হয়। ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে সে তক্ষুনি পা বাড়ালো। আমি হাত ধরে তাকে বসিয়ে দিয়ে বললাম, কথাটা এভাবে বলছেন কেনো? আপনি প্রস্তাবটা করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু তার আগে কতোগুলো কথা তো চিন্তা করে দেখতে হবে। সে বললো, আপনি কি মনে করেন, আমি চিন্তা না করেই কথাটা আপনাকে বলেছি। আমি বললাম, সেটা বলাও আমার উদ্দেশ্য নয়। মানসিকভাবে আজ আপনি খুব অস্থির এবং বিপর্যস্ত। জ্বরের তাপ যখন বেশি থাকে, গরম পানি পান করতে নেই। আপনি এই অবস্থাটা কাটিয়ে উঠে ভেবে-চিন্তে যদি আবার আমার কাছে বলেন, সবকিছু জেনেও আমাকে বিয়ে করতে চান, আমি মনে করবো, আমার হাতে স্বর্গ চলে এসেছে।

তারপর তাকে অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে তার বোনের বাড়িতে যেতে রাজি করাই। আমি তাকে বাবার বাড়িতে যেতেই বলেছিলাম। কিন্তু শামারোখ বললো, ময়না মানে তার বড় ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গে কয়েকদিন থেকে ঝগড়া চলছে। উপস্থিত মুহূর্তে সেই অগ্নিকুণ্ডে ফিরে যাওয়ার তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও নেই। বোনের বাড়িতে যেতেও রাজি করাতে অনেক সাধ্যসাধনা করতে হয়েছে। শামারোখ বললো, আপনিও মিষ্টি কথায় আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। আমি ভেবেছিলাম আপনি লোকটা ভালো। এখন দেখছি, আপনিও অন্য দশটা পুরুষ মানুষের মতো। আমি আমার দুর্বলতার কথাটা প্রকাশ করে ফেলেছি, এখন আপনি আমাকে নোংরা আবর্জনার মতো দূরে ছুঁড়ে ফেলতে পারেন। আমি বললাম, ব্যাপারটা মোটেই সে রকম নয়। ধরুন, আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হলো। আজ যদি এই ঘরে আপনি রাত কাটান, আর সে কথাটা যদি ছড়িয়ে যায়, আপনার আমার দু'জনের সামাজিক সম্মানের জন্য কাজটা মোটেও ভালো হবে না। শামারোখ ফুঁসে উঠে বললো, সমাজ আমাকে খাওয়ায় না পরায়, যে আমি সমাজের ধার ধারবো? আমি বললাম, আপনি যখন সমাজে বাস করবেন, আপনাকে সমাজের ধার ধারতেই হবে। সমাজ যখন আক্রমণ করে, সেটা অবহেলা করে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু আঘাতটা গায়ে ঠিকই বাজবে। শামারোখ এবার নরম হয়ে এলো। ঝোলা থেকে চিরুনি বের করে এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে নিলো। শাড়িটা ভালো করে পরলো। দু'জনে হেঁটে গিয়ে একটা রিকশায় চড়ে বসলাম। দু'জনের মধ্যে কোনো কথা হলো না। নীলক্ষেত ছাড়িয়ে যাওয়ার পর শামারোখ আমার কাঁধের ওপর তার ক্লান্ত মাথাটা রাখলো।

ধানমণ্ডিতে তার বোনের বাড়িতে শামারোখকে রেখে আসার পর আমি সরাসরি ঘরে ফিরতে পারলাম না। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ের সামনে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। কতোবার যে এ-মাথা-ও-মাথা করেছি, তার কোনো হিশেব নেই। বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। আমার গায়ে কোনো শীতের কাপড় নেই। তবুও আমি খুব

গরম অনুভব করছিলাম। ওই একটা দিনের মধ্যে আমার বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে। পরস্পর বিপরীতমুখী চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে আমার কাঁধ দুটো নুয়ে আসছিলো। আমি কি করবো, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

এই মহিলাটি আমাকে ভালোবাসে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম। প্রাণ থেকে ভালো না বাসলে এতোখানি এগিয়ে এসে এরকম একটি প্রস্তাব করতে পারতো না। এই অপরূপ সুন্দর মহিলার কি নেই, সবইতো আছে। তার গানের গলা চমৎকার। তার কবিতার মধ্যে মেধা ঝিলিমিলিয়ে জ্বলতে থাকে। মনে দয়ামায়া আছে। এরকম একজন সুলক্ষণা নারীর জন্য সেকালের রাজারা যুদ্ধ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। একটা মাত্র ইঙ্গিতে এই নগরীর ধনবান, রূপবান এবং বিদ্বান ব্যক্তিরা কীভাবে ছুটে এসে তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে, সে দৃশ্য আমি অনেকবার দেখেছি।

আমার নিঃসঙ্গ জীবনের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, শামারোখ এক দুপুর বেলা আপনা থেকেই এসে আমার আধ-ময়লা বিছানায় দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত ঘুমিয়েছিলো, তার জীবনের মর্মান্তিক পরাজয়গুলোর কথা আমার কাছে প্রকাশ করে অঝোরে কেঁদেছিলো। তারপর নিজের মুখেই আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলো। আমার মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্তও এই ঘটনাটি দীপ্তিমান হীরক খণ্ডের মতো জ্বল জ্বল করে জ্বলতে থাকবে। কী সৌভাগ্যবান আমি, মনে হচ্ছিলো, আমি হাত বাড়িয়ে আকাশের তারাগুলো ছুঁয়ে ফেলতে পারি। শামারোখ আমার ভেতরে একটা অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

পাশাপাশি বিপরীত একটা চিন্তার ধারাও আমার মনে প্রবাহিত হচ্ছিলো। ওই মহিলাকে রাজার ঘরে মানায়। যার দোতলা বাড়ি আছে, বাড়ির সামনে লন আছে, লনের একপাশে বাগান আছে, গ্যারেজে হাল মডেলের গাড়ি আছে, গেটের সামনে দারোয়ান দাঁড়িয়ে থাকে, আসতে-যেতে মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম ঠোকে, সেই রকম একটি বাড়িতে এই মহিলাকে চমৎকার মানায়। বিদেশী ফার্নিচার ভর্তি ড্রয়িং রুমের কার্পেটের ওপর লঘু চরণ ফেলে এই মহিলা চলাফেরা করবে, তার পায়ের ছোঁয়ায় কার্পেটের বাঘ জীবন পেয়ে আবার পায়ের কাছেই অনুগত সেবকের মতো লুটিয়ে পড়বে। এই মহিলা আমাকে বিয়ে করতে পারে, কিন্তু তাকে নিয়ে আমি কি করবো? ধরে নিলাম, মহিলার সঙ্গে আমার বিয়ে হলো। মহিলা আমাকে নিয়ে একদিন-না-একদিন তার পুরুষ বন্ধুদের সামনে হাজির করবে। আমার গ্রামীণ করুণ চেহারা নিয়ে তারা আমাকে ভ্যাঙচাবে। হতে পারে শামারোখ আমার অপমানকে তার নিজের অপমান ধরে নিয়ে ওদের কারো কারো প্রতি হাতের কাছে যা পায় ছুঁড়ে দেবে এবং আমাকে বলবে, এই কুত্তার বাচ্চাদের সঙ্গে লড়াই করে প্রমাণ করো যে তুমি তাদের চাইতেও যোগ্য পুরুষ। আমি পুরুষ বটে, কিন্তু ও নিয়ে আমার বিশেষ গর্ববোধ নেই। আমি অত্যন্ত ভীতু মানুষ, ঝগড়া-ঝাটি করাও আমার ধাতে নেই। সুতরাং শামারোখের খাতিরেও কারো সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া আমার পোষাবে না।

শামারোখ ভালোবাসতে জানে, একথা অস্বীকার করি নে। তার সৌন্দর্য, তার রুচিবোধ, তার শিক্ষা কারো কাছে নগদ মূল্যে বিক্রি করার প্রবৃত্তি শামারোখের হবে না

সে কথা আমি ভালোভাবেই জানি। কিন্তু শামারোখের ব্যক্তিত্ব আর চরিত্রের আরো একটা দিক সম্পর্কে আমি জানি। শামারোখ ভালোবাসার কাছে যতোই অসহায় বোধ করুক কিন্তু তার যে বিশেষ মূল্য আছে, সেটা সে মর্মে অনুভব করে। তার মনের একটা কামনা পুরুষ মানুষেরা তাকে নিয়ে পরস্পর শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হোক। এই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করে সে ভীষণ আনন্দ পেয়ে থাকে। সব জেনে-শুনেও শামারোখের এই ইঁদুর-ধরা কলে আমি কী করে ঢুকে পড়ি।

শামারোখের বাড়িতে আমি গিয়েছি এবং দেখেছি, আপন বড় ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গে কীভাবে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়ে থানায় গিয়ে নালিশ করার মনোভাব প্রকাশ করতে পারে। আমার মনে হলো শামারোখের সঙ্গে একই ছাদের তলায় একমাসও যদি আমাকে থাকতে হয়, তাহলে সে আমাকে বদ্ধ উন্মাদ করে তুলবে অথবা আমি তাকে খুন করে ফেলবো। সমস্ত বিষয় চিন্তা করে আমার মনে হলো, আমি যেমন মাতৃগর্ভে আবার ফেরত যেতে পারি নে, তেমনি শামারোখকে বিয়ে করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। অসম্ভব এই কথাটি মনে হওয়ায় আমার দু' চোখের কোণায় পানি দেখা দিলো। আমি নিজেকে ধিক্কার দিলাম। পুরুষ মানুষ হয়ে আমার জন্ম হয়েছিলো কেনো? একটি অসহায় নারী শেষ ভরসাস্থল মনে করে আমার কাছে ছুটে এসেছিলো, আমি চূড়ান্ত অপমান করে তাকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছি। আমি কি এতোই পাষণ্ড যে ঈশ্বরের দান করা এই সৌন্দর্য এবং মেধাকে আমি অপমান করতে পারি! আমি কাপুরুষ নই, পাষণ্ডও নই, একথা আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হলো। শামারোখ আমাকে বলুক তার পেছন পেছন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে ছুটে যেতে, কোনোরকম দ্বিধা-সংশয়ের বালাই না রেখে এক কাপড়ে আমি তার পেছন পেছন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে ছুটে যেতে পারি। শামারোখ আমাকে নির্দেশ করুক অন্য কোনো নারীর মুখের দিকে না তাকাতে, সমস্ত জীবন আমি শামারোখের মুখমণ্ডলের কথা তাহলে চিন্তা করে কাটিয়ে দিতে পারবো।

পারবো শামারোখকে খুন করে কবর দিয়ে সেই কবরের পাশে মোমবাতি এবং ধূপধুনো জ্বালিয়ে সেবায়েত হিশেবে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে। ওপরে যা বললাম, শামারোখের জন্য তার সবটা আমি করতে পারবো। কিন্তু তাকে বিয়ে করতে পারবো না। আমার চাকরিবাকরি নেই। আগামী মাসে কোথায় যাবো, কি করবো জানিনে। আমার বাড়িঘরের দুর্দশার অন্ত নেই। যেদিকেই তাকাই দাঁড়াবার সামান্যতম জায়গাও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। সুতরাং শামারোখকে নিয়ে এমন একটা জুয়োখেলায় মেতে উঠবো কেমন করে! মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন রাজা হওয়ার প্রস্তাবও অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করতে হয়। একদিকে অসহায়তা, অন্যদিকে কাপুরুষতা আমাকে চিরে যেনো দু'টুকরো করে ফেলছিলো। এই ঠাণ্ডাতেও আমার শরীরে ঘাম দেখা দিলো। আমি চাঁপাগাছটার গোড়ায় হেলান দিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম, এ অবস্থায় আমি কিভাবে শামারোখের কাজে আসতে পারি? অঙ্গভরা সৌন্দর্য এবং তুলনা-রহিত হৃদয়বৃত্তির অধিকারী এই অসাধারণ নারী সব কূল থেকে বিতাড়িত হয়ে রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছে, তার জন্য আমি ঝুঁকি নিয়ে হলেও কিছু যদি না করতে পারি, আমার মানবজনম বৃথা।

শামারোখ যাতে সম্মান নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সে ব্যাপারে কিছু করার চেষ্টা তো আমি করতে পারি। আবার মনে পড়লো, শামারোখ প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির ব্যাপারে খবর নেয়ার জন্যই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো। আমি তার চাকরিটার চেষ্টাই করি না কেন ? কিন্তু আমি কতোটুকু সাহায্য করতে পারি ? বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার চাকরিটাই হয় নি, সেই আমি শামারোখকে চাকরি দেবো কেমন করে ? আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কর্তাব্যক্তি তাঁদের একটা ত্রুটি ঢাকা দেয়ার জন্য, শামারোখ যাতে কোনোভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে না পারে, তার জন্য সবাই এককাট্টা হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। আমি ধৈর্য ধরে টানাটানি করলে হয়তো মোষের শিং থেকে দুধ বের করে আনতে পারবো, কিন্তু এই নিষ্ঠুর মানুষগুলোর প্রাণে দয়া এবং অনুকম্পা সৃষ্টি করবো কেমন করে ? তক্ষুনি আমার, কেন বলতে পারবো না, প্রধানমন্ত্রীর কথাটা মনে হলো। আজকাল তাঁর ইচ্ছেতেই তো বিশ্ববিদ্যালয়ে সব কিছু ঘটছে। প্রধানমন্ত্রী যাঁর কথা শুনবেন, এমন একজন মানুষ আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমার মনে হঠাৎ করেই সৈয়দ দিলদার হোসেনের মুখখানা ভেসে উঠলো।

গত এক হপ্তা ধরে আমার মধ্যে একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আমার এই মানসিক অবস্থা বন্ধু-বান্ধব কারো কাছে তুলে ধরতে পারছি নে। আমার অকৃত্রিম বন্ধুদের প্রায় সবাই পরামর্শ দিয়েছিলেন শামারোখের সঙ্গে আমি যেন মেলামেশা না করি। কারণ তারা মনে করেন, শামারোখ আমাকে বিপদে ফেলে দেবে। এই বন্ধুদের কাছে আমার মুখ খুলবার উপায় নেই। আর যারা আমার নামকাওয়াস্তে বন্ধু, তাদের সঙ্গে কোনো বিষয়ে পরামর্শ করার প্রশ্নই ওঠে না। এরা মুখ ফুটে কিছু না বললেও আমি বিলক্ষণ বুঝত পারি, আমাকে তারা মনে মনে ভীষণ ঈর্ষা করে। আমি সবদিক দিয় একজন দাগ-ধরা মানুষ। দেখতে আমি সুদর্শন নই, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উজ্জ্বল কৃতিত্বের দাবিদার নই। আমার টাকা-পয়সা নেই এবং পেশায় আমি একজন বেকার। এইরকম একজন মানুষের সঙ্গে শামারোখের মতো একজন রূপসী মহিলা সকাল-দুপুর ঘোরাঘুরি করবে, তারা সেটা সহ্য করবেন কেন ? পথে-ঘাটে দেখা হলে তাদের কেউ কেউ চিকন করে হাসে। তাদের কেউ কেউ জিগ্যেস করে বসে, কি ভায়া, প্রেম-তরণী কোন্ ঘাটে নোঙর করলো ? হালটা শক্ত হাতে ধরবে। যদি একেবারে ভেসে যাও, সেটা ভালো কাজ হবে না।

শামারোখের সঙ্গে মেলামেশার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার পর থেকে আমি আমার শিক্ষকদের সঙ্গেও দেখাশোনা করা ছেড়ে দিয়েছি। কারণ তাঁদের অনেকেই এর মধ্যে সিদ্ধান্ত করে বসে আছেন আমি শিক্ষক সমাজকে অপমান করার জন্যই শামারোখকে নিয়ে এমন বেপরোয়াভাবে সব জায়গায় ঘোরাঘুরি করছি। নিজের ভেতরে সন্দেহ, সংশয় এবং অনিশ্চয়তার যখন পাহাড় জমে ওঠে এবং সেটা যখন কারো কাছে প্রকাশ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, যন্ত্রণা হাজার গুণে বেড়ে যায়।

আমি যদি শামারোখের কথা মাফিক তাকে বিয়ে করে ফেলতাম সেটা খুব ভালো কাজ হতো। হয়তো এ বিয়ে টিকতো না। অনেক বিয়েই তো টেকে না। কিন্তু আমি মনের ভেতরে কোনো সাহস সঞ্চয় করতে পারছি নে। শামারোখকে বিয়ে করলে

আমাকে হোস্টেল ছেড়ে দিয়ে একটা বাসা করতে হবে। আমার চাকরিবাকরি কিছু নেই। বাসা ভাড়া দেবো কেমন করে ? আর শামারোখকে চালাবোও-বা কেমন করে ? শামারোখের যদি একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় থাকতো, তা হলেও না হয় চিন্তা করা যেতো। ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখেছি সেখানে আমার থাকার ব্যবস্থা হওয়ার কথা দূরে থাক, ওর নিজেরও ঠাঁই নেই। তাকে বড় ভাইয়ের বউয়ের হাতে রীতিমতো অপমান সহ্য করে সে বাড়িতে থাকতে হচ্ছে। শামারোখ একটা ভাসমান অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তাকে আমি এই ক'মাসে যতোদূর বুঝতে পেরেছি, এই মানসিক অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই সে আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছে। এই প্রস্তাবের পেছনে সত্যিকার ভালোবাসা আছে, বিশ্বাস করতে পারছি নে। কিন্তু এটা কোনো সমাধান নয়। সমস্ত সদিচ্ছা সত্ত্বেও আমি তাকে একবিন্দু নিশ্চয়তাও দিতে পারবো না। শামারোখকে নিয়ে আমি কি করবো ?

আমি যদি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করি, শামারোখ যেসব মানুষের হাতে গিয়ে পড়বে, যাদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, হয়তো তাদের একজনকে বিয়ে করতে বাধ্য হবে। আমি জানি শামারোখের মাথায় অনেক রকমের কিড়ে আছে, কিন্তু তার যে লোভ নেই, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তাই যদি থাকতো এই সমস্ত টাকাঅলা প্রতিষ্ঠাবান মানুষদের কোনো একজনকে সরাসরি সে বিয়ে করে ফেলতো। শামারোখ তার শারীরিক সৌন্দর্য সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন, একথা সত্য। কিন্তু মানসিক পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটি তার কাছে তারও চাইতে বড়। কিন্তু পরিস্থিতি যখন চাপ দিতে থাকে, অনেক সময় বনের বাঘও ঘাস চিবিয়ে খেতে বাধ্য হয়। অস্তিত্বের যে সঙ্কট কোনো মানুষই সেটা অতিক্রম করতে পারে না। শামারোখের পছন্দ করার গণ্ডি অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়েছে। ওই অবস্থায় সে ওই তাড়িয়ে-বেড়ানো লোকদের ভেতর থেকে যদি একজনকে বিয়ে করে বসে, হয়তো জীবনে অসুখী হবে। কিন্তু আমি সবার উপহাসের পাত্রে পরিণত হবো। সবাই বলবে, আমি এতোদিন শামারোখের ভেড়ুয়াগিরি করে কাটিয়েছি। এতোদিন সে আমাকে দেহরক্ষী হিশেবে ব্যবহার করেছে এবং যখনই সুযোগ পেয়েছে আমাকে ল্যাং মেরে এক ধনী লোকের ঘরণী হয়ে বসেছে। কারো কাছে আমার মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। সবাই আমাকে করুণা করবে। যতোই ভেতরের কথা আমি বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করি না কেন, কে আমার কথা বিশ্বাস করবে ?

আমি তীব্রভাবে অনুভব করছিলাম ওই অবস্থা থেকে শামারোখকে এবং আমাকে উদ্ধার করার জন্য এমন একটা কিছু করা প্রয়োজন, যাতে করে অল্প পরিমাণে হলেও শামারোখ তার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে। ভেবে ভেবে ঠিক করলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটি যদি সে কোনোভাবে পেয়ে যায়, আপাতত সবদিক রক্ষা পেতে পারে। আমি মনে মনে সান্ত্বনা পাবো এই ভেবে যে, শামারোখকে একটা অবস্থানে অন্তত দাঁড় করিয়ে প্রকৃত বন্ধুত্বের পরিচয় দিতে পেরেছি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিরা তাকে ঢুকতে না দেয়ার জন্য যে ধনুক-ভাঙা পণ করে বসে আছেন, সেটাও ভেঙে ফেলা যাবে। এখন প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুই ঘটছে না। যদি কোনোভাবে

প্রধানমন্ত্রী অবধি যাওয়া যেতো একটা রাস্তা হয়তো পাওয়া যেতো। আমি একথা আগেও চিন্তা করেছি।

চিন্তাটা মাথায় রেখেই মতিঝিলে দিলদার হোসেন সাহেবের অফিসে গেলাম। আমি তাঁকে অফিসের সামনেই পেলাম। তিনি গাড়ি থেকে নামছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে দরাজ গলায় হুঙ্কার ছাড়লেন, এই যে ছোঁড়া এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে, আসো নি কেন? আমি আমতা আমতা করে বললাম, দিলদার ভাই, হঠাৎ করে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, সে জন্য আসতে পারি নি। দিলদার সাহেব জোরালো গলায় বললেন, জানি, জানি, সব খবর জানি। আমার কাছে কোনো সংবাদ গোপন থাকে? এমন এক সুন্দরীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো, যাকে দেখলে ঘোড়াগুলো পর্যন্ত নাকি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সব জায়গায় যাচ্ছো, আমার কাছে আসো নি কেন? আমি কি তোমার সঙ্গে ভাগ বসাতে চাইতাম? ছোকড়া এখন, তোমরা ওড়ার চেষ্টা করছো। এক সময় আমাদেরও দিন ছিলো, আমরাও চুটিয়ে প্রেম করেছি হে। তুমি একা কেন? তোমার সুন্দরী কোথায়? সেই সময়ে তাঁর হাঁপানির টানটা প্রবল হয়ে উঠলো। তিনি চেয়ারে বসে পকেট থেকে ইনহেলার বের করে টানলেন। তারপর দু'তিন মিনিট স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

দিলদার হোসেন সাহেব একজন সত্যিকার ডাকাবুকো স্বভাবের মানুষ। তিনি ভলো কি মন্দ এসব কথা চিন্তা করার সময় আমার হয় নি। ওই মানুষটির পৌরুষ এবং সাহস আমাকে সব সময় আকর্ষণ করেছে। হাঁপানি তাঁকে কাবু করে ফেলেছে। তারপরও এই প্রায় ছয় ফিট লম্বা মানুষটা যখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান, তাঁকে আমার চিরন্তন যৌবনের প্রতীক বলেই মনে হয়। তাঁর কাছে অসম্ভব বলতে কিছু নেই, সব সময় যেন ঝুঁকি গ্রহণ করতেই তিনি তৈরি হয়ে রয়েছেন।

কঠিন সমস্যায় পড়লেই মানুষ তাঁর কাছে আসে। তিনি সবকিছু মোকাবেলা করেই যেনো আনন্দ পেয়ে থাকেন। কেউ টাকা-পয়সা চাইলে উদার হাতে বিলিয়ে দেন। আবার কারো কাছ থেকে টাকা-পয়সা নিজে গ্রহণ করলে শোধ দেয়ার কথা বেমালুম ভুলে যেতেও কসুর করেন না। ক্লাবে বসে গ্লাসের পর গ্লাস নির্জলা তাজা হুইস্কি যেমন পান করেন, তেমনি তাঁকে তার অত্যন্ত গরিব পিয়নের সঙ্গে কচুর লতি দিয়ে পান্তা ভাত খেতেও দেখেছি। এই মানুষটাকে আমি কোনো সীমা, কোনো সংজ্ঞার মধ্যে বাঁধতে পারি নি, যেনো অনায়াসে সব কাজ করার জন্যই তাঁর জন্ম হয়েছে।

কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই তিনি ছন্দ-মাত্রা মিলিয়ে নিখুঁত কবিতা লিখে দিতে পারেন। অবসরে হাতুড়ি-বাটালি দিয়ে সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের চেয়ার-টেবিল বানাতে তাঁর জুড়ি নেই। তাঁর গাড়িটা বিকল হলে মিস্তিরি ডাকার বদলে নিজেই আধময়লা লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে গাড়ির তলায় শুয়ে নাট-বল্টু খুলে খুলে মেরামত করে ফেলেন। এক সময় রেসের ঘোড়া পুষতেন। এক সময়ে গরুর ব্যবসাও করেছেন বলে শুনেছি। দিলদার সাহেব এতো প্রবলভাবে বেঁচে আছেন যে কোনো ব্যাপারে তাঁর বাছ-বিচার নেই বললেই চলে। এই বুড়ো বয়সেও এক তরুণীকে কেন্দ্র করে তাঁর নামে কেলেংকারীর কাহিনী রটে যায়। এই নিয়ে তাঁর অত্যন্ত আধুনিকা রুচিবান স্ত্রী রাগারাগি করলে সেই তরুণীকে বিয়ে করে

ফেলেন। বাড়িটা ছিলো স্ত্রীর নামে। মহিলা তাঁকে খোটা দিলে দিলদার সাহেব বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে অফিসে থাকতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁর হাতে বিশেষ টাকা-পয়সা ছিলো না। বন্ধু-বান্ধব একে-তাকে ধরে আরেকটা বাড়ির ব্যবস্থা করেন এবং তখন তিনি নতুন স্ত্রী নিয়ে সেই বাড়িতেই থাকছেন। তিনি এমন অনেক কাজ করেছেন, যেগুলো আমাদের চোখেও মনে হয়েছে রীতিমতো অন্যায়। যখন কৈফিয়ত চেয়ে জিগ্যেস করেছি, দিলদার ভাই ও কাজটা কেন করলেন, তিনি দরাজ গলায় জবাব দিয়েছেন, আমার খুশি আমি করেছি। তোমার খারাপ লাগলে আসবে না। আমি ঘ্যানঘ্যান করা অপছন্দ করি।

দিলদার সাহেবের হাঁপানির টানটা কমে এলে আমি তাঁর কাছে শামারোখের চাকরি সংক্রান্ত কাহিনীটি বয়ান করি। তার বর্তমান অসহায়তার কথাটাও উল্লেখ করি। তিনি আমার কথা শুনে ক্ষেপে উঠলেন, শালা তুমি একটা আস্ত হিজড়ে, কিছু করার মুরোদ নেই, আবার ওদিকে প্রেম করার শখ। দিলদার সাহেব, ওরকমই। প্রথমে একচোট গালাগাল শুনতে হবে, সেটা জেনেই এসেছি। আমি চুপচাপ অগ্ন্যুৎপাতটা হজম করলাম। তিনি কাজের ছেলেটাকে ডেকে হুকুম করলেন, এই বাচ্চা, দু' কাপ চা লাগাও। তিনি নিজের কাপটা টেনে নিয়ে আমাকে বললেন, চা খাও। চায়ে চুমুক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বুঝলাম, প্রথম ধকলটা কেটে গেছে। এখন তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলা যাবে। তিনি বললেন, শালা তোমার অবস্থা হয়েছে পীরের বাড়ির কলা চোরের মতো। চোর পীরের বাড়ির কলার ছড়াটা কেটেছিলো ঠিকই। কিন্তু নিয়ে যাওয়ার বেলায় দেখলো ব্যাটার এক পাও নড়ার সাধ্য নেই। পীর সাহেব দোয়া পরে কলার ছড়াটা আগে থেকেই রক্ষা করার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তা আমার কাছে কেন এসেছো, সেটা আগে বলে ফেলো। তোমার সামান্য লাজ-লজ্জাও নেই। প্রেম করবে তুমি আর কষ্ট দেবে আমাকে। শালা, আমার যে তোমার বাপের মতো বয়স, সে কথাটি খেয়াল করেছো? দিলদার সাহেবের এসব কথা তো শুনতেই হবে।

আমি বললাম, প্রধানমন্ত্রীকে যদি একবার অনুরোধ করা যায়, তাহলে হয়তো শামারোখ কাজটা পেতে পারে। আজ আমার কপালটাই খারাপ। দিলদার সাহেব ফের চটে গেলেন। তোমার কি আক্কেল, একটি মেয়ে মানুষের সঙ্গে তুমি প্রেম করবে, আর দেশের প্রধানমন্ত্রী তার চাকরির ব্যবস্থা করবেন! এই জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছো? তোমাদের মতো লোকদের জন্যই দেশটা গাড্ডায় পড়ে আছে।

আমার মনটা দমে গেলো। দিলদার সাহেব বোধ হয় আমার অনুরোধটা রাখবেন না। আমি অনুভব করছিলাম, আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। দিলদার সাহেব পাঞ্জাবির গভীর পকেট থেকে নস্যির কৌটোটা বের করে এক টিপ নস্যি নিলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, অমন করে আচাভুয়োর মতো বসে রইলেন কেন? এখন কাটো, আমার কাজ আছে।

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। আমার কণ্ঠ দিয়ে সমস্ত আকুলতা মেশানো একটা স্বরই শুধু বেরিয়ে এলো, দিলদার ভাই। আমার মনে হচ্ছিলো আমি কেঁদে ফেলবো। হঠাৎ দিলদার সাহেবের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখতে পেলাম। তাঁর চোখ

জোড়া মমতায় মেদুর হয়ে এসেছে। তিনি বললেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা, সেকি চাট্টিখানি কথা! তুমি তো শালা মিনমিন করো। হুলো বেড়ালের মতো ইশক মাথায় উঠে গেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বলবো কি ? কাগজপত্র কোথায়, তোমার সুন্দরীকে নিয়ে আসবে আগামী শনিবার। মনে মনে তৈরি থাকবে যদি আমার মনে ধরে যায় আর ফেরত পাবে না।

শনিবার সকালে আমি শামারোখদের শান্তিনগরের বাড়িতে গেলাম। তখন বেলা বড়জোর আটটা। শামারোখের বাবা খাটের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি সব লেখালেখি করছেন। খাটে ছড়ানো আরবি বই। হয়তো তিনি কোরআনের সেই তরজমার কাজটাই করছেন। ভদ্রলোকের গায়ে একটা অতি সাধারণ গামছা। তাতে পিঠের একাংশ মাত্র ঢাকা পড়েছে। আমি দেখতে পেলাম তাঁর সারা শরীর লম্বা শাদা লোমে ভর্তি। আমি সালাম দিলাম। উত্তর দেয়ার বদলে ভদ্রলোক বললেন, টুলু তো ঘুমিয়ে আছে। আমি বললাম, একটু ডেকে দেয়া যায় না ? ভদ্রলোক বললেন, আমি তো মেয়েদের ঘরে যাই নে। আমি একটু চাপ দিয়েই বললাম, ডেকে দিতে হবে, একটা দরকার আছে। ভদ্রলোক বিরক্ত হলেন, কিন্তু খাট থেকে নেমে মোটর টায়ারের স্যান্ডেলে পা গলিয়ে একটুখানি ভেতরে গিয়ে ডাকতে লাগলেন, ও টুলু, টুলু, ওঠো। তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য এক ভদ্রলোক এসেছেন।

কে আব্বু, শামারোখের কণ্ঠ শুনতে পেলাম।

তার বাবা বললেন এক ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য বসে আছেন।

এতো সকালে আবার কে এলো ? আর পারি নে বাবা! শামারোখের করুণ ক্লান্ত কণ্ঠ। কলের পানি পড়ার শব্দ হলে বুঝলাম, শামারোখ বাথরুমে ঢুকেছে।

আমাকে বেশিক্ষণ বসতে হলো না। শামারোখ দরোজার ভেতর থেকেই আমাকে দেখতে পেয়ে বললো, ও, আপনি ? তার গলার স্বর আটকে গেলো। সেই রাতে ফেরত পাঠাবার পরে শামারোখের সঙ্গে আমার আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি। আমাকে দেখে সে খুশি হয়েছে, চোখ-মুখের ভাব থেকেই সেটা ফুটে উঠেছে। আমি বললাম, শামারোখ আপনি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আসেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলোও সঙ্গে রাখবেন। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

শামারোখ বললো, আপনি সকালে নাশতা করেছেন ? আমি বললাম, না। সে বললো, বসুন নাস্তা দিতে বলি। আমি বললাম, সময় হবে না, আপনি তাড়াতাড়ি আসুন। পথে কোথাও নাশতা খেয়ে নেয়া যাবে। শামারোখের একটি অভ্যাসের তারিফ অবশ্যই আমাকে করতে হবে। ভদ্রমহিলারা সাধারণত বাইরে বেরুবার আগে সাজতেগুজতে এতো সময় ব্যয় করে ফেলেন যে অপেক্ষমাণ লোকটির চূড়ান্ত বিরক্তি উৎপাদন করে ছাড়েন। শামারোখ এদিক দিয়ে অনেক নির্ভার। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই পরনের শাড়িটা পাল্টে একটা ফাইল হাতে করে বেরিয়ে এলো।

আমরা একটা রিকশা নিলাম এবং পুরনো পল্টনের মোড়ে এসে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে নাশতাটা সারলাম। খেতে বসেই আমি শামারোখকে দিলদার সাহেব সম্পর্কে একটা

ধারণা দিতে চেষ্টা করলাম। আমাকে খুব বেশি বলতে হলো না। শামারোখ নিজেও দিলদার হোসেন সাহেবকে চেনে। আমি আরো বললাম, আমি তাকে তার চাকরিটার জন্যই প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে অনুরোধ জানাতে দিলদার সাহেবকে একরকম রাজি করিয়েছি। বিস্ময়ে শামারোখের চোখজোড়া কপালে উঠে গেলো, এখনো আপনি আমার চাকরির কথা মনে রেখেছেন ? আমার ডান হাতে সে একটা চাপ দিলো। আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। শামারোখকে আজ অনেকটা সুন্দর দেখাচ্ছে। চোখ ফেরাতে পারছিলাম না।

দিলদার হোসেন সাহেব অফিসে একা ছিলেন। আমরা যখন স্যুয়িং ডোর টেনে ভেতরে ঢুকলাম, তিনি কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানালন, এসো, শামারোখ, এসো। আমি এখন বুড়ো হয়ে গেছি, মহিলারা আর আমার খোঁজ নিতে আসে না। শামারোখের একটা সুন্দর জবাব যেনো তৈরি হয়েই ছিলো। সে বললো, আপনি একটা খবর দিলেই তো পারতেন। আমি চলে আসতাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের খতরনাক লোকগুলো তোমাকে আটকে দিয়েছে, না ? কাগজ-পত্রগুলো বুঝিয়ে দাও। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা সম্ভব হয়েছে। দিলদার সাহেবের কথা শেষ হতেই আমার গা থেকে ঘাম দিয়ে যেনো জ্বর ছাড়লো। আমি আশঙ্কা করেছিলাম দিলদার সাহেব তাঁর শিষ্টতা তোড়ে আমাদের নাজেহাল করে ছাড়বেন। আজকে তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যবহার করলেন।

আমরা কাগজপত্র বুঝিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, আজকে আমার হাতে সময় নেই। আরেকদিন এসো, গল্প করা যাবে। দেখি তোমাদের জন্য কিছু করা সম্ভব হয় কিনা। তিনি বাইরে বের হবার জন্য পা বাড়ালেন। আমাদেরও উঠতে হলো।

সাত আট দিন পর দিলদার হোসেন সাহেবের অফিসের পিয়ন একটা চিরকুট নিয়ে এলো। তিনি লিখেছেন, 'জাহিদ, তুমি আগামীকাল সন্ধে বেলা তোমার বান্ধবীকে নিয়ে ডেইজির বাড়িতে আসবে। তুমি বোধহয় জানো, আমি এখন ডেইজির ওখানে থাকি। ডেইজি বড় একা থাকে। তোমাদের দেখলে খুশি হবে। রাতের খাবারটাও ওখানে খাবে। তোমার বান্ধবীর জন্য একটা সুখবর আছে। সাক্ষাতে জানাবো। জায়গাটা একটুখানি দুর্গম। কিভাবে আসবে পথের ডিরেকশানটা দিচ্ছি। এগারো নম্বর বাস স্টেশনের গোড়ায় এসে নামবে। তারপর হাতের ডানদিকে একটা চিকন গলি পাবে। সেই গলি দিয়ে হাজার গজের মতো এসে দেখবে গলিটা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা আরেকটা গলিতে এসে মিশেছে। যে নতুন গলিটা পাবে তার ডান দিকটাতে ঢুকবে। পাঁচশ' গজের মতো সামনে এগুলে একটা তালগাছ চোখে পড়বে। সেই তালগাছের পাশ দিয়ে দেখবে আরেকটা চিকন পথ আবার পূবদিক গেছে। কিছুদূর এলেই একটা ধানখেত এবং ধানখেতের পাশে পুকুর দেখতে পাবে। পুকুরের উত্তর পাড়ে টিনের বেড়া এবং টিনের ছাউনির একটা ঘর দেখতে পাবে। সেই ঘরটাতেই এখন আমরা থাকছি। রাস্তা চেনার জ্ঞান তোমার অল্প। সে জন্য পথের নিশানাটা চিঠির পেছনে এঁকে পাঠালাম। একটু বেলা থাকতেই এলে তোমাদের বাড়িটা খুঁজে নিতে সুবিধে হবে। যদি রাত করে আসো, বিপদে পড়ে যেতে পারো।

এদিকটাতে প্রায়ই লোডশেডিং হয়। একবার কারেন্ট গেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। আর রাস্তা-ঘাটে ডাকাত-হাইজ্যাকারদের বড় উৎপাত।'

আমি চিঠিটা নিয়ে শামারোখদের শান্তিনগরের বাড়িতে গেলাম। ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিলো। কড়া নাড়তেই খুলে গেলো। শামারোখকেই সামনে পেয়ে গেলাম। মনে হলো সারা বাড়িতে আর কেউ নেই। আগে যখনই গিয়েছি প্রতিবার তার বাবাকে খাটের ওপর ঝুঁকে পড়ে কোরান অনুবাদ করতে দেখেছি। আজ তাঁকে দেখলাম না। খাটময় আরবি-বাংলা কোরআন এবং কোরআনের তফসির ইতস্তত ছড়ানো। কি কারণে জানি নে আজ শামারোখের মুখখানা অসম্ভব রকমের থমথমে। তার এ-রকম মূর্তি আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সে ঠাণ্ডা গলায় আমাকে বললো, বসুন। দড়িতে ঝোলানো গামছাটা নিয়ে কাঠের চেয়ার থেকে ধুলো মুছে দিলো। আমি জুত করে বসার পর শামারোখ ভেতর থেকে এসে একটা কাগজ আমার হাতে তুলে দিয়ে বললো, আপনার জন্য চা করে আনি। ততোক্ষণে বসে বসে এগুলো পড়ে দেখুন।

রুল করা দামি কাগজ। এক পাশে ফাঁক ফাঁক করে বাংলা-ইংরেজি মিলিয়ে লেখা। শিটগুলো নাড়াচাড়া করতেই নাকে একটা মিষ্টি মতো ঘ্রাণ পেয়ে গেলাম। নিশ্চয়ই এই কাগজের শিটগুলোর সঙ্গে সেন্ট বা এসেন্স জাতীয় কিছু মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। দু'একটা বেয়াড়া রকমের বানান ভুলও লক্ষ্য করলাম। হাতের লেখা দেখে মনে হলো, যে ভদ্রলোক লিখেছেন তার মনটা বিক্ষিপ্ত। পড়ে ফেললে তো ভালোমন্দ যাই থাকুক জেনে যাবো! আর জেনে গেলে তো সমস্ত কৌতূহলের অবসান হয়ে গেলো।

আমি কাগজের শিটগুলো টেবিলের ওপর রেখে দিলাম। তারপর সিগারেট ধরালাম। আগে শামারোখ চা নিয়ে আসুক। চায়ে চুমুক দিতে দিতে দেখা যাবে শিটগুলোতে কি আছে। দিলদার সাহেবের চিঠিটা আমার পকেটের ভেতর থেকে কৈ মাছের মতো উজান ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিলো। অন্য কোনো কিছু পড়ে দেখবার মতো মানসিক অবস্থা আমার নেই। শামারোখ চা এবং বিস্কুট টেবিলের ওপর রেখে বললো, পড়ে দেখেছেন? আমি বললাম, না। উল্টো জিগ্যেস করলাম, ওগুলো কি? শামারোখ বললো, প্রেমপত্র। কাগজ থেকে গন্ধ পান নি? আমি বললাম, হ্যাঁ পেয়েছি। কিন্তু আপনি বলবেন তো প্রেমপত্রগুলো কে কাকে লিখেছে? শামারোখ বললো, আর কাকে লিখবে? লিখেছে আমাকে। আমি বললাম, সে তো নতুন কথা নয়। আপনাকে তো সব্বাই প্রেমপত্র লেখে। শামারোখ বললো, কই, আপনিতো লেখেন নি? আমি বললাম, সময় পেলাম কই? ঝুট-ঝামেলা নিয়েই তো ব্যস্ত থাকতে হলো। চা খেতে খেতে বললাম, ওই গন্ধঅলা চিঠিগুলো কি একান্তই আমাকে পড়ে দেখতে হবে?

পড়বার জন্যই তো দিলাম।

আপনাদের হার্ভার্ড ফেরত প্রফেসর আবু তায়েবের কাণ্ড দেখুন।

আমি জিগ্যেস করলাম, তায়েব সাহেবের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?

পরিচয় না থেকে উপায় কি বলুন! ভদ্রলোক প্রতি হপ্তায় আসেন। একবার বসলে আর উঠতেই চান না। আমাকে জ্বালিয়ে মারলেন। প্রতি হপ্তায় চিঠি আসছে তো আসছেই।

ঠিক তক্ষুনি আবার মনে পড়ে গেলো, একবার প্রফেসর তায়েব আমাকে জেনারেল পোস্ট অফিসের সামনে থেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বনানীর আকাশছোঁয়া রেস্টুরেন্টটায় নিয়ে গিয়েছিলেন। হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে আমার কাছ থকে শামারোখ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছিলেন। তায়েব সাহেব প্রায়ই শামারোখের কাছে আসেন এবং প্রতি হপ্তায় তাকে সেন্ট মাখানো কাগজে প্রেমপত্র লেখেন, এ সংবাদ শুনে তাঁর ওপর আমার মনে একটা প্রবল ঘৃণার ভাব জন্মালো।

শামারোখকে আর কিছুই বলতে হলো না। একটা একটা করে চিঠিগুলো পড়ে গেলাম। চিঠি পড়ার পর আমার মনে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া জন্ম নিলো। কাচের শো কেসের ভেতর সবকিছু যেমন খালি চোখে দেখা যায়, আমিও তেমনি তায়েব সাহেবের মনের চেহারাটা দেখতে পেলাম। আমার চোখের সামনে একজন হতাশ, অসহায়, একই সঙ্গে কামুক এবং অহঙ্কারী মানুষের ছবি ফুটে উঠলো। এই নিঃসঙ্গ বয়সী মানুষটার ওপর আমার মনে সহানুভূতির ভাব জন্মাতে পারতো। কিন্তু সেটা হলো না। শামারোখের কাছে উলঙ্গভাবে প্রেম নিবেদন করেছে, সেটাই আমার প্রধান নালিশ নয়। বরং আমার রাগ হলো এ কারণে যে, ভদ্রলোক অতি সাধারণ বাংলা বানানও ভুল করেন। আর তিনি মনের অনুভূতি রুচিস্নিগ্ধ ভাষায় গুছিয়েও প্রকাশ করতে পারেন না। প্রতি ছত্রেই অহমিকা এবং দাম্ভিকতা হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। ভদ্রলোকের প্রায় প্রত্যেকটা চিঠির মর্মবস্তু বলতে গেলে ওই একই রকম। আমি একজন বিরাট মানুষ, সম্প্রতি বড়ই নিঃসঙ্গ এবং কামাতুর, সুতরাং তুমি আমার কাছে এসো। যা চাও সব দেবো। প্রফেসর আবু তায়েবের বাড়িতে মেয়েরাও থাকতে চায় না কেনো, এখন কারণটা অনুধাবন করতে পারলাম। তিনি মহিলাদের একটা পণ্য হিশেবেই দেখেন।

আমি এবার চিঠিগুলো শামারোখের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। শামারোখ বললো, ওগুলো নিয়ে আমি কি করবো? আমি বললাম, আপনি কি করবেন, আমি কি করে বলবো। ইচ্ছে হলে জবাব দেবেন, ইচ্ছে হলে চন্দন কাঠের বাক্সে রেখে দেবেন। শামারোখ বললো, কি করি দেখুন। এই বলে সে ভেতরে চলে গেলো। একটা হিটার নিয়ে এসে প্লাগটা সুইচ বোর্ডে লাগিয়ে নিলো। কয়েলটা যখন লাল হয়ে উঠেছে, শামারোখ তখন একটা একটা করে চিঠিগুলো সেই জ্বলন্ত হিটারে ছুঁড়ে দিলো। আমি দেখলাম, আবু তায়েবের হৃদয়-বেদনা, আসঙ্গলিপ্সা, নিঃসঙ্গতার আর্তি সবকিছু সর্বশুচি আগুনের শিখায় ভস্মে পরিণত হচ্ছে। শামারোখ এরকম একটা কাণ্ড করতে পারে, ভাবতে পারি নি। আমি ভীষণ খারাপ বোধ করতে থাকলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি দিলদার সাহেবের চিঠিটা পকেট থেকে বের করতে পারলাম না। বাতাসে পুড়ে যাওয়া চিঠির ছাই ইতস্তত ওড়াওড়ি করছে। মনে হলো, আবু তায়েবের মনের অতৃপ্ত কামনা-বাসনা আমার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু ছাই এসে আমার বাম চোখে পড়লো এবং চোখটা জ্বালা করতে থাকলো। বেসিনে গিয়ে চোখে-মুখে পানি দিয়ে এসে আমি চিঠিটা শামারোখের হাতে দিলাম। শামারোখ চিঠিটা পড়ে মন্তব্য করলো, মনে হচ্ছে, জায়গাটা উত্তর মেরুরও উত্তরে। অতো দূরে যাবো কেমন করে? আর ভদ্রলোকও-বা অতো দূরে থাকেন কেন?

আমি বললাম, দিলদার সাহেব আগে ধানমন্ডি পনেরো নম্বরে থাকতেন। সম্প্রতি তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। বাড়িটা দিলদার সাহেবের প্রথম বেগমের নামে। শামারোখ জানতে চাইলো, এই বয়সে স্বামীকে তাড়িয়ে দেবে কেন? আমি পাল্টা জবাব দিলাম, এই বয়সে আপনিও-বা স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসবেন কেন? আমার প্রশ্নটা শুনে শামারোখ সোজা হয় বসলো। তার চোখ মুখ লাল হয়ে গেলো। তারপর উঠে কিছু না বলে ভেতরে চলে গেলো। মনে হলো, আমি তার অসম্ভব নরম জায়গায় আঘাত করে ফেলেছি। কিছুক্ষণ পরে এসে শামারোখ জিগ্যেস করলো, আপনার দিলদার সাহেব মানুষটা কি বদমাশ? এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে আবার বিয়ে করলেন কেন? আমি বললাম, এক অর্থে আপনার কথা সত্যি। কিন্তু মানুষটা আরো অনেক কিছু। তিনি ভালো কবিতা লেখেন, চমৎকার বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। অসাধারণ সাহসী মানুষ। শামারোখ আমার মুখের কথা টেনে নিয়ে বললো, সাহস জন্তু-জানোয়ারেরও থাকে। আপনারা পুরুষ মানুষেরা আপনাদের অপরাধগুলোকে গুণ হিশেবে তুলে ধরতে চেষ্টার কসুর করেন না।

আমি বললাম, দিলদার সাহেব, আপনাকে কি একটা খবর দেয়ার জন্য ডেকেছেন। আপনি যেতে চান কি না, সেটা বলুন। এখন বারোটা বাজে। ওখানে পাঁচটার সময় না পৌঁছুতে পারলে বাড়ি খুঁজে বের করতে কষ্ট হবে। শামারোখ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকার পর বললো, হ্যাঁ যাবো।

আমি বললাম, তাহলে আপনাকে চারটের সময় আমার হোস্টেলে আসতে হবে।

শামারোখ তাদের বাড়িতে দুপুরের খাবার খেয়ে আসতে অনুরোধ করেছিলো। আমি রাজি হই নি।

আমাদের ধারণা ছিলো অন্তত সাড়ে ছ'টা নাগাদ আমরা দিলদার সাহেবের বাড়িতে পৌঁছবো। এ-গলি, সে-গলি, তস্য গলি এবং তস্য গলির তস্য গলি ঘুরে ধান খেত পেরিয়ে পুকুরপাড়ে একতলা বাড়ি খুঁজে বের করতে সাড়ে সাতটা পার হয়ে গেলো। আর আমরা যেই ঘরের ভেতরে পা দিয়েছি, অমনি কারেন্ট চলে গেলো। ভুতুড় জমাট বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে আমরা অসহায়বোধ করতে লাগলাম। দিলদার সাহেব হারিকেনটা জ্বালিয়ে একপাশে রেখে বললেন, আমি ধরে নিয়েছিলাম, আজ তোমরা আর আসছো না। ডেইজি সেই গানটাই বার বার শুনিয়ে দিচ্ছিলো, 'কাঙাল হইলে ভবে কেউ তো জিগায় না।' হারিকেনের স্বল্প আলোতে আমি ঘরের চেহারাটা জরিপ করতে থাকলাম। এক কোণে শাদাসিধে একখানা তক্তপোশ। তিন-চারটে চেয়ার এবং কেরোসিন কাঠের একটা টেবিল। খুব সাধারণ একটা আলনায় গুছিয়ে রাখা হয়েছে ডেইজির শাড়ি, পেটিকোট এইসব। এছাড়া ঘরে অন্য কোনো আসবাবপত্র নেই। ভদ্রলোককে আমি গত দশ বছর ধরে তাঁর ধানমন্ডির তিনতলা বাড়িতে দেখে এসেছি। তাঁর বাড়ির দেয়ালে ঝোলানো যেসব ছবি ছিলো, সেগুলোর মূল্যও এই বাজারে তিন-চার লাখ টাকার কম হবে না। এখন তিনি ডেইজিকে নিয়ে যে ঘরে থাকছেন, চেহারা দেখে মনে হলো, ধানমণ্ডির বাড়ি থেকে একটা কুটোও তিনি নিয়ে আসেন নি। মানুষটার প্রতি শ্রদ্ধা আমার অনেক পরিমাণে

বেড়ে গেলো। ইচ্ছে করলে তিনি ডেইজির দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারতেন। দুর্বল মুহূর্তে তো মানুষ অনেক কিছুই করে! দায়িত্ব স্বীকার করে এরকম জঙ্গলে বসবাস করার এই যে সাহস, ক'জন মানুষ সেটা করতে পারে ? অনেকে দিলদার সাহেবকে ভালো মানুষ বলবেন না। কিন্তু আমার চোখে তিনি একজন যথার্থ পুরুষ। মাঝে মাঝে হাঁপানির টানে তাঁকে ধনুকের মতো বেঁকে যেতে হয়। কিন্তু তিনি যখন সোজা হয়ে দাঁড়ান, তার চোখের ভেতর থেকে যে দীপ্তি বেরিয়ে আসে, দেখলে মনে হয়, ওই বয়সে, ওই শরীরে তিনি বনের হিংস্র সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত। তাঁর ঠোঁট জোড়া পাতলা, দেখলে ঝুঁটি শালিকের কথা মনে পড়ে যায়। যখন কথা বলেন গলার স্বর গমগম করে বাজে।

আমাদের কথাবার্তা শুনে ডেইজি বেরিয়ে এলো। হাসলো আমাদের দু'জনকে দেখে। ফুলের মতো ম্লান সে হাসি। আমি প্রশ্ন করলাম, কেমন আছেন ? সে মাথা একদিকে কাত করে বললো, ভালো। আমি ডেইজির সঙ্গে শামারোখকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। ডেইজি শামারোখকে বললো, আপনি খুব সুন্দর। উনি, মানে দিলদার সাহেব, কয়েকদিন থেকে আপনার কথাই বলছেন শুধু। শামারোখ তার চিবুকটা স্পর্শ করে বললো, আপনিও কম সুন্দর নন। ডেইজি বললো, আপনারা গল্প করুন, আমি রান্নাটা শেষ করে আসি।

ডেইজির সঙ্গে দিলদার সাহেবের বয়সের তফাৎ কম করে হলেও চল্লিশ বছর। স্বভাবতই ডেইজির সঙ্গে এতো বেশি বয়সের একজন মানুষের বিয়ে হবার কথা নয়। অর্থ-সম্পদের লোভে যে সে দিলদার সাহেবকে বিয়ে করে নি সে তা তাদের ঘরকন্নার ধরনধারন এবং ঘরের চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি। এই অসম বয়সী দু'টি নারী-পুরুষ পরস্পরের মধ্যে এমন কি অমৃতের সন্ধান পেয়েছে দু'জন দু'দিক থেকে এই চরম আত্মত্যাগ করতে পারে ? নাকি দু'জনই পরিস্থিতির শিকার! ডেইজি নিচে মাদুর পেতে খাবার সাজাচ্ছিলো। দিলদার সাহেব শামারোখের সঙ্গে আধুনিক ইংরেজ কবিদের বিষয়ে আলাপ করে যাচ্ছিলেন। দিলদার সাহেব এমন খোশ-মেজাজে কথা বলে যাচ্ছিলেন যেন তিনি পরম সুখে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছেন। মানুষটা এতোটা দুর্ভোগের মধ্যেও এমন প্রাণ প্রাচুর্যে কিভাবে কথাবার্তা বলতে পারেন, সেটা আমার কাছে এক বিস্ময়ের ব্যাপার। আমি হঠাৎ করে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে জিগ্যেস করলাম, দিলদার ভাই, আপনার গাড়ি তো এখানে আনতে পারেন না। রাখেন কোথায় ? তিনি জবাব দিলেন, এগারো নম্বরের পেছনে এক বন্ধুর গ্যারেজে রেখে বাকি পথটা রিকশায় চেপে চলে আসি। তারপর তিনি আহত স্বরে বলে ফেললেন, ধানমন্ডির বাড়ি থেকে একমাত্র ওই গাড়ি এবং কিছু কাপড়-চোপড় ছাড়া আর কিছুই আনা হয় নি। গাড়িটা না থাকলে খোঁড়া হয়ে ওই অন্ধকূপের মধ্যে পড়ে থাকতে হতো। তাঁর এই একটা কথার ভেতর দিয়েই অনেক কথা বলা হয়ে গেলো।

আমরা খেতে বসলাম। ডেইজি রাঁধে চমৎকার। ছোট মাছ, ঘন করে মুগের ডাল বাচ্চা মুরগির ঝোলসহ রান্না করেছে। সঙ্গে শসার সালাদ। আমরা আরাম করে খেতে থাকলাম। না খেতে পেয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে। চোর-ছ্যাঁচোড়ে দেশ ভরে গেছে। স্কুল-কলেজে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা হচ্ছে না। রাস্তা-ঘাটে ডাকাত, হাইজ্যাকারদের ভয়ে

বের হওয়ার উপায় নেই। এসব নিয়ে কথা বলতে বলতে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, এই দেশটা কোন্ রসাতলের দিকে যাচ্ছে আমি তো ভেবে ঠিক থাকতে পারি নে। গত পরশু প্রধানমন্ত্রীর অফিসে গিয়ে এক ভিন্নরকমের ছবি দেখলাম। অসংখ্য তদবির করার মানুষ। প্রধানমন্ত্রীকে ঘন্টার পর ঘন্টা তাদের কথা শুনতে হচ্ছে। আমি হলে সব ব্যাটাকে গুলি করে দিতাম। আমার ইচ্ছে ছিলো প্রধানমন্ত্রীকে আমার নিজের কথাটাও বলবো, কিন্তু সবকিছু দেখেশুনে আমার মনটা এমন বিগড়ে গেলো যে, ঠিক করলাম, এ ধরনের মানুষদের কাছ থেকে আমি কোনো সুযোগ গ্রহণ করবো না।

আমি আর শামারোখ পরস্পর চকিতে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। তাহলে তিনি কি শামারোখের চাকরির বিষয়টা প্রধানমন্ত্রীর কাছে উত্থাপন করেন নি? দিলদার সাহেবের ঘ্রাণশক্তি খুবই প্রখর। তিনি মুহূর্তেই আমার মনোভাবটা আঁচ করে নিলেন, না না তোমাদের শঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। প্রধানমন্ত্রীর যতো অপূর্ণতা থাকুক বন্ধু-বান্ধবদের ব্যাপারে তাঁর মনে অঢেল মায়ামমতা। শামারোখের কথাটা সব খুলে বলার পর সঙ্গে সঙ্গে তিনি পিএস-কে দিয়ে ফোনে শরীফকে তলব করলেন। ধমকের চোটে শরীফের তো যায় যায় অবস্থা, শামারোখ তোমাকে কোনো চিন্তা করতে হবে না। এক হপ্তার মধ্যে ওরা তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠিয়ে দেবে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করার পর দিলদার সাহেব বর্তমান পরিস্থিতির ওপর যেসব কবিতা এবং গান লিখেছেন পড়ে শোনাতে লাগলেন। তাঁর সমস্ত গান এবং কবিতা পড়া শেষ হয়ে গেলে শামারোখ বললো, আর লেখেননি? দিলদার সাহেব বললেন, অনেক কিছু লিখেছি কিন্তু আজ আর শোনাবো না। তোমাদের তো ফেরত যেতে হবে। এ সমস্ত জায়গায় বেশি রাতে চলাফেরা করা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক।

শামারোখ ভেইজির কাছ থেকে বিদায় নিতে ভেতরে গেলো। এই ফাঁকে দিলদার সাহেব আমাকে বললেন, তোমার চাকরিবাকরির কিছু হলো? আমি মাথা নাড়লাম। তিনি আশঙ্কার সুরে বললেন, তুমি সেই একই রকম থেকে যাচ্ছো, দিনকাল পাল্টে যাচ্ছে, কিছু একটা করো। নয়তো ধরা খেয়ে যাবে। দেখছো না আমার অবস্থা। শামারোখ বেরিয়ে এসে বললো, আমি মাঝেমধ্যে যদি আপনার কাছে আসি, আপনি বিরক্ত হবেন? দিলদার সাহেব বললেন, মোটেই না। তোমার যখন ইচ্ছে হয়, চলে এসো। মুশকিল হলো, এতোদূর আসবে কেমন করে? শামারোখ বললো, সে দায়িত্ব আমার।

শামারোখের কাছে যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে যোগ দেয়ার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এলো, সে দিনটাকে আমার বিশেষ বিজয়ের দিন বলে ধরে নিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরা আমাকে এতোদিন যেভাবে করুণার পাত্র মনে করে এসেছেন, আমি সে রকম তুচ্ছ মানুষ নই। আমি প্রমাণ করে ছেড়েছি, একজন মহিলার বিরুদ্ধে তাঁদের সম্মিলিত নীরব প্রতিরোধ আমি অকার্যকর করতে পেরেছি। শামারোখকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা, এই অসম্ভবকে শেষ পর্যন্ত আমিই সম্ভব করলাম। এই কাজটাই করতে গিয়ে আমাকে কতো জায়গায় যে যেতে হয়েছে, আর কী পরিমাণ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। নীরব চেষ্টার ভেতর দিয়ে

একরকম একজন অসহায় মহিলাকে জীবনে এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে সাহায্য করলাম, এই ঘটনাকে একটা অসমযুদ্ধে জয়লাভ করা ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারলাম না। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি এই রকম একটি বড়ো কাজ করার জন্য কেউ আমার তারিফ করবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি, সব্বাই আমার দিকে এমন একটা ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন, আমি যেনো যজ্ঞের-বেদিতে একটা অপবিত্র পশুর লাশ এনে ফেলে দিয়েছি। তাঁরা বাধা দিয়েও শামারোখকে ঠেকাতে পারেন নি, সে জন্য তাঁরা তাঁদের পরাজয়ের গ্লানিটা আরো তীব্র-তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করছিলেন। এই জিনিশটাই আমার কাছে পরম উপভোগ্য মনে হচ্ছিলো। মনে মনে বলছিলাম, ভেবে দেখুন, কেমন গোলটা দিলাম!

সেদিনই সন্ধেবেলা একটা কাজ করে বসলাম। হাইকোর্টের মাজারের সামনে যে ফুলঅলা বসে, তার কাছ থেকে একটা জমকালো করবী ফুলের মালা কিনে আনলাম। তারপর ঘরে এসে ভালো করে জামা-কাপড় পরে নিলাম। বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দু' হাতে সেই হলুদ করবী ফুলের মালাটা নিজের গলায় ঝুলিয়ে দিলাম। তারপর আমাকে কেমন দেখায়, নানা ভঙ্গিতে তাকিয়ে তাই দেখতে লাগলাম। যুদ্ধজয়ী বীরের সঙ্গে নিজের তুলনা করে মনে মনে ভীষণ আনন্দ পেলাম। একাকী এই নীরব বিজয়োৎসব পালন করছি, কাজটা নিজের কাছেই একটু পরে আমার হাস্যকর মনে হলো। আবার ভালোও লাগলো। আমার নিজের কাজের মূল্য আছে, তার স্বীকৃতি অন্যেরা যদি দিতে কুণ্ঠিত হয়, আমি বসে থাকবো কেনো? কেউ না দেখুক, আমি তো নিজে আমাকে দেখছি। আমার ইচ্ছে হলো, এই অবস্থায় একবার ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরী, একবার ড. মাহমুদ কবিরের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। তাঁরা যদি জিগ্যেস করেন, জাহিদ আবার কি নতুন পাগলামো করলে, গলায় করবী ফুলের মালা কেনো? আমি জবাব দেবো, স্যার, আজই তো মালা পরার দিন। জানেন না শামারোখ আজ ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে কাজ করার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েছে। অথচ বাস্তবে আমি ঘরের চৌহদ্দি পেরিয়ে কোথাও গেলাম না। অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত দুঃখ প্রকাশের মতো অতিরিক্ত আনন্দও মানুষকে ক্লান্ত করে ফেলে। তাই ক্লান্তিবশতই জামা কাপড় এবং গলায় মালা-পরা অবস্থাতেই বিছানার ওপর নিজের শরীরটা ছেড়ে দিলাম। দরজা বন্ধ করতেও ভুলে গেলাম।

অধিক রাতে কামাল আমাকে ঘুম থেকে জাগালেন। সবচেয়ে ভালো জামা-কাপড় পরা অবস্থাতেই গলায় মালা দোলানো দেখে কামাল জিগ্যেস করলেন, জাহিদ ভাই, আপনার হয়েছে কি? মনে হচ্ছে বিয়ের আসর থেকে উঠে এসে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি বললাম, জানেন না কামাল কি হয়েছে? কামাল বললেন, জানবো কেমন করে, আজকাল আপনি তো কিছুই জানান না, সব কাজ একা-একাই করেন। আমি বললাম, আজ শামারোখ অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েছে। আমার উত্তরে কামালের কোনো ভাবান্তর দেখলাম না। কেবল বললেন, আমি ধরে নিয়েছিলাম, আপনি শামারোখকে সেজেগুজে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন, কোনো কারণে বিয়েটি ভেঙে যাওয়ায় মনের দুঃখে আপনি ঘরে এসে লম্বা নিদ্রা দিচ্ছেন। যাক বিয়েটি যে করে ফেলেন নি, সে জন্য আপনাকে

কংগ্র্যাচুলেট করবো। কামালের এই ধরনের মন্তব্য শুনে চট করে আমার মনে পড়ে গেলো, কোনো বিজয়ই নিরবচ্ছিন্ন বিজয় নয়। তার আরেকটি দিকও রয়েছে। সব বিজয়ের পেছনে একটি পরাজয় লুকিয়ে থাকে।

আরো একটি কারণে আমি একটুখানি আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছিলাম। সেই বিষয়টি বয়ান করি। শামারোখ আমার ঘরে এসে জানিয়েছে, আমি যেনো তাকে বিয়ে করি। এটা একজন সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক প্রস্তাব নয়। চোরের ভয়ে মানুষ যেমন এরন্ডা হাতে নেয়, শামারোখের বিয়ের প্রস্তাবটিও অনেকটা সেরকম। চারপাশ থেকে ধাক্কা খেয়ে মানুষ হাতের কাছে যাকে পায়, অবলম্বন করে বাঁচতে চেষ্টা করে, তেমনি শামারোখও আমাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়ে দাঁড়াবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করছে। আমি তাকে দাঁড় করাতে পারবো না; বরং নিজেই তলিয়ে যাবো। তাছাড়া আরো একটি কথা, শামারোখ আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে, একথা সত্যি বটে। তার আকর্ষণ করার সমস্ত উপাদান আছে। আমি যেমন আকর্ষণ বোধ করি, সেরকম তাকে যে-ই দেখে সবাই একইভাবে তার দিকে ঢলে পড়ে। অনেকদিন একসঙ্গে চলাফেরার পর আমার মনে এরকম একটি ধারণা জন্মেছে, শামারোখ জলসা ঘরের ঝাড় লণ্ঠনের মতো একজন মহিলা। একসঙ্গে অনেক মানুষের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়ার জন্যই তার সৃষ্টি হয়েছে। মোমের আলোর ক্ষীণ যে শিখা তার আলোয় একজন মানুষ তার ভেতরটা উপলব্ধি করতে পারে, শামারোখ সে রকম কেউ নয়। সে মানুষকে তার আপন অস্তিত্বই ভুলিয়ে দেয়। এই মহিলার মধ্যে একান্ত গোপনীয়, একজন ব্যক্তি যেখানে তার আপন স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে, সেরকম কোনো বস্তুর সন্ধান আমি পাই নি।

তারপরেও কথা থেকে যায়। শামারোখের শারীরিক সৌন্দর্য, শিল্পকলার প্রতি অনুরাগ, সরল-সহজ ব্যবহার এবং সহজাত সম্মানবোধ একজন মাত্র মহিলার মধ্যে এই এতোগুলো গুণের সমাবেশ জন্মের পর থেকে আমি কোথাও দেখি নি। এই রকম একজন মহিলা যখন আমার কাছে এসে অবলীলায় বলতে পারে, তুমি আমাকে উদ্ধার করো। আপাতত বিয়ে করাই হচ্ছে উদ্ধারের একমাত্র পথ। আমি তার প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে তার আত্ম সম্মানবোধ যে জখম করি নি, সে জন্য নিজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আমার অনেকখানিই বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করছে, এমন একজন অসহায় মহিলাকে যে তার নিজের পায়ের ওপর দাঁড় করাতে পারলাম, এই জিনিশটি আমার কাছে হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণের চাইতেও বেশি গৌরবের কাজ বলে মনে হলো। এখন শামারোখ ইচ্ছে করলে আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। সেই সুযোগটি আমি নিজেই তৈরি করে দিয়েছি। সুন্দর বস্তু পশুদের পায়ের তলায় পিষ্ট হতে দেখে বেদনা আমি অনুভব করে থাকি। আমি ধরে নিলাম, শামারোখের পায়ের তলার মাটিটির ব্যবস্থা করে দিয়ে আমি সুন্দরের মান রক্ষা করলাম।

দু'তিন দিন বাদে শিক্ষকদের লাউঞ্জে গিয়ে আমি মনে মনে মস্তরকম একটা চোট খেয়ে গেলাম। শামারোখের জন্য লড়াই করার পেছনে আমার ব্যক্তিক অহং কাজ করে নি, সে কথাটা সত্যি নয়। তারপরেও ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্যের মধ্যে যে বিরোধ,

প্রবলের উদ্ধত অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মধ্যে মানবিক মহত্ত্ববোধ প্রতিষ্ঠার মধ্যে যে একটি পৌরুষ রয়েছে, সেটাই আমি প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম। লাউঞ্জে গিয়ে দেখলাম ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরীর টেবিলের উল্টোদিকে বসে শামারোখ হেসে হেসে তাঁর সঙ্গে খোশ-গল্প করছে। আমার চট করে মনে হলো, সকলের সংগঠিত প্রতিরোধের মুখে শামারোখের চাকরিটি পাইয়ে দিয়ে আমি শুধু একটি মামলা জিতেছি মাত্র। মামলার পাল্টা মামলা আছে। আপিল আছে। আপিলের ওপর আপিল আছে। যে সমস্ত মহৎ অনুষঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করে আমি মনে মনে অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে উঠছিলাম, তার সঙ্গে এই চাকরি পাওয়ার বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নেই। এটা নেহায়েতই একটা মামুলি ব্যাপার।

শামারোখ ডিপার্টমেন্টে জয়েন করেই বুঝে গেছে ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরী এবং তাঁর দলের লোকদের সঙ্গেই তাকে কাজ করতে হবে। সুতরাং জয়েন করেই তার প্রথম কাজ দাঁড়িয়ে গেছে, তাকে চাকরি পেতে যারা বাধা দিয়েছিলেন তাঁদের সবাইকে সন্তুষ্ট করা। তাঁদের অমতে শামারোখ ডিপার্টমেন্টে জয়েন করতে পারলেও তাঁরা যদি বেঁকে বসেন, তা'হলে তার পক্ষে নিরাপদে কাজ করে যাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং তাঁদের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করাই হয়ে দাঁড়িয়েছে তার প্রথম কাজ। আমি কোণার টেবিলে বসে ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরীর সঙ্গে শামারোখের টুকরোটাকরা আলাপ শুনতে পাচ্ছিলাম। প্রতি কথায় সে ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরীর দিকে তার পদ্মপলাশ চোখ দুটো এমনভাবে মেলে ধরছিলো, আমার মনে হচ্ছিলো, একমাত্র এই মানুষটাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই ভুবনমোহিনী সৌন্দর্য নিয়ে শামারোখ জন্ম নিয়েছে। বুঝতে আমার কালবিলম্ব হলো না আমি জিতেও হেরে গেছি। এই ভণ্ড লোকদের সঙ্ঘবদ্ধ একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করার প্রয়োজনে কতো রকম হিল্লিদিল্লি করে শামারোখের এখানে আসার ব্যবস্থা করলাম। এখন শামারোখ নিজেও এই দুষ্ট-চক্রের একটি খুচরো যন্ত্রাংশে পরিণত হতে যাচ্ছে। আমার ভীষণ খারাপ লাগলো। সারা জীবন আমি আমার মেধা-প্রতিভা-শ্রম-সময় ভুল কাজে ব্যয় করে গেলাম। শামারোখকে যখন ডিপার্টমেন্টে কাজ করতে হবে, তাকে ঝাঁকের কই হয়ে ঝাঁকের সঙ্গেই মিশে থাকতে হবে। শামারোখের মধ্যে একটি শিকারি স্বভাব আছে আমি জানতাম। তাকে এইখানে যখন কাজ করতে হবে, তখন সবচেয়ে প্রবল প্রতিপক্ষটিকে তার সৌন্দর্যের অস্ত্রে ঘায়েল করে কাবু করতেই হবে। শামারোখ তার ডিপার্টমেন্টের লোকদের সঙ্গে পানিতে চিনির মতো মিশে যাবে। অথচ আমি সকলের শত্রু হয়ে রইলাম। খেলার এটাই নিয়ম। আমি ওই এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও দূরেটুরে চলে যেতে পারলে সবচাইতে ভালো হতো। কিন্তু সেটাই সম্ভব হচ্ছে না। আমার আশঙ্কা মিথ্যে হবে না, যে আগুন আমি জ্বালিয়ে তুলেছি, তার তাপ আমার শরীরে এসে লাগবেই।

প্রায় মাসখানেক পরে একদিন শামারোখ আমাকে তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলো। এই সময়ের মধ্যে তার সঙ্গে এক-আধবার দেখা হয়েছে, তবে বিশেষ কথা হয় নি। যতোবারই দেখা হয়েছে, বলেছে, খাটতে খাটতে তার জান বেরিয়ে যাচ্ছে। ক্লাস করা, টিউটোরিয়াল দেখা, সিলেবাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতিদিন নতুন করে প্রস্তুতি গ্রহণ

করতে তাকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন চাকরি পেলে মানুষ নিজের গুরুত্ব জাহির করার জন্য লম্বা-চওড়া যেসব বোলচাল ঝাড়ে, শামারোখকেও তার ব্যতিক্রম দেখলাম না। কিন্তু তার অসহায়ত্ববোধটা কেটে গেছে। আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সে কথাবার্তা বলছে।

শামারোখ জানালো আজ সে প্রথম মাসের মাইনে পেয়েছে। তাই আমাকে খেতে ডেকেছে। খেতে খেতে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের এতোসব খবরাখবর বলতে থাকলো শুনে আমি বিস্ময়ে থ হয়ে গেলাম। মাত্র একমাস সময়ের মধ্যে শামারোখ এতোসব সংবাদ সংগ্রহ করলো কেমন করে? আমি এই এলাকায় দশ বছরেরও বেশি সময় বসবাস করছি, অথচ তার এক-দশমাংশ খবরও জানি নে। কোন্ শিক্ষক ছাত্রীদের সঙ্গে নষ্টামি-ফষ্টামি করে বেড়ায়, কোন্ শিক্ষক বউকে ধরে পেটায়, কোন্ শিক্ষক বাড়ির কাজের মেয়ের সঙ্গে অকর্ম-কুকর্ম করে, কোন্ শিক্ষকের মেয়েকে স্বামী তালাক দিতে বাধ্য হয়েছে, কোন্ শিক্ষক জাল সার্টিফিকেট দেখিয়ে প্রমোশন আদায় করেছে—সব খবর তার নখদর্পণে। এক কথায় শামারোখ বিশ্ববিদ্যালয়ের যতো আধিব্যাধি আছে, তার এক সরস বর্ণনা দিলো।

এরই মধ্যে খাওয়া শেষ হয়ে এলো। খাওয়ার পর চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে মহিলা শিক্ষকদের সম্বন্ধে তার পর্যবেক্ষণের ফলাফলগুলো প্রকাশ করতে থাকলো। ইতিহাসের হামিদা বানু এতো জাঁহাবাজ মহিলা যে স্বামী বেচারাকে আলাদা বাসা করে থাকতে হয়। অর্থনীতির জিন্নাতুন্নেসা আস্তো থুথুরে বুড়ি, অথচ এমন সাজগোজ করে এবং এতো রঙচঙ মাখে দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়। সাইকোলোজির ফাহমিদা বেগমের ঘাড়টা জিরাফের মতো, অথচ ডাঁট কতো, মনে করে সে সবচাইতে সুন্দরী। কোদালের মতো দাঁত বের করে এমনভাবে হাসে দেখলে চোপাটা ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। শামারোখের সব রাগ দেখা গেলো পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জেবুন্নেসার ওপর। মহিলা হাইহিলে খুট খুট করে এমনভাবে আসে যেনো মাটিতে তার পা পড়ছে না। আর এমন নাসিক্য উচ্চারণে কথাবার্তা বলে যেনো এক্ষুনি এয়ারপোর্ট থেকে নেমেছে, এখনো লাগেজ-পত্র এসে পৌঁছায় নি। তারপর শাড়িটা কোমরে পেঁচিয়ে মহিলা কিভাবে হাঁটেন, অনুকরণ করে দেখালো। আমি বললাম, আপনার মহামূল্যবান অভিজ্ঞতার কথা আরেকদিন শোনা যাবে। আজ একটু কাজ আছে। শামারোখ বললো, আরে বসুন। এখন কি যাবেন। আমি বললাম, আপনাকে তো বলেছি, আমার একটা কাজ আছে। সে বললো, কাজ তো আপনার সব সময় থাকে। তার আগে আপনার পেয়ারের জহরত আরার কথা শুনে যান।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার মনে হলো, নিজের হাতে ছিপি খুলে আরব্যপোন্যাসের জীনটাকে মুক্ত করে দিয়েছি। এই তো সবে শুরু, সামনে আরো কতো দেখতে হবে, কে জানে! এই মহিলার মেটাল ডিস্টেট করার মতো একটা আলাদা ক্ষমতা আছে। প্রথম দৃষ্টিতেই কার কোথায় খুঁত আছে চট করে ধরতে পারে। একটা কথা ভেবে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। শামারোখের তো নানাবিধ গুণ রয়েছে। সেগুলোর

পরিশীলন করার বদলে মানুষের খুঁত আবিষ্কার করার কাজে এমন তৎপর হয়ে উঠবে কেনো ? আরো একটা কথা ভেবে শঙ্কিত হলাম যে মহিলা জহরত আরার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করলো কেমন করে ? তার দৃষ্টি থেকে কিছুই কি এড়াতে পারে না ?

জহরত আরা বয়সে আমার সামান্য বড়ো হবেন। অ্যানথ্রোপলজি ডিপার্টমেন্টে শিক্ষকতা করেন। অনেকদিন দেশের বাইরে ছিলেন। দেশের মধ্যে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথায় কি ঘটছে জানেন বলে মনে হয় না। অথবা জানলেও সেগুলোর মধ্যে জড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছে তাঁর বিন্দুমাত্রও নেই। মহিলা সব ধরনের ভজকট ব্যাপার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখেন। গবেষণা ইত্যাদি নিয়ে সময় কাটান। সব সময় দেখেছি মোটা মোটা খামে দেশের বাইরে টাইপ করা চিঠি পাঠাচ্ছেন। সব সময় রুমের মধ্যে আটক থাকেন। বেলা সাড়ে বারোটার দিকে লাউঞ্জে এসে হাসানাত সাহেবের সঙ্গে এক কাপ চা খান। পনেরো-বিশ মিনিট লাউঞ্জে কাটিয়ে বাড়ি চলে যান। জহরত আরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী থাকার সময় থেকেই হাসানাত সাহেবের প্রিয় ছাত্রী। হাসানাত সাহেবের বয়স যদি সত্তুর না হতো, বিশ্ববিদ্যালয়ের যা পরিবেশ জহরত আরার সঙ্গে তাঁকে জড়িয়ে নানারকম মুখরোচক গল্পের সৃষ্টি হতে পারতো। তার কারণ জহরত আরা নিজেও বিয়ে করেন নি। কেনো বিয়ে করেন নি, সেই সংবাদটি কেউ বিশদ করে বলতে পারে না। এমনকি ডিপার্টমেন্টের যেসব মহিলা সহকর্মী, যারা জহরত আরাকে রীতিমতো অপছন্দ করেন, তাঁরাও না। জহরত আরা কারো প্রেমে ব্যর্থ হয়ে কুমারী জীবন যাপন করছেন, কিংবা কারো প্রতীক্ষায় এমন একলা-একা জীবন কাটাচ্ছেন, সে খবর যদি জানা সম্ভব হতো, আমার ধারণা, অবশ্য অবশ্যই শামারোখের স্বয়ংক্রিয় মেটাল ডিক্টেটরে ধরা পড়ে যেতো।

চলাফেরা করার সময় জহরত আরার চারপাশে একটা গাম্ভীর্য বেষ্টন করে থাকে। সেটা ভেদ করে তাঁর কাছাকাছি পৌঁছুনো খুব সহজ ব্যাপার ছিলো না। আমি যদি সাহস করে বলি, জহরত আরার কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ আমার ঘটেছিলো, তাহলে খুব সম্ভবত মিথ্যে বলবো না। ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন হাসানাত সাহেব। আমি তাঁকে আমার লেখা একটা বই পড়তে দিয়েছিলাম। এই নাক উঁচু স্বভাবের ভদ্রমহিলা, যাঁর কাছে দেশের সবকিছু তুচ্ছ অথবা চলনসই, মন্তব্য জানতে চেয়ে পড়তে দিয়েছিলাম। তিনি দু'দিন পর তাঁর ডিপার্টমেন্টের পিয়ন দিয়ে আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, য়্যু আর এ্যাপ্রোচিং গ্রেটনেস। তারপর থেকে ফাঁক পেলেই মহিলার ঘরে যেতাম। তিনি আমাকে কোনোদিন ডাকেন নি। অথচ আমি যেতাম। কখনো তাঁর গাম্ভীর্যের আবরণ টলেছে এমন আমার মনে হয় নি। আমি ধরে নিয়েছিলাম, যে মানুষ গ্রেটনেসের পথে পা বাড়িয়েছে, তার এই গাম্ভীর্যের আবরণটুকু কেয়ার না করলেও চলে। মহিলা একদিনও আমাকে চলে আসতে বলেন নি।

জহরত আরাকে সুন্দরী মহিলা বলা ঠিক হবে না। তিনি ছিলেন বেঁটেখাটো ধরনের। মুখের ছিরিছাঁদও বিশেষ ছিলো না। মুখখানা ছিলো মঙ্গোলীয় ধাঁচের। কিন্তু নাকটা মঙ্গোলীয়দের মতো চ্যাপ্টা ছিলো না, স্বাবলম্বী দৃঢ়চিত্তের মহিলাদের মধ্যে যেমন মাঝে

মাঝে দেখা যায়, তাঁর নাকের নিচে খুব ভালো করে তাকিয়ে দেখলে সূক্ষ্ম একটা অবিকশিত গোঁফের রেখা লক্ষ্য করা যায়। তিনি মাথার ঠিক মাঝখানটিতে সিঁথি কেটে চুলগুলো পেছনে নিয়ে জোর করে খোঁপা বাঁধতেন। হাঁটার সময়ে দোদুল খোঁপাটা কেঁপে কেঁপে উঠতো। তাঁর মাথায় চুল ছিলো অঢেল। কানের গোড়ার দিকে কয়েকটি পাকা চুলের আভাসও দেখা যেতো। তিনি যখন হাঁটতেন, সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতেন। এ সময়ে দোদুল খোঁপাটা দুলে দুলে উঠতো। তাঁর পরনের শাড়ি, পায়ের জুতো, চলার ভঙ্গি সবকিছু গাম্ভীর্যের কঠোর অনুশাসন মেনে চলতো। একমাত্র মাথার দোল দোলানো খোঁপাটা মাঝে মাঝে চঞ্চলতা প্রকাশ করতো। জহরত আরার গায়ের রঙ ছিলো মাজা মাজা, শাদাও বলা যেতে পারে। কাঁধের পিঠের যে অংশ দেখা যেতো, তার থেকে কোনো জৌলুস ঠিকরে বেরোতো, একথা মোটেও বলা যাবে না। জহরত আরাকে সুন্দরী কিংবা অসুন্দরী এই অভিধায় ফেলে বিচার করা যাবে না। গায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত এক ধাতুতে গড়া প্রতিমার মতো—সবটাই জহরত আরা—সবটাই ব্যক্তিত্ব।

জহরত আরার এই যে একাকীত্ব এবং অটল ব্যক্তিত্ব, সেটাই আমাকে তাঁর কাছে টেনে নিয়ে যেতো। তিনি ঠোঁটকাটা স্বভাবের মহিলা ছিলেন। যেদিন হাতে কাজ থাকতো মুখের দিকে না তাকিয়েই বলে দিতেন, হাতে খুব কাজ, বসতে বলতে পারবো না। আজ তুমি এসো। যেদিন মহিলার সময় থাকতো, থুতনিতে মাথা রেখে চুপচাপ আমার কথা শুনে যেতেন। তিনি শুধু মাঝে মাঝে হুঁ-হাঁ করতেন। অনেকক্ষণ কথা বলার পর যখন বেরিয়ে আসতাম, মহিলার সঙ্গে কি বিষয়ে কথা বলেছি, একদম মনে করতে পারতাম না। নিজেকেই প্রশ্ন করতাম, তা'হলে এতোক্ষণ কি বকবক করলাম!

জহরত আরার কাছে এই যে যাওয়া-আসা করছি, তার পেছনে কোনো গূঢ় কারণ আছে কি না, নিজের কাছেও জিজ্ঞেস করতে পারি নি। আসলে জহরত আরার কাছে আমি কেনো যাই? শাদা কথায় ভালো লাগে বলেই যাই। কেনো ভালো লাগে কখনো ভেবে দেখি নি, কারণ ভেবে দেখার সাহস হয় নি।

শামারোখ খুব সহজে যখন পেয়ারের জহরত আরা শব্দটি বলে ফেললো আমার সচকিত না হয়ে উপায় রইলো না। আমি উঠি-উঠি করছিলাম, বসে পড়লাম। মহিলা আমার মনের গহনের এমন একটা জায়গায় ঘা দিয়ে বসে আছে, যা আমি অত্যন্ত নির্জন গোপন মুহূর্তেও উচ্চারণ করতে সাহস পাই নি, পাছে বাতাস বিশ্বাসঘাতকতা করে। মুখে কৃত্রিম হাসি টেনে এনে বললাম, অনেকের কথাই তো বললেন, জহরত আরা বাকি থাকবে কেনো? শামারোখ হাসতে হাসতে বললো, জানেন জাহিদ ভাই, আপনার পেয়ারের জহরত আরা যখন শাড়ির গোছাটা হাতে ধরে থপ থপ করে হেঁটে যায়, অবিকল একটা বাচ্চা হাতির মতো দেখায়। আমার খুব শখ হয়, এক জোড়া গোঁফ কিনে মহিলার মুখে লাগিয়ে দিই। একেবারে বেঁটেখাটো নেপালির মতো দেখাবে। এইরকম একজন মেয়ে মানুষ, যার যেখানে মাথা, সেখানে চোখ, যেখানে গাল, সেখানে নাক-মুখ-ঠোঁট, এমন একটি বদসুরত মেয়েমানুষের সঙ্গে আপনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটান কেমন করে?

খুব কষ্টে হেসে বললাম, খুব ভালো বলেছেন, বাকিটা আরেকদিন শুনবো, এখন যাবো।

শামারোখ বললো, খুব লেগেছে না!

আমি বললাম, লাগবে কেনো ?

১৯

মনস্তত্ত্ব জিনিশটাকে আমি ভীষণ ভয় পাই। যেসব মানুষ মনস্তত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করে পারতপক্ষে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করি। আমার মনে হয়েছে মনস্তত্ত্বের কারবারিরা নিজেরাই মানসিক রোগী। তাদের সঙ্গে বেশি ঘাটাপিটা করলে অন্যকেও তারা রোগীতে পরিণত না করে ছাড়ে না। একটি মানুষের কতো অংশ মন ? তার তো শরীর আছে, শরীরের শরীরসমাজ আছে। সবকিছু বাদ দিয়ে মন নিয়ে টানাটানি করলে যে জিনিশটা বেরিয়ে আসে, সেটা শূন্য। পেঁয়াজের খোসার পর খোসা উন্মোচন করতে করতে একেবারে শেষে কি থাকে, কিছুই না। এগুলো একজন আনাড়ির কথা। মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রের ওপর মতামত দেয়ার ক্ষমতা আমার থাকবে কেনো ? আমি শুধু নিজের মনোভাবটুকু প্রকাশ করলাম।

শামারোখের পাল্লায় পড়ে, এখন টের পেতে আরম্ভ করেছি, আমার ভেতর থেকে মনস্তত্ত্ব উঁকি মারতে আরম্ভ করেছে। আমি এই অক্টোপাশের থাবা এড়িয়ে যেতে পারছি নে। শামারোখ কখন কি কাজ কোন উদ্দেশ্যে করে, দাবার বোড়ের মতো একটার পর একটা চাল আমাকে সামনে রেখে যেভাবে প্রয়োগ করে তার ভেতরের উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুঝতে পারি। আমি শামারোখের কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাই। কিন্তু সেটি সম্ভব হচ্ছে না। মায় নে কমলিকো ছোড়নে মাংতা, মাগার কমলি নে হামকো নেহি ছোড়তা। উয়ো কমলি নেহি ভালুক হ্যায়। আমি শামারোখের বিষয়টা আমার তরফ থেকে যেভাবে চিন্তা করেছি, সেটা খুলে বলি। তাকে আমি তীব্রভাবে পছন্দ করেছি। এমন একটা সময়ও ছিলো, যদি শামারোখ বলতো, জাহিদ, তুমি পাঁচতলা থেকে লাফ দাও, আমি লাফ দিতাম। যদি বলতো, তুমি ছুটন্ত ট্রেনের ইঞ্জিনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ো, আমি একটি কথাও না বলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। যদি বলতো, তুমি আমার গৃহভৃত্য হিসেবে সারাজীবন কাটিয়ে দেবে, আমি নির্বিবাদে গৃহভৃত্যের অবস্থান কবুল করে নিতাম। কিন্তু শামারোখের সে ধরনের সরল আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন ছিলো না। তার প্রেমে অন্ধ হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে তীক্ষ্ণধার ছুরি দিয়ে হৃৎপিণ্ড কেটে তার পায়ের তলে অর্ঘ্য দেবে, সেটা শামারোখের কামনা ছিলো না এবং সেজন্য এখনো আমি বেঁচে রয়েছি।

এই এখন নিজের মধ্যে হাজার চেষ্টা করেও আমি সেই মুগ্ধ আবেশ সৃষ্টি করতে পারি নে। শামারোখ যখন আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করলো, আমি ভড়কে গেলাম।

আমার যদি তাকে ধারণ করার ক্ষমতা থাকতো, অবশ্যই আমি তাকে বিয়ে করতাম। শামারোখের মতো মূল্যবান শ্বেতহস্তী পুষবো, আমার তেমন গোয়াল কোথায়? আমি যে তাকে বিয়ে করতে রাজি হই নি, এটা আমার একান্তই দুঃখ-বেদনা এবং লজ্জার বিষয়। তার আত্মমর্যাদাবোধ যাতে আহত না হয়, সে জন্য তার প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে চেষ্টা-তদবির করে তার কাজটি জুটিয়ে দিয়েছি, যাতে তার ভালো-মন্দের সিদ্ধান্ত নিজে গ্রহণ করতে পারে এবং আমি একান্ত ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক দুঃখগুলোর প্রতি মনোযোগ দিতে পারি।

আমার মনে হচ্ছে শামারোখ তার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা এভাবে দেখতে চেষ্টা করেছে। তার জীবনের এক দুর্বলতম মুহূর্তে তার জীবনের একান্ত লজ্জা এবং পরাজয়ের কাহিনী আমার কাছে প্রকাশ করেছে। এটা সে এই বিশ্বাসে করেছিলো যে, শামারোখ ধরে নিয়েছিলো তার ভালো, তার মন্দ সবকিছু জেনে আমি তাকে বিয়ে করবো। তার প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে আমি তাকে যখন চাকরিটি পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করলাম এবং সেটা সে যখন পেয়ে গেলো, শামারোখ ভাবতে আরম্ভ করেছে আমি তাকে করুণা করেছি। আমার কাছে সব চাইতে দুঃখের ব্যাপার হলো আমার এই সাহায্যটুকু সে বন্ধুত্বের প্রতিদান হিসেবে গ্রহণ করতে পারছে না। শামারোখ তো আমাকে কম দেয় নি। এখন সে তার পথে যাক না কেনো। তার তো কোনো কিছুর অভাব থাকার কথা নয়। মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রের ওপর একবিন্দু দখল না থাকা সত্ত্বেও আমি শামারোখের মনের গতিবিধি 'ক্যাট' মানে যেমন 'বেড়াল' সে-রকম প্রাঞ্জলভাবে বুঝতে পারছি।

শামারোখ বিষয়টা খুব সম্ভবত এভাবেই চিন্তা করছে। সে আমাকে গোপন গহন লজ্জা এবং পরাজয়ের কথা বলেছে এবং গভীর আকাঙ্ক্ষাটির কথাও প্রকাশ করে ফেলেছে। আমি তাকে একটা অবস্থানে দাঁড়াতে সাহায্যও করেছি। সুতরাং সে ধরে নিয়েছিলো আঁচলে-বাঁধা-চাবির মতো আমাকে নিজের হাতে রেখে দেয়ার অধিকার আছে তার। তারপরে যখন তার পছন্দ হবে না ইচ্ছেমতো প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতাটুকুও সে নিজের হাতেই রেখে দিতে চায়। আমি তার উপকার করেছি অথচ তার কাছে বাঁধা পড়ি নি এই জিনিশটাকে সে ব্যক্তিগত পরাজয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। আমি যদি ওই এলাকায় না থাকতাম, তার সঙ্গে প্রতিদিন দেখা হবার অবকাশ না থাকতো, এ-ধরনের মর্জি ও মানসিকতা তার মধ্যে আদৌ জন্ম নিতো কি না, সন্দেহ।

দুঃখের কথা হলো আমি এই এলাকায় বাস করছি, প্রতিদিন তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হচ্ছে এবং সে নিজের চোখে দেখছে নানা মহিলার সঙ্গে আমার যোগাযোগ রয়েছে। তাদের কারো ঘরে বসে আলাপ করছি, কারো বাড়িতে যাচ্ছি। শামারোখ মনে করছে এই মহিলাদের কারো-না-কারো সঙ্গে আমার হৃদয়ের ব্যাপারস্যাপার আছে। আর এই কারণেই আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে আসার চেষ্টা করছি। শামারোখ সঠিক ধরতে পারছে না কার সঙ্গে কি ধরনের সম্পর্ক আমার আছে এবং শোধ নেয়ার ঠিক ঠিক কর্মপন্থাটি গ্রহণ করতে পারছে না বলেই আমাকে ডানে-বামে আক্রমণ করার পাঁয়তারা

করে যাচ্ছে। সে জীবনে পরাজিত হয়েছে একথা আমার কাছে বলেছে। এখন মনে করতে আরম্ভ করেছে আমার কাছে তার আরেকটা পরাজয় হলো। যে সমস্ত মহিলার সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে তাদের কেউই কোনোদিক দিয়ে তার চাইতে যোগ্য নয়। শারীরিক সৌন্দর্যে বলুন, লেখাপড়ায় বলুন, রুচি এবং সুকুমার উপলব্ধিতে বলুন, এই মহিলাদের সবাই শামারোখের চাইতে খাটো। সুতরাং একমাত্র শামারোখ ছাড়া অন্য কারোও সঙ্গে আমার কোনো রকম সম্পর্ক থাকবে কেনো? অবশ্য শামারোখের সঙ্গে অন্য পুরুষ মানুষের যদি সম্পর্ক হয়, সেটা মোটেই ধর্তব্যের নয়। কারণ শামারোখ অপরূপ মহিলা। সুন্দরী গুণবতী নারীর প্রতি তো পুরুষ মানুষেরা আকৃষ্ট হবেই। এতে শামারোখের দোষ কোথায়? জ্বলন্ত আগুনে যে পোকারা ঝাঁপ দিয়ে মরে তাতে কি আগুনের অপরাধ আছে? কারণ পোকাদের ভাগ্যই আগুনে পুড়ে মরা। শামারোখকে সব দিক দিয়ে সেকালের রানীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। রানী কি মনের মধ্যে কোনো ধরনের হীনম্মন্যতাবোধ লালন করে রানীগিরি টিকিয়ে রাখতে পারেন?

আমার দৃঢ় ধারণা, আমি যে তাকে সাহায্য করেছি এই ব্যাপারটিকে মানুষ করুণা এবং অনুকম্পাবশত যেমন পতিতা উদ্ধার করে কিংবা দুঃস্থ মহিলাদের সমাজে পুনর্বাসিত করে, সেভাবে সে বিচার করছে। শামারোখ পতিতা নয়, দুঃস্থাও নয়। অথচ আমি যখন অন্য মহিলাদের সঙ্গে আলাপসালাপ করছি, তীক্ষ্ণ মর্মবেদনায় অনুভব করছে, আমি তাকে করুণার পাত্রী হিসেবে দেখছি। এখানেই যতো সমস্ত গণ্ডগোলের উৎস। একদিনের একটি ঘটনার কথা বলি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা কি একটা ব্যাপারে হরতাল ডেকেছে। গোলাগুলির আশঙ্কায় ছাত্র-ছাত্রীদের বেশির ভাগই সকাল সকাল ঘরে চলে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে ফাঁকা। আমি জহরত আরার কাছে একটি ধার-করা বই ফেরত দিতে গিয়েছি। জহরত আরার ঘরে গিয়ে দেখি তিনি অন্য একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছেন। আমাকে দেখে বললেন, জাহিদ, তুমি একটু বাইরে অপেক্ষা করো। আমি তখন জহরত আরার ঘরের সামনে সিগারেট জ্বালিয়ে দেয়ালে নোটিশ বোর্ড দেখছি। নোটিশ বোর্ডে কি দেখবো আমি? আসলে সময়টা পার করছিলাম মাত্র। হঠাৎ পিঠে কার হাতের স্পর্শে চমকে উঠলাম। তাকিয়ে দেখি শামারোখ। শামারোখ আমাকে এভাবে আবিষ্কার করবে আমি ভাবতে পারি নি। সে জিগ্যেস করলো, এখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন? আমি বললাম, আপার কাছ থেকে একটা বই ধার করেছিলাম, ফেরত দিতে এসেছি। শামারোখ বললো, টসটসে রসগোল্লার মতো রাক্ষুসী মহিলাদের কাছে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আপনার কি কোনো কাজ নেই? লাজলজ্জাও আপনার কম। সে সময়ে জহরত আরা তাঁর মহিলা অতিথিকে বিদেয় দিতে ঘরের বাইরে এসেছিলেন। কথাগুলো তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। হে ধরণী দ্বিধা হও—মনে মনে উচ্চারণ করলাম।

আমার শিক্ষিকা তাহমিনা খানের কাছ থেকে আমি কিছু টাকা ধার করেছিলাম। অনেক দিনের পুরনো ঋণ। শোধ করবো-করবো করেও করা হয় নি। অতো টাকা এক সঙ্গে জড়ো করা সম্ভব হয় নি। এই ঋণটার জন্য তাহমিনা খানের কাছে আমার মুখ দেখানো সম্ভব হচ্ছে না। সেদিন আমার প্রকাশক আমার বইয়ের রয়্যালটি বাবদ কিছু টাকা

দিয়ে গেলেন, আমি স্থির করলাম, প্রথমেই তাহমিনা ম্যাডামের ঋণটা শোধ করবো। টাকাটা যদি রেখে দিই অন্য কাজে খরচ করে ফেলবো। সুতরাং টাকাটা শোধ করতে ছুটলাম। সকালের দিকে তাঁর ক্লাশ থাকে, ডিপার্টমেন্টে অথবা তাঁর ঘরে নিশ্চয়ই পেয়ে যাবো।

তাহমিনা ম্যাডামের কথা সামান্য পরে বলবো। তার আগে ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরী সম্পর্কে একটা মজার কথা বলে নিই। শুধু আমি নই, এ পাড়ার সকলেই জানেন, ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরী প্রবন্ধ-ব্যাকরণের মতো মানুষ। তাঁর রসবোধ অল্প। অথচ তিনি মাঝে মাঝে রসিকতা করেন না, এমন নয়। কিন্তু সেগুলো এমন বানিয়ে তোলা যে তাতে রসের ভাগ থাকে নিতান্ত অল্প, খিস্তির ভাগ থাকে বেশি। কিন্তু এইবার একটি কাজ করে তিনি যে সত্যি সত্যি রসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে কারো কোনো দ্বিমত নেই। তিনি দুই তারকা-শিক্ষিকা শামারোখ এবং তাহমিনা খানকে একই রুমে বসবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যৌবনে তাহমিনা খানও ছিলেন অসামান্য সুন্দরী। ভালো ছাত্রী, ভালো বাংলা গদ্য লিখতেন এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। সবকিছু মিলিয়ে তাঁর আলাদা একটা ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিলো। তিনি নিজের সম্পর্কে যা ভাবতেন, অন্যদেরও সেরকম ভাবতে বাধ্য করাতে পারতেন। কারণ তার চরিত্রের তেজ এবং দৃঢ়তা দুই-ই ছিলো। কিন্তু তারপরেও একটা পাগলামো ভাব তাঁর মধ্যে বরাবর ছিলো। সেটা একটুও বেমানান ছিলো না। প্রতিভাময়ী, সুন্দরী এবং ধনী বংশের মেয়েদের এরকম একআধটু পাগলামো থাকলে খারাপ তো দেখায় না, বরং সেটাকেই বাড়তি গুণ হিসেবে বিবেচনার মধ্যে ধরা হয়। মধ্য বয়সে এসে তাহমিনা ম্যাডামের সৌন্দর্যের দীপ্তি ম্লান হয়ে এসেছে, যৌবনে ভাটা পড়েছে কিন্তু পাগলামোর পরিমাণ কমে নি।

শামারোখ এবং তাহমিনা খানকে যখন একই রুমে বসার ব্যবস্থা করে দেয়া হলো, আমরা তখন প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একটা করে ছোটোখাটো দুর্ঘটনার সংবাদ পেতে আরম্ভ করলাম। দু'জনের মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ চলতে থাকলো। দোষ কার সে বিচারের চাইতেও দুই সুন্দরীর মধ্যবর্তী বিরোধের সংবাদ সবাই আনন্দসহকারে উপভোগ করছিলেন। শামারোখ এবং তাহমিনা খান দু'জনের কেউ হারবার পাত্রী নন। দু'জনে দু'দিক দিয়ে শক্তিমান। তাহমিনার রয়েছে প্রতিষ্ঠা। আর অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রফেসর হয়ে যাবেন। শামারোখের চাকরিটি এডহক বেসিসে হলেও তার শরীরে এখন ভরা যৌবন এবং বিবাহ-ছিন্ন কুমারী মহিলা। বেলা এগারোটার সময় আমি তাহমিনা ম্যাডামের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলাম, তিনি বসে বসে টিউটোরিয়ালের খাতা দেখছেন। এখনো শামারোখ আসে নি। আমি মনে করলাম, ভালো সময়ে আসা গেছে। শামারোখ আসার আগে তাড়াতাড়ি কেটে পড়া যাবে। আমি সালাম দিলাম। ম্যাডাম আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, অ জাহিদ, কি মনে করে, বসো। আমি টাকাটা গুণে টেবিলে রেখে বললাম, ম্যাডাম টাকাটা দিতে অনেক দেরি হয়ে গেলো। তিনি খাতা দেখতে দেখতেই বললেন, আজকাল বুঝি তোমার অনেক টাকা, চাকরিবাকরি তো করো না, কোথায় পাও টাকা, কে

দেয় ? এই ম্যাডামটি এরকমই। আমি অপেক্ষা করছিলাম আগে ম্যাডামের রাগটা কমুক।

এই সময়ে ঘরে ঢুকলো শামারোখ। আমাকে দেখেই বলে ফেললো, জাহিদ ভাই, কখন এসেছেন ? এদিকে আসুন। তাহমিনা ম্যাডাম হাতের খাতাটা বন্ধ করে শামারোখের দিকে একটা অগ্নিময় দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, জাহিদ আমার এখানে এসেছে। ওখানে যাবে না। সে আমার ছাত্র। চুপ করে বসে থাকো জাহিদ, একচুলও নড়বে না। শামারোখ গলার স্বর আরেকটু চড়িয়ে বললো, আপনার ছাত্র, তাতে কি ? উনি এসেছেন আমার কাছে, জাহিদ ভাই এদিকে চলে আসুন। কি করবো বুঝতে না পেরে আমি শুধু ঘেমে যাচ্ছিলাম। শামারোখ আমার একটা হাত ধরে টান দিয়ে বললো, এদিকে চলে আসুন। অন্য হাতটা ধরে তাহমিনা ম্যাডাম বললেন, তোমাকে না নড়তেচড়তে নিষেধ করেছি। আমি তোমার টিচার, আমাকে ইনসাল্ট করো না। এটা সত্যি সত্যি সঙ্কটের মুহূর্ত। আমি কোন্‌দিকে যাই! ঠিক এই সময় একটা কাজ করে বসলাম আমি। এক ঝটকায় দু' মহিলার হাত থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিয়ে জোরে হেঁটে একেবারে আর্টস বিল্ডিংয়ের বাইরে চলে এলাম।

এই ঘটনাটি গোটা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নানারকম শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে এমনভাবে ছড়িয়ে গেলো, আমার মুখ দেখাবার কোনো উপায় রইলো না। আসল ঘটনা যা ঘটেছিলো এবং যা প্রচারিত হয়েছিলো, দুয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক। একদিন আমি ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ির পাশে দিয়ে যখন হেঁটে যাচ্ছিলাম, আমার অপর শিক্ষিকা মিসেস রায়হানা হক বিপরীত দিক থেকে হেঁটে আসছিলেন। এই একরোখা মহিলাকে আমি বাঘের চাইতে বেশি ভয় করি। তিনি আমাকে রাস্তার একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন, আচ্ছা জাহিদ, তোমার লাজলজ্জার বালাই কি একেবারেই নেই ? ধর্মের ষাঁড়ের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছো এবং উল্টোপাল্টা কাহিনীর জন্ম দিচ্ছো। আরেকদিন যদি ইংরেজি ডিপার্টমেন্টের ধারেকাছে তোমাকে দেখি, তাহলে, সবার সামনে তোমাকে জুতোপেটা করে ছাড়বো। তখন তোমার শিক্ষা হবে। কথাগুলো বলে তিনি গট গট করে চলে গেলেন। আমার ইচ্ছে হলো দু' হাতে মাথা ঢেকে সেখানে বসে পড়ি।

এ ক'মাসে আমি সবার আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়ে উঠেছি। এটাই শামারোখের প্রত্যক্ষ অবদান। নিচের দিকের ছাত্রেরা আমার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। জুনিয়র শিক্ষকেরা ঈর্ষা করেন। শামারোখের মতো অনিন্দ্য সুন্দরী এবং বিদুষী মহিলাকে আমি পেছন পেছন ঘোরাচ্ছি, কি আছে এমন আমার। আমি সুদর্শন চেহারার অধিকারী নই। চাকরি নেই বাকরি নেই, একেবারে অসহায় মানুষ আমি। শামারোখ আমার মধ্যে কি দেখতে পেয়েছে! এরকম কথা সবাই বলাবলি করতো। এই ধরনের প্রচারের একটা মাদকতার দিক তো অস্বীকার করা যায় না। আমার টাকা নেই, পয়সা নেই, রূপ নেই, গুণ নেই, তারপরও আমি মনে করতে থাকলাম, আমার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যার কাছে বাড়ি-গাড়ি, টাকা-বিদ্যে-বুদ্ধি সব হার মেনে যায়। সে হলো আমার পৌরুষ। কখনো কখনো নির্জন মুহূর্তে আমি নিজেকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন

পুরুষ মনে করতাম। সুন্দর মহিলাদের কেনো পণ্যের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয়, তার হেতু আমি এখন বুঝতে পারছি। একমাত্র সুন্দরের বাতাবরণের মধ্য দিয়ে মিথ্যেকে সত্যে রূপান্তরিত করা যায়। তরুণ মেয়েরা যেচে আমার সঙ্গে আলাপ করতে আসতো। কখনো কখনো মনে হতো মেঘেতে গিয়ে ঠেকেছে আমার মস্তক।

এদিকে কি দশায় আমি এসে দাঁড়িয়েছি সে বিষয়ে একটু ধারণা দিতে চেষ্টা করি। বজলুর মেসে তিন মাসের খাওয়ার বিল আমি শোধ করতে পারি নি। বজলু খাবার বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে। বালিশ, বিছানার চাদর, মশারি ইত্যাদি চরম দফায় এসে পৌঁছেছে। বাড়ি থেকে ক্রমাগত টাকার তাগাদা জানিয়ে চিঠি আসছে। আমি এখন কি করি, আমাকে নিয়ে নানা রঙিন কাহিনী তৈরি হচ্ছে। অথচ আমার নাশতা কেনার পয়সা নেই। গুরুজনদের সামনে দাঁড়াতে পারছি নে। তাঁদের সবাই দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে যেতে পারি নে, তাঁরা আমাকে ঈর্ষা করেন। এক সময়ে আমি সাহস করে বলতাম, শামারোখ যদি বলে তার পেছন পেছন পৃথিবীর অপর প্রান্ত অবধি ছুটে যাবো। পৃথিবীর অপর প্রান্তে চলে যাওয়াটাই বোধহয় আমার জন্য ভালো ছিলো। আমাকে অসংখ্য জিজ্ঞাসু দৃষ্টির বিরাগভাজন হয়ে এমন করুণ জীবন যাপন করতে হতো না। শামারোখের কল্যাণে এখানে আমি যে জায়গাটায় এসে দাঁড়িয়েছি তার নাম সীমাহীন শূন্যতা। নামতেও পারি নে, উঠতেও পারি নে। হাজার জনতার মাঝখানেও এমন নিঃসঙ্গ জীবন একজন মানুষ কেমন করে যাপন করে?

মেয়েদের হোস্টেলে সুলতানা জাহান হাউস টিউটরের কাজ করে। সে আমাকে ভাই বলে ডাকে। ছ' মাসও হয় নি বেচারির স্বামীটি খুন হয়েছে। তার তিনটি বাচ্চা। তার এতো সময় এবং সুযোগ কোথায় যে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার হৃদয় দহন, স্খলন, পতন, কেলেঙ্কারি এসবের দিকে মন দেবে। আমি প্রায় দিন সন্ধেবেলা সুলতানার বাড়িতে যাই। তার বাচ্চাদের সঙ্গে খেলাধুলো করে সময় কাটিয়ে আসি। আমিও এক ধরনের স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগছিলাম। ক্রমাগত উত্তেজনা থেকে উত্তেজনার মধ্যে নিজেকে ছুঁড়ে দিয়ে নিজের ওপর একরকম নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসেছিলাম। সুলতানার বাসাতে যখন যেতে আরম্ভ করি, তার শিশুদের সঙ্গে যখন সময় কাটাতে থাকি, যখন এই দুঃখী গরিব সংসারের হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাবের দিকে দৃষ্টিপাত করতে থাকি, আমি অনুভব করলাম, আমার ভেতরে একটা প্রশান্তির রেশ ফিরে আসছে। এই দুঃখী বোনটির প্রতি মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছিলো। তাকে অর্থ-কড়ি দিয়ে সাহায্য করবো, এমন ক্ষমতা আমার কোথায়? তবু তার বাড়িতে এটা-ওটা নিয়ে যেতাম। কখনো বাচ্চাদের খেলনা, কখনো কোনো খাবার কিংবা মওসুমের নতুন ফল। বাচ্চারা এই সামান্য জিনিশ পেয়ে কী যে খুশি হয়ে উঠতো! তাদের খুশিতে আমি নিজেও খুশি হয়ে উঠতাম। সুলতানার বাড়িতে আমি প্রায় ন'টা অবধি থাকতাম। না খাইয়ে সুলতানা আমাকে আসতে দিতো না।

একদিন সুলতানার বাড়ি থেকে বেরিয়ে হোস্টেলের গেট অবধি এসেছি, পেছন থেকে ডাক শুনলাম, দাঁড়ান। বুঝতে পারলাম, শামারোখ। সে কি এই হোস্টেলে থাকতে আরম্ভ করেছে? বুঝলাম সুলতানার বাড়িতে আসাও আমার বন্ধ করতে হবে। একদিন সুলতানার

বাড়ি থেকে ফিরতে রাত এগারোটা বেজে গিয়েছিলো। কারণ সুলতানার ওখানে দেশের বাড়ি থেকে কিছু আত্মীয়-স্বজন এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে গল্পগাছা করতে করতে এতোটা রাত পার করে ফেলেছি. সেদিকে খেয়ালও করি নি। সিঁড়ি থেকে যখন পথে নামলাম অমনি কারেন্ট চলে গেলো। পথঘাট ঘুটঘুটে অন্ধকার। পা ফেলা দায়। শামারোখের কণ্ঠস্বর শুনলাম, এই অন্ধকারে আপনি যাবেন কেমন করে ? আমি বললাম, যেতে পারবো। কিন্তু আপনি এই অন্ধকারের মধ্যে কি করছেন ? শামারোখ খিলখিল করে হেসে উঠলো। মনে হলো বোতল ভাঙা কাচের মতো তার হাসির রেশ অন্ধকারকে বিদ্ধ করলো। সে বললো, জানতে চান, আমি কি করছি ? এতো রাতে এই বিধবা মহিলার বাড়িতে কি করেন, জানার জন্য পাহারা দিচ্ছি। আমার ইচ্ছে হলো চড় বসিয়ে দিই। তারপরের সপ্তাহে সুলতানার বাড়িতে যখন গেলাম, সে হাতজোড় করে জানালো, জাহিদ ভাই, আপনি আমাদের এখানে আর আসবেন না। মুখটা ফিরিয়ে সে কেঁদে ফেললো।

শিক্ষকদের লাউঞ্জে যাওয়া আমাকে একরকম ছেড়ে দিতে হয়েছে। তবু মাসের তিন তারিখে আমাকে যেতে হলো। চেয়ারম্যানের খোঁজে আমি ডিপার্টমেন্টে গিয়েছিলাম। কারণ তিনি ফর্মে সই না করলে আমি স্কলারশিপের টাকা ওঠাতে পারবো না। পিয়ন জানালো, তিনি অফিসে নেই, তবে লাউঞ্জে থাকতে পারেন। আমি তাঁর খোঁজে লাউঞ্জে গেলাম। দেখলাম তিনি ওখানেও নেই। মহা ফাঁপড়ে পড়ে গেলাম। আজকেই আমার টাকাটা ওঠানো প্রয়োজন। আমি টাকাটা না দিলে বজলু রেশন তুলতে পারবে না। চেয়ারম্যান সাহেবকে কোথায় পাওয়া যায় খোঁজ করে দেখা প্রয়োজন।

আমি বেরিয়ে আসছিলাম। কিন্তু কামাল পথ আটকালেন, জাহিদ ভাই, পালাচ্ছেন কোথায় ? আমি বললাম, পালাচ্ছি না। একটু কাজ আছে। কামাল বললেন, আপনার যে এখন অনেক কাজ সে তো আমরা জানি। কিন্তু আমাদের খাওয়া কোথায় ? আমি বললাম, কিসের খাওয়া ? তিনি বললেন, বা রে আপনি বিয়ে করবেন আর আমাদের খাওয়াবেন না! পেছেয়েনটা কি ? আমি জানতে চাইলাম, কোথায় শুনেছেন আমার বিয়ে হয়েছে। তিনি বললেন, শোনাশুনির মধ্যে নেই, যাঁকে বিয়ে করেছেন তিনিই বলেছেন। আমি বললাম, ওই তিনিটা কে ?

আর কে ? আমাদের সুন্দরী শ্রেষ্ঠা বেগম শামারোখ।

কথাটা শুনে আমি কেমন থতোমতো খেয়ে গেলাম। শামারোখটা কি ? সে কি পাগল, না মতলববাজ ? আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছে না তো ? আমি দেখলাম এই সময় ময়ূরের মতো পেখম মেলে শামারোখ লাউঞ্জে ঢুকছে। আমি স্থানকালের গুরুত্ব ভুলে গিয়ে শামারোখকে ডাক দিলাম, এই যে শামারোখ, শোনেনতো। শামারোখ অনেকটা উড়তে উড়তে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। আজ তার মনে খুব ফুর্তি। আমি বললাম, সুসংবাদটা আমি এই এক্ষুনি পেলাম। আপনি একেবারে না জানিয়ে যে আমাকে বিয়ে করে বসলেন, কাজটা ঠিক হয় নি। অন্তত খবরটা আমাকে জানানো উচিত ছিলো। কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে আমি চেয়ারম্যান সাহেবের খোঁজে বেরিয়ে গেলাম। কোথাও তাঁকে

না পেয়ে ঘরে এসে নিজেকে সটান বিছানায় ছুঁড়ে দিলাম। আজ টাকা না দিলে বজলু খাবার দেবে না বলেছে।

আমার চোখে তন্দ্রার মতো এসেছিলো। ভেজানো দরোজা খোলার আওয়াজ পেলাম। চেয়ে দেখি শামারোখ। তার মুখ লাল, চোখ দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। অনেকটা চিৎকার করেই বললো, এতোগুলো মানুষের সামনে আমাকে অপমান করার সাহস আপনার হলো কেমন করে? আমি বললাম, আমাকে না জানিয়ে একেবারে বিয়ে করার সাহস কি করে আপনি পেলেন, আগে বলুন। সে বললো, আপনি একটা শয়তান। আমি এক্ষুনি মজা দেখাচ্ছি। এক্ষুনি আমি দোতলা থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ছি। তখন বুঝবেন মজা। সে রেলিংয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তার এই হুমকির মুখে আমার মনে কৌতুকবোধ চাড়া দিয়ে উঠলো। আমি চেয়ারটা রেলিংয়ের গোড়ায় এগিয়ে দিয়ে বললাম, এই চেয়ারে ভর দিয়ে রেলিংয়ের ওপর দাঁড়ান। তারপর শরীরটা ওপাশে ছুঁড়ে দিন। সে এক কাণ্ড হবে। মজা আমি একা নই রাস্তায় যেসব ছাত্র যাওয়া-আসা করছে, তাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললাম, তারাও দেখবে। আপনার ভেতরের সুন্দর থেতলে যাওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবার সঙ্গে আমিও দেখতে পারবো। দাঁড়িয়ে কেন, দিন, লাফ দিন।

শামারোখ রেলিংয়ের গোড়া থেকে সরে এসে আমার পেছন পেছন ঘরে ঢুকে বলতে লাগলো, আপনি একটা বদমাশ, লুচ্চা। ঈসরত আরার সঙ্গে কি করেন, আধারাত সুলতানার বাড়িতে কী রকম আসনাই করে কাটান, আজ সব বলে দেবো। একেবারে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবো। আমি বললাম, প্রথম যে কাজটা করতে চেয়েছিলেন সেটার চাইতে একটু খারাপ। তবু মন্দ না, দিন হাটে হাঁড়ি ভেঙে। সে ছুটে এসে আমার বাহুমূলে একটা কামড় বসিয়ে দিলো। আমি একটা মশারির স্ট্যান্ড ভেঙে তাই দিয়ে তাকে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিলাম। ঠিক কোন্ সময়ে কোন্ উপলক্ষে শাহরিয়ারের সঙ্গে শামারোখের পরিচয় হয় আমি বলতে পারবো না। শাহরিয়ার তখন সবে আমেরিকা থেকে এসেছে। ওখানকার ডাক্তারেরা তার রোগের কেমন চিকিৎসা করেছেন, সম্পূর্ণ নিরাময়ের সম্ভাবনা আছে কি না, আমি কোনো কিছু জানি নে। শুধু সংবাদপত্রের খবর থেকে জানতে পেরেছি, আমেরিকা থেকে চিকিৎসা করিয়ে শাহরিয়ার দেশে ফিরেছে।

শাহরিয়ারের বর্তমান অবস্থা কেমন, সে কোথায় থাকছে এসব খবরও আমাকে কেউ জানায় নি। আর আমারও এতো ব্যস্ত সময় কাটছে, নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে তার ব্যাপারে তত্ত্বতালাশ করার কোনো অবকাশ হয় নি। একদিন কোনো একটা পত্রিকায় শাহরিয়ারের একটা কবিতা পড়লাম। পড়ে চমকে গেলাম। এই রকম একটা কবিতা শাহরিয়ারের কলম থেকে বেরুলো কেমন করে? কবিতাটি পড়ার পর আমার চেতনায় একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলে গেলো। কবিতাটি বার বার পড়তে হলো। শাদা চোখে দেখলে এটাকে প্রেমের কবিতা বলতে হবে এবং শাহরিয়ারও একজন মহিলাকে উদ্দেশ্য করে কবিতাটি লিখেছে। কবিতার বাক্যকে ছাড়িয়ে আরো একটা গভীর অর্থময়তা আমার চেতনার দুয়ারে দুয়ারে টোকা দিতে থাকলো। কবিতাটি উদ্ধৃত করতে পারলে ভালো

হতো। কিন্তু আমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল। তাই উদ্ধৃত করা গেলো না। একটি বিষাদের ভাব আমার মনে চারিয়ে গেলো। শাহরিয়ার কাকে উদ্দেশ্য করে কবিতাটি লিখেছে? সে কি কোনো নারী—না তার মৃত্যু? মৃত্যু কেনো সুন্দরী নারীর মূর্তি ধরে এমন শোভন সুন্দর বেশে তার কবিতায় এসে দেখা দিলো!

সেই মুহূর্তে শাহরিয়ারকে এক ঝলক দেখার আকাঙ্ক্ষা, তার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে আমার মনে তীব্র হয়ে উঠলো। শাহরিয়ারের সঙ্গে আমার এমন কোনো গভীর সম্পর্ক আছে, সে কথাও ঠিক নয়। আমাকে শাহরিয়ার বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না। লোকজনের সামনে আমাকে অপদস্থ করতেও তার বাধে না। সে আমার চাইতে বয়সে ছোটো। শাহরিয়ার এই বয়সের ব্যবধানের কথা ভুলে গিয়ে আমাকে আক্রমণ করতো। বয়সে বড়ো হওয়ার এই এক দোষ। কম বয়সী কেউ আক্রমণ করলে পাল্টা আক্রমণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আবার আঘাতটাও বুকে বাজে। এই ধরনের বিদ্ঘুটে পরিস্থিতির মুখোমুখি যাতে না হতে হয়, সে জন্য আমি শাহরিয়ারকে এড়িয়ে চলতাম। আমার সম্পর্কে শাহরিয়ার যাই-ই মন্তব্য করুক না কেনো আমি জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করতাম না। আমি জানতাম, আসলে এগুলো তার নিজের কথা নয়। যেসব মানুষের সঙ্গে ইদানীং তার চলাফেরা শাহরিয়ার তার নিজের মুখ দিয়ে তাদের কথাই প্রকাশ করছে। এমনও সময় গেছে মাঝে মাঝে শাহরিয়ারের সঙ্গে আমার দু' তিনমাসও দেখা হয় নি। এই অদর্শনের সময়টিতে শাহরিয়ারের কথা যখন মনে হতো, তার সঙ্গে আমার কখনো মনোমালিন্য হয়েছে, কখনো ঝগড়াঝাটি হয়েছে, সেসব ব্যাপার একেবারেই মনে থাকতো না। তার মুখ এবং চোখ দুটোই আমার মনে ভেসে উঠতো। শাহরিয়ারের মুখের আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য ছিলো, আমার চোখে সেরকম কিছু ধরা পড়ে নি। তবু মাঝে মাঝে মনে হতো, কোনো ভাস্কর যদি একটি মূর্তি গড়ে, তার মুখমণ্ডলটি তৈরি করার বেলায় তাকে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিতে হবে। যদিও শাহরিয়ার প্রকৃতিতে ছিলো খুবই চঞ্চল, তথাপি তার মুখে একটা ধ্যান-তন্ময়তার ভাব সময় সময় লেগে থাকতো। সবচাইতে সুন্দর ছিলো তার চোখ দুটো। পুরুষ মানুষের এমন আশ্চর্য সুন্দর চোখ আমি খুব কমই দেখেছি। যেদিকেই তাকাতো, মনে হতো, একটা স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। আমার ধারণা শাহরিয়ারের সঙ্গে মতামতের গড়মিল সত্ত্বেও খুব সহজে সব ধরনের মানুষের সঙ্গে তার যে বন্ধুত্ব হয়ে যেতো, তার প্রধান কারণ ছিলো তার চোখের দৃষ্টি।

শাহরিয়ারের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিলো বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্কের কাছে কামাল সাহেবের অফিসে। কামাল সাহেব একটি ছোটো গল্পের পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তিনিই প্রথম আমাকে শাহরিয়ারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, জাহিদ ভাই আপনাকে আমার পত্রিকার এক নতুন লেখকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র, ছোটো গল্প লেখে। কথা বলে দেখুন, আপনার ভালো লাগবে। শাহরিয়ার যখন কথা বললো, কণ্ঠস্বর শুনেই আমার মনে একটা ভাবান্তর এসে গেলো। ভরা কলসির পানি ঢালার সময় যেমন থেকে থেকে একটা মিষ্টি সুন্দর আওয়াজ সৃষ্টি হয়, শাহরিয়ারের

কণ্ঠস্বরে সে রকম একটা জল ছলছল ভাবের আভাস আমার শ্রবণে-মননে বিঁধে গেলো। ছেলেটিকে তো আমার মনে ধরে গেলো।

তারপরে তো শাহরিয়ার গল্প ছেড়ে কবিতা লিখতে আরম্ভ করলো। আমি কবিতার সমঝদার নই। তবু শাহরিয়ারের কবিতার মধ্যে এমন একটা মেজাজ পেয়ে যেতাম, বক্তব্য বিষয় ছাপিয়ে গড়ানো পঙ্‌ক্তিসমূহের ভেতর থেকে শব্দ শুনছি, শব্দ শুনছি, জল চলছে জল চলছে এমন একটা ভাব বেরিয়ে এসে আমাকে আবিষ্ট করে রাখতো। মাত্রা ভুল এবং ছন্দগত ত্রুটিকে উপেক্ষা করেও শাহরিয়ার তার কবিতায় আশ্চর্য একটা সম্মোহন সৃষ্টি করতে পারতো। এটাই শাহরিয়ারের আসল ক্ষমতা। কিন্তু শাহরিয়ারের কবিতার প্রতি আমার মুগ্ধতা-বোধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। এক সময় তার কবিতা আর পড়তে পারতাম না। পড়লেও বিরক্ত হয়ে উঠতাম। কারণ কবিতায় আমি অন্য জিনিশ চাইতাম।

শাহরিয়ারের কবিতা পছন্দ করিনে বলে তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের চিড় ধরে নি। শাহরিয়ার যে আমার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিলো তার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক সময় আমার সঙ্গে থাকতে আসে। ক'জন বন্ধু মিলে আরমানিটোলার হোটেল ওরিয়েন্টের দু' তিনটে রুম ভাড়া করে একটা মেস চালু করেছিলাম। সেই মেসে শাহরিয়ার আমার সঙ্গে থাকতে আসে। সে ছাত্র পরিচয়ে আমাদের এখানে এসেছিলো। কিন্তু মেসের সদস্য ছিলো না। আমার গেস্ট হিসেবেই থাকতো। ক'দিন না যেতেই একটা জিনিশ লক্ষ্য করলাম। শাহরিয়ার ঠিক সময়ে ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে না। আজেবাজে মানুষদের সঙ্গে চলাফেরা করে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। এরকম তিন চারদিন দেখার পর, একদিন আমি বললাম, শাহরিয়ার তুমি য়্যুনিভার্সিটিতে যাচ্ছো না কেনো? সে বললো, জাহিদ ভাই, সেটা একটা দুঃখের কথা। আমি বললাম, বলে ফেলো, কি দুঃখের কথা। সে বললো, আপনাকে জানাতে আমার ভীষণ সঙ্কোচ হচ্ছে। আমি বললাম, আমরা এমন এক অবস্থায় বাস করছি যেখানে সঙ্কোচ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তোমার দুঃখের কথাটা বলে ফেলো। শাহরিয়ার বললো, জাহিদ ভাই, ডিপার্টমেন্টে আমার নামটা কাটা গেছে। তিনমাস টুইশন ফি দিই নি। আব্বাও টাকা পাঠাচ্ছেন না। আমি ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়ে গেছি। আপনাদের এখানে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা না হলে আরো বিপদের পড়ে যেতাম।

শাহরিয়ারের নাম কাটা যাওয়ার সংবাদ শুনে আমি খুব ব্যথিত বোধ করলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমারো নাম কাটা গিয়েছিলো। আজ তুলবো, কাল তুলবো করে টাকার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় আমার নামটি তোলা আর সম্ভব হয় নি। এক সময় পড়াশোনাটা আমার বাদ দিতে হলো। একই ব্যাপার শাহরিয়ারের ক্ষেত্রেও ঘটতে যাচ্ছে।

সে সময় বাংলাবাজারের এক প্রকাশকের কাছে আমি একটা উপন্যাস গছাতে পেরেছিলাম। আমি একেবারে নাম-পরিচয়হীন উগ্র একজন তরুণ লেখক। আমার লেখা প্রকাশক ছাপার জন্য গ্রহণ করবেন কি না, সে ব্যাপারেও আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিলো। তবুও পরদিন সকালবেলা প্রকাশকের বাড়িতে গিয়ে দাবি করে বসলাম, তাঁদের তো আমার উপন্যাসটি ছাপতে হবে, উপরন্তু অগ্রিম হিসেবে আজই দেড় হাজার টাকা রয়্যালিটি

পরিশোধ করতে হবে। প্রকাশক ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, ঠিক আছে, আপনি আজই পনেরোশ' টাকা নিয়ে যান। কিন্তু বই ছাপার জন্য চাপাচাপি করবেন না। আমাদের সময় হলেই বই প্রেসে যাবে।

আমার হাতে প্রকাশক ভদ্রলোকের দেয়া কড়কড়ে নোটের পনেরোশো টাকা। আমার প্রথম উপন্যাস লেখার টাকা। দক্ষিণ মেরু জয় করে এলেও আমার এরকম আনন্দ হতো না। এ টাকা দিয়ে কি করবো, তাই নিয়ে একটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে গেলাম। কখনো মনে হলো আমার প্রিয় লেখকদের বইগুলো কিনে ফেলি। আবার ভাবলাম, বই কেনা আপাতত থাকুক। আমি ঠিক সময়ে টাকা শোধ করতে পারি নি বলেই আরমানিটোলার মেসের বন্ধুদের কষ্ট করতে হয়। তাদের সবাইকে নিজের হাতে বাজার করে একবেলা ভালো খাওয়াবো। আবার ভাবতে হলো মাকে আমি আপন রোজগারের টাকা এ পর্যন্ত কোনোদিন পাঠাতে পারি নি। সামান্য হলেও কিছু টাকা মার কাছে পাঠাতে হবে। নিজের জামা-কাপড়ের দিকেও তাকালাম। আমার পরনের শার্ট একটিতে এসে ঠেকেছে। একটা নতুন শার্ট না বানালে আর চলে না। শীত এসে গেছে। একটা গরম সুয়েটার বা জ্যাকেট কেনা প্রয়োজন। বই কেনা, মেসের লোকদের খাওয়ানো, মার কাছে টাকা পাঠানো এবং নিজের জামাকাপড় কেনা ওসব বিষয় একপাশে ঠেলে রেখে ভাবলাম, আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় শাহরিয়ারের নাম ওঠানো প্রয়োজন। নাম ওঠানোর পরে যদি বাকি টাকা থাকে অন্য সমস্ত কিছু করা যাবে।

আমি মেসে এসে শাহরিয়ারকে জিগ্যেস করলাম, তোমার নাম ওঠানোর জন্য কতো টাকা প্রয়োজন? শাহরিয়ার হিসেবটিসেব করে বললো, জাহিদ ভাই, সব মিলিয়ে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা প্রয়োজন। আমি তার হাতে একশো টাকার একটি, তিনটি দশ এবং একটি পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বললাম, এই তোমার একশো পঁয়ত্রিশ টাকা। রেজিস্ট্রার অফিসে জমা দিয়ে নামটা তোলার ব্যবস্থা করো। শাহরিয়ার হাত পেতে টাকাটা নিলো। টাকাটা তাকে দিতে পেরে আমার কী যে ভালো লাগলো, আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। আমার প্রথম লেখার টাকা দিয়ে একজন তরুণ কবির পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়া রোধ করতে পারলাম। তার পরদিন সকালবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দেখি শাহরিয়ার ফজলুর রহমানের সঙ্গে বসে বসে কেরাম খেলছে। আমার ভীষণ খারাপ লাগলো। প্রথম লেখার টাকা দিয়ে তোমার নামটা ওঠাবার ব্যবস্থা করলাম, আর তুমি ক্লাশে না গিয়ে সকালবেলাটা কেরাম খেলে কাটিয়ে দিচ্ছো! অবশ্য মুখে শুধু বললাম, তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছো না? শাহরিয়ার বললো, জাহিদ ভাই, কাল আপনি রাত করে এসেছিলেন, তাই আপনাকে বলা হয় নি। আমার নাম উঠিয়েছি, তবে আরো পঁয়তাল্লিশ টাকা দিতে হবে। সেমিনার চার্জ পঁয়তাল্লিশ টাকা, হিসেব করার সময় আমার মনে ছিলো না। আমি বললাম, আর পঁয়তাল্লিশ টাকা দিলে তোমার নাম উঠে যাবে তো? শাহরিয়ার বললো, নাম তো উঠে গেছে। এই চার্জটা আলাদা দিতে হবে। আমি বললাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকাল কি ছুটাছুটাভাবে ফি আদায় করা হয়। শাহরিয়ার বললো, হ্যাঁ,

এরকম একটা নতুন নিয়ম করা হয়েছে। আমি বাক্যব্যয় না করে আরো পঁয়তাল্লিশ টাকা তার হাতে তুলে দিলাম।

সে রাতে শাহরিয়ার আর মেসে ফেরে নি। তারপরের রাতও না। আমি তার কোনো বিপদআপদ হয়েছে কিনা ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। এই সময়ে ফজলুর রহমান এসে আমাকে আসল খবর জানালো। সে বললো, জাহিদ ভাই, শাহরিয়ার তো আপনার খুব পেয়ারের লোক। আর আমাদের মনে করেন নষ্ট মানুষ। আপনি শাহরিয়ারকে সবসময় আমাদের সংসর্গ থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করেন। আপনি মনে করেন আমাদের সংসর্গে থাকলে আপনার শাহরিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে। কে কাকে নষ্ট করছে, আপনাকে আজ হাতেনাতে দেখিয়ে দেবো। আপনি প্যান্টটা পরুন এবং চলুন আমার সঙ্গে।

ফজলুর রহমান আমাকে বাবু বাজারের একটা কানাগলির মধ্যে নিয়ে এলো। প্রস্রাবের গন্ধে পেটের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসতে চায়। সেই সরু গলির মধ্যে খোপ খোপ ঘর। প্রতি ঘরের সামনে রঙচঙ মাখা একেকজন মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা শরীরে এমনভাবে পাউডার মেখেছে, মনে হয়, মাগুর মাছের শরীরে ছাই মাখিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। এই সেই ঢাকা শহরের প্রসিদ্ধ পতিতা পট্টি। ঘেন্নায় আমার নাক-মুখ কুঞ্চিত হয়ে এলো। আমি ফজলুর রহমানকে বললাম, তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এলে? ফজলুর রহমান বললো, জাহিদ ভাই, উতলা হচ্ছেন কেনো? আপনাকে আসল জায়গাতেই নিয়ে এসেছি। আপনি আমার পেছন পেছন আসুন। আপনার সঙ্গে কবি শাহরিয়ারের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দেবো। ফজলুর রহমান এবারে একটি ঘরের দরোজায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললো, এই দরোজায় আপনি টোকা দিন, শাহরিয়ারের দেখা পেয়ে যাবেন।

আমি সেই বন্ধ ঘরের কাঠের কপাটে টোকা দিতে থাকলাম। ভেতর থেকে লোকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু দরোজা খোলার নাম নেই। এক সময় নারী কণ্ঠের একটা আওয়াজ শুনলাম, আউজকা অইব না, অন্য ঘরে যাও। আমার ঘরে লোক আছে। সেই কথা শোনার পরও আমি টোকা দিয়ে যেতে থাকলাম। অবশেষে দরজা খুলে গেলো। একটি মেয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো, চেমনির পুত তোরে কই নাই আমার ঘরে আইজ মানুষ আছে। মেয়েটির পরনে ব্লাউজ এবং সায়া ছাড়া শরীরে আর কোনো বসনের বালাই নেই। আমি একেবারে তার মুখোমুখি চলে এলাম। ভক ভক করে দেশী মদের গন্ধ বেরিয়ে আসছে। তাকে হাত দিয়ে ঠেলে আমি ঘরে ঢুকলাম। ঘরের মধ্যে শাহরিয়ারের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেলো। আমার পরিচিত আরেকজন বুড়ো কবির সঙ্গে বসে বসে শাহরিয়ার বাংলা মদ টানছে। আমার প্রথম বই লেখার টাকা কোন্ সুড়ঙ্গ পথে যাচ্ছে বুঝতে বাকি রইলো না। শাহরিয়ারের চুল ধরে কিল-চড় মারতে আরম্ভ করলাম। তাকে কিল-চড় মেরেই যাচ্ছিলাম, কি করছি আমার কোনো হুঁশ ছিলো না। এই ফাঁকে সেই পরিচিত বুড়ো কবি কোথায় উঠে পালালো, খেয়াল করতে পারি নি। এখন ভেবে অবাক লাগে শাহরিয়ার আমাকে পাল্টা মার দিতে চেষ্টা করে নি কেনো? মেয়েটি আমাকে থামাবার অনেক চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত বিফল হয়ে পাড়ার গুণ্ডাটিকে

ডেকে আনলো। গুণ্ডাটি এসে আমার ঘাড়ের কাছে এমন একটা ঘুষি লাগালো যে, আমাকে বসে পড়তে হলো। তারপরে মারতে মারতে একেবারে কাহিল করে ফেলে চুল ধরে সেই নোংরা গলি দিয়ে হাঁটিয়ে এনে সদর রাস্তার ওপর ছেড়ে দিলো। আমি এদিক ওদিক তাকালাম। কিন্তু ফজলুর রহমানের চিহ্নও কোথায় দেখতে পেলাম না।

এই ঘটনার পর থেকে শাহরিয়ারের সঙ্গে আমার আর কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয় নি। কিন্তু তার সঙ্গে কথাবার্তা বলা আমার বন্ধ হয় নি। একই শাহরিয়ারের মধ্যে আমি দু'জন মানুষের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছি। এক শাহরিয়ার ছিলো নিরীহ, ফুলের মতো কোমল। তার চোখের দিকে তাকালে বনের হরিণের কথা মনে পড়ে যেতো। হরিণের মতো তার চোখে একটা অসহায়তার ভাব ছল ছল জেগে থাকতো। আরেক শাহরিয়ার ছিলো চালবাজ, অকৃতজ্ঞ এবং লোভী। তবুও শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ নেই। শাহরিয়ার বেশ্যাপাড়ায় যাতায়াত করেছে এবং বেশ্যাসক্ত হয়ে পড়েছে এ নিয়েও বলার কিছু ছিলো না। কারণ কবিতা লেখা এবং বেশ্যাসক্ত হওয়া একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কবি যশোপ্রার্থী তরুণেরা অনেকেই যেতো, শাহরিয়ার ছিলো তাদেরই একজন। সে সময়ে বেশ্যাপাড়ায় যাওয়াটা একটা বিশেষ মর্যাদার ব্যাপার বলে ধরে নেয়া হতো।

শাহরিয়ারের প্রতি আমার নালিশ নেই, কিন্তু দুঃখ আছে। দুঃখ এই কারণে যে দুরারোগ্য ব্যাধিগুলো সে এই বেশ্যাদের কাছ থেকেই পেয়েছে। অপরিমিত মদ্যপান, অনাহার, অনিয়ম এবং বেশ্যা সঙ্গের কারণে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছিলো, এখানকার ডাক্তারেরা বলে দিয়েছিলেন, এ দেশে তার চিকিৎসা নেই। বাইরেটাইরে কোথাও চেষ্টা করলে তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়তো অসম্ভব নাও হতে পারে। অনেকে শাহরিয়ারের অসুখের কথা জানতো, অনেকেই তার কবিতা ভালোবাসতো। বিনা চিকিৎসায় শাহরিয়ারের মতো একজন সম্ভাবনাময় কবি মারা যাবে, এটা কেউ মেনে নিতে পারে নি। শাহরিয়ারকে মার্কিন দেশে চিকিৎসার জন্য পাঠানোর একটা জোর দাবি উঠেছিলো। সরকারকে সে দাবি মেনেও নিতে হয়েছে। প্লুরিসির চিকিৎসার জন্য সরকার তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও পাঠিয়েছিলো। আমি এতোদূর পর্যন্ত শাহরিয়ারের খবর রাখতাম। চিকিৎসা শেষ করে দেশে এসেছে, এই সংবাদ আমি পত্রিকায় পড়েছিলাম। তারপরেইতো পড়লাম, কবিতা। শাহরিয়ারের খবর জানার জন্য আমার মনটা আকুল হয়ে উঠলো। আমি মোহাম্মদপুরে মাহফুজের বাড়িতে গেলাম। কারণ একমাত্র মাহফুজই গত আট-দশ বছর ধরে শাহরিয়ারকে বিপদআপদ থেকে রক্ষা করে আসছে। বিদেশে পাঠানোর বেলায়ও মাহফুজ যতো খাটাখাটনি করেছে, তার তুলনা হয় না।

মাহফুজ মোহাম্মদপুরে এক সঙ্গে শ্বশুর এবং শালা-শালিদের নিয়ে থাকে। একদিন তার ওখানে শাহরিয়ারের খবর নিতে গেলাম। মাহফুজ বলেছিলো লেপ-তোশকের দোকানের পেছন দিক দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে বেল টিপতে। ওটাই উনত্রিশ নম্বর। দোতলায় উঠে বেল টিপলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। ম্যাক্সি পরা একটি

যুবতী মহিলা বেরিয়ে এসে কাট কাট জিগ্যেস করলেন, কাকে চান ? আমি বললাম, মাহফুজ সাহেবকে। মহিলা আমাকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন, পাশের দরোজায় বেল টিপুন। পাশের দরোজায় বেল টিপতেই একটি বাচ্চা মেয়ে বেরিয়ে এসে বললো, কার কাছে আইছেন ? আমাকে আবার মাহফুজ সাহেবের নাম বলতে হলো। মেয়েটি বললো, আমার পাছ পাছ আইয়েন। একটি প্যাসেজ মতো করিডোর পার করিয়ে একটা বন্ধ দরোজা দেখিয়ে বললো, ওই হানে কড়া নাড়েন। কড়া নাড়লাম। মাহফুজ স্বয়ং দরজা খুলে দিলেন। আমি তার ঘরে ঢুকে সোফায় বসতে-না-বসতেই মাহফুজ বলে ফেললেন, জাহিদ ভাই আমি ঠিক করেছিলাম আপনার সঙ্গে আর কথা বলবো না। বাসায় আসছেন যখন কথা তো বলতেই হবে, কি খাবেন কন ? আমি বললাম, আমার সঙ্গে যে কথা বলতে চান না, আমি অপরাধটা কি করলাম ? মাহফুজ বললেন, সমস্ত অপরাধ তো আপনার। আপনি কোত্থেকে শামারোখ না কি এক ডাকিনী মহিলাকে এনে বিশ্ববিদ্যালয়ে বসিয়েছেন, সে তো এদিকে সর্বনাশ করে ফেলেছে। আমি বললাম, একআধটু সর্বনাশ করার ক্ষমতা না থাকলে সুন্দরী হয়ে লাভ কি ? শামারোখ কোথায় কার সর্বনাশটা করলো বলুন দেখি। মাহফুজ পুনরায় জানতে চাইলেন, এই মহিলার সাম্প্রতিককালের কাজকর্ম সম্পর্কে আপনি কিছু কি জানেন ? আমি বললাম, এরকম দ্রুতগামী মানবী শামারোখ তার সমস্ত কাজকর্মের হিসেব রাখা একজন মানুষের পক্ষে কি সম্ভব ? তিনি বললেন, ওই ডাকিনী তো শাহরিয়ারকে খুন করতে যাচ্ছে। আমি বললাম, তাই নাকি ? তা'হলে তো একটা কাজের কাজ করছে। শাহরিয়ারকে প্লুরিসির মতো জবরদস্ত রোগ খুন করতে পারলো না, আর তাকে শামারোখ খুন করবে! তা'হলে তো একটা ঘটনাই ঘটে যায়। মাহফুজ বললেন, রসিকতা বাদ দিয়ে আসল ব্যাপার শুনুন। মাহফুজের কথা শুনে আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

শাহরিয়ারকে মার্কিন ডাক্তার বলেছেন, চার বছর তাকে কঠোর নিয়ম মেনে চলতে হবে। তাকে ঠিক সময়ে খেতে হবে, ঠিক সময়ে ঘুমোতে হবে। ওষুধ-পথ্য সব যথাযথ নিয়মে চালিয়ে যেতে হবে। ওই নিয়মের যদি খেলাপ হয় তা'হলে পুরনো রোগটা আবার নতুন করে দেখা দেবে। যদি রোগ নতুন করে দেখা দেয় তাকে বাঁচানো আর সম্ভব হবে না। শামারোখের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে শাহরিয়ার ওষুধ-পথ্য কিছুই ঠিকমতো খাচ্ছে না। মহিলার সঙ্গে দেশের এ মাথা থেকে ও মাথা ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রতিদিন বারোটা একটা অবধি রাত জাগছে। অহরহ সিগারেট টানছে। শাহরিয়ারকে ওই মহিলার সঙ্গে ছুটোছুটি করতে বারণ করলে কিছুতেই সে শোনে না, অনর্থক রাগারাগি করে। মাহফুজ বললেন, আমি অনেক করে শাহরিয়ারকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি, তুমি একটা সিরিয়স রোগী, এ ধরনের অনিয়ম করে গেলে তোমার শরীর ওই ধকল সহ্য করবে না। আমি বললাম, শাহরিয়ার কি বললো। মাহফুজ বললেন, সে কথা আর বলে লাভ কি ? সে বলে পৃথিবীতে একজন মানুষও যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে সেই একজন মানুষ হলো শামারোখ। অন্য সব ব্যাপারে সে পরামর্শ-উপদেশ ওসব শুনতে রাজি। কিন্তু শামারোখের বিষয়ে শাহরিয়ার কারো কোনো কথা শুনবে না।

আমি বললাম, শামারোখকে শাহরিয়ারের রোগের ব্যাপারে কিছু বলেছিলেন ? মাহফুজ বললেন, সে অত্যন্ত খতরনাক মেয়ে মানুষ। আমি মহিলাকে শাহরিয়ারের রোগের কথা জানিয়ে সতর্ক করতে চেষ্টা করলে ওই অসভ্য মহিলা আমার মুখের ওপর বলে বসলো, শাহরিয়ারের কোনো ভাবনা আর তার বন্ধুদের না ভাবলেও চলবে। সব দায়-দায়িত্ব শামারোখ একা তার ঘাড়ে করে তুলে নিয়েছে। আমি বললাম, একদিক দিয়েতো ভালো হলো। শাহরিয়ারের শরীরের ওই অবস্থায় এরকম কেউ একজন থাকা তো প্রয়োজন, যে তাকে সর্বক্ষণ দেখাশোনা করতে পারে। শামারোখকে আমি যতোটুকু জানি, যে মানুষকে সে ভালোবাসে তার জন্য এমন আত্মত্যাগ নেই যা সে করতে পারে না। মাহফুজ বললেন, দেখবেন অবস্থাটা কি দাঁড়ায়। এরকম চলতে থাকলে চারমাসও সুস্থ থাকতে পারে কিনা সন্দেহ। মাঝখান থেকে আমার মেহনতটাই বরবাদ। গত আট বছর ধরে শাহরিয়ারকে আগলে আগলে রাখছি। এখন আমি কেউ নই শাহরিয়ারের। ওই মহিলাই সব। মহিলা আজকাল আমাকে শাহরিয়ারের ধারেকাছেও ঘেঁষতে দেয় না। মাহফুজের কথার মধ্যে একটা গভীর বেদনার আভাস পাওয়া গেলো। আমি মাহফুজের দুঃখটা অনুভব করতে পারি। মাহফুজ গত আট বছর শাহরিয়ারের জন্য যা করেছেন, কোনো মানুষ তার নিকটাত্মীয়ের জন্যও অতোটা করে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাহরিয়ারকে পাঠানোর জন্য অফিস থেকে ছুটি নিয়ে দিনে-রাতে খেটেছেন। মার্কিন দেশের হাসপাতালে ভর্তি করানো, সরকারের ঘর থেকে টাকা-পয়সা সংগ্রহ, পাসপোর্ট, ভিসার ব্যবস্থা করা সবকিছুর ধকল একা মাহফুজকেই পোহাতে হয়েছে।

এই সময়ের মধ্যে একদিন এক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে আমার সঙ্গে শাহরিয়ার এবং শামারোখের দেখা হয়ে গেলো। শাহরিয়ার চমৎকার একটি আকাশী নীল উলের জ্যাকেট পড়েছে। মাফলারটা গলার চারপাশে জড়ানো। তার সারা শরীর থেকে তারুণ্য ঝরে ঝরে পড়ছে। এই অবস্থায় দেখে কারো মনে হওয়ার উপায় নেই, শাহরিয়ারের শরীরে কোনোরকম রোগব্যাধি আছে। আগের তুলনায় অনেক বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে শাহরিয়ারকে। শামারোখ পরেছিলো মেরুন রঙের শাড়ি। শাহরিয়ারের পাশে শামারোখকে এতো অপূর্ব দেখাচ্ছিলো, অনেকক্ষণ আমি দু'জনের ওপর থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি নি।

আসর ভেঙে যাওয়ার পর শামারোখ আমাকে নেহায়েত ভদ্রতাবশত জিগ্যেস করেছিলো, গান কেমন শুনলেন ? নেহায়েত একটা জবাব দিতে হয়, তাই বলেছিলাম, ভালো। শাহরিয়ার আমার দিকে একজন অপরিচিতের দৃষ্টি দিয়ে তাকালো এবং জিগ্যেস করলো, জাহিদ সাহেব নাকি, কেমন আছেন, আপনি এখন কোথায় থাকেন ? শাহরিয়ারের এই ধরনের সম্ভাষণ শুনে আমি মনের মধ্যে একটা আঘাত পেয়ে গেলাম। সে ঢাকা আসার পর থেকেই আমাকে জাহিদ ভাই ডেকে আসছে। বুঝতে পারলাম, শামারোখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে আমার অস্তিত্বটাই তার পক্ষে অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে শামারোখের এতোদিনের মেলামেশা সম্পর্কে সে জানতে পেরেছে। নানা মানুষের কাছ থেকে আমি নানা সংবাদ পাচ্ছিলাম। একজন বললো, শামারোখকে

শাহরিয়ারের সঙ্গে শেরাটন হোটেলে দেখা গেছে। আরেকজন বললো, এক শুক্রবার শামারোখ এবং শাহরিয়ার চিড়িয়াখানার বানরদের বাদাম খাইয়েছে। আবার কেউ এসে বললো, সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে দু'জনকে পরস্পর হাত ধরাধরি করে ঘুরতে দেখা গেছে। এই সমস্ত খবরে আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু যারা এসে খবরগুলো বলছে তাদের বিকৃত আনন্দ উপভোগের পদ্ধতিটি দেখে আমার ভীষণ খারাপ লাগছিলো। এতোকাল তারা শামারোখের সঙ্গে আমাকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে। অনেকেই জানে শামারোখের জন্য আমি একটা লড়াই করেছি। এখন শামারোখ আমাকে ছেড়ে শাহরিয়ারের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছে, ওই সংবাদটা আমাকে জানানোর উদ্দেশ্য হলো অনেকটা এরকম : এতোদিন তো এই মহিলাকে নিয়ে আকাশে উড়ছিলে, আশপাশের মানুষকে মানুষ মনে করো নি। এখন মহিলা তোমাকে ল্যাং মেরে অন্য মানুষের সঙ্গে ঘুরছে, এখন বোঝো মজাটা! শামারোখকে আমি একরকম চিনে ফেলেছি। তার কোনো ব্যাপারেই আমার উৎসাহ নেই। সে যা ইচ্ছে করুক। কিন্তু শুনে কষ্ট লাগলো শাহরিয়ার নানা লোকের কাছে নানা জায়গায় আমার নামে নিন্দেমন্দ বলে বেড়াচ্ছে। শাহরিয়ার আমার নামে যা ইচ্ছে বলে বেড়াক। আমি হিসেব করে দেখেছি, এটা আমার প্রাপ্য ছিলো। আমার বুঝতে বাকি রইলো না, আমাকে একটা শিক্ষা দেয়ার জন্যই মহিলা শাহরিয়ারকে বেছে নিয়েছে। শাহরিয়ার যা বলবে আমি প্রতিবাদ করতে পারবো না। লোকে মনে করবে আমার মধ্যে ঈর্ষার ভাব জন্মেছে বলেই আমি শাহরিয়ারের সঙ্গে ঝগড়া করতে নেমেছি। শাহরিয়ার পথেঘাটে যেসব বলে বেড়াচ্ছে এর কোনোটাই তার কথা নয়। শামারোখ যা বলাচ্ছে, সে তাই বলে যাচ্ছে।

একজন তরুণ কবি রসিকতা করে বলেছিলেন ঢাকা শহরের কাকের সংখ্যা যতো, কবির সংখ্যা তার চাইতে কম হবে না। কথাটার মধ্যে একটা শ্লেষ আছে। তারপরেও আমার মনে হয়, একটা বিষয়ে কবিদের সঙ্গে কাকদের মিল আছে। একটা কাক যখন বিদ্যুতের তারে আটকে যায়, কিংবা অন্য কোনো বিপদে পড়ে, রাজ্যের কাক ছুটে এসে সাহায্য করতে পারুক না পারুক সমবেদনা প্রকাশ করে। কাকদের যেমন সমাজবোধ প্রবল, কবিদের সমাজবোধ তার চাইতে কম নয়। একজন কবির ভালো-মন্দ কিছু যখন ঘটে অন্য কবিরা সেটা খুব সহজে জেনে যায়। তারা বিষয়টা নিয়ে এমন জল্পনা-কল্পনা করতে থাকে, সেটা সকলের চর্চার বিষয় হয়ে উঠতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না। একজন কবি যখন বিয়ে করে, প্রেমে পড়ে, কেলেঙ্কারি বাধিয়ে বসে, কিংবা যৌন রোগের শিকার হয়, সেটা খুব সহজেই সবার আলোচনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কবিদের সঙ্গে কাকদের প্রজাতিগত সহমর্মিতার ব্যাপার ছাড়া আরো একটি বিষয়ে মিল আছে। একটি কাক আরেকটি কাকের মুখের খাবার কেড়ে নেয়ার জন্য যতোরকম ধূর্ততার আশ্রয় নিয়ে থাকে, একজন আরেকজন কবির প্রাপ্য সম্মানটুকু কেড়ে নেয়ার জন্য তার চাইতে কিছু কম করে না।

কবি এবং কাকের চরিত মানস যে বিশ্লেষণ করতে হলো তার একটা বিশেষ কারণ আছে। শাহরিয়ার এবং শামারোখের সম্পর্ক নিয়ে প্রায় প্রতিদিন এতো কথা আমাকে

শুনতে হতো যে, মেজাজ ঠিক রাখা একরকম দায় হয়ে দাঁড়ালো। আমি বুঝতে পারি নে শামারোখ এবং শাহরিয়ারের সমস্ত সংবাদ আমার কাছে বয়ে নিয়ে আসা হয় কেনো ? আমাকে নিছক মানসিক কষ্ট দেয়া ছাড়া তাদের অন্য কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, এমনতো মনে হয় না। শামারোখ যখন আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো, তখনও কি আমাদের নিয়ে মানুষ এতো কথা বলতো ? হয়তো বলতো, আমি জানতাম না। নিজের ভেতর এতোটা বিভোর হয়েছিলাম যে, কোন্দিকে কি ঘটছে, কোথায় মানুষ কি বলছে, তাকাবার অবকাশ ছিলো না।

তবে হ্যাঁ, একটা জিনিশ আমি নিজেও স্বীকার করবো। শামারোখ-শাহরিয়ারের সম্পর্ক এমন একটা নতুন মাত্রা অর্জন করেছে, মানুষ সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে পারছে না। তার প্রথম কারণ শাহরিয়ার এই সবে মৃত্যুর কবল থেকে কোনোরকমে ফিরে আসতে পেরেছে। সে যে পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করেছে, এ ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত কিছু বলতে পারে না। শামারোখের মতো এমন অপরূপ বিদুষী একজন মহিলা, যার পরমায়ু নিশ্চিত নয় এমন একজন তরুণ কবির পেছনে ছায়ার মতো লেগে আছে, এই ঘটনাটিকে মানুষ অস্বীকার করবে কেমন করে ? কুকুর মানুষ কামড়ালে সংবাদ হয় না, মানুষ যখন কুকুরকে কামড়ায় সেটাই সংবাদের বিষয়বস্তু হওয়ার মর্যাদা অর্জন করে। একজন চালচুলোহীন তরুণ কবি, কদিন বেঁচে থাকবে যে জানে না তার পেছনে সমাজে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত একজন সুন্দরী নারী হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা এমন করে উজাড় করে দিচ্ছে, সে জিনিশটি নিয়ে মানুষ যদি মাথা না ঘামায়, তাহলে মানুষ সম্পর্কে খুব ছোটো করে ভাবতে হয়। শাহরিয়ার এবং শামারোখের সম্পর্কের ধরনটাই একটা বিশেষ শিল্পকর্মের মতো মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। এই সম্পর্কের কোনো অতীত নেই, ভবিষ্যতের কোনো পরিকল্পনা নেই, সবটাই বর্তমান। যে ফুল ফোটার পর একরাতের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়, তার সৌন্দর্যের মতো, গন্ধের মতো শামারোখ-শাহরিয়ারের সম্পর্ক।

এই সময় পত্র-পত্রিকায় শাহরিয়ারের কবিতা ক্রমাগত প্রকাশিত হচ্ছিলো। এগুলো পড়ে আমি একা শুধু মুগ্ধ বোধ করছিনে, যারাই পড়ছে অভিভূত হয়ে যাচ্ছে। একজন রুগ্ন তরুণ তার জীবনী-শক্তির উত্তাপ দিয়ে এমন সুন্দর প্রাণবন্ত কবিতা কেমন করে লিখতে পারে! এমন প্রাণশক্তিতে ভরপুর কবিতা শাহরিয়ার লিখছে, কবিতায় শরীরের রোগ কিংবা যন্ত্রণার সামান্যতম স্পর্শও নেই। এমন আশ্চর্য স্নিগ্ধ প্রশান্তি শাহরিয়ারের এলো কেমন করে ? শামারোখের ভালোবাসাই কি শাহরিয়ারের কল্পনাকে স্বর্গ সৃষ্টিতে পারঙ্গম করে তোলে নি ? আমি নিজেকে ঘৃণা করতে থাকলাম। শামারোখের সঙ্গে আমারওতো একটা গভীর সম্পর্ক ছিলো। আমি শাহরিয়ারের মতো এমন প্রাণস্পন্দনময়, এমন প্রশান্ত একটি পঙ্ক্তিও তো রচনা করতে পারি নি ? প্রজাপতি যেমন ফুল থেকে বিষ আহরণ করে, আমারও কি তেমনি খারাপ দিকটির প্রতি প্রথম দৃষ্টি পড়ে ? আমি শামারোখের ভেতরের ওই বিস্ময়কর অংশটি আবিষ্কার করতে পারি নি কেনো ? শুধু খালি চোখে যতোদূর দেখি তার বাইরে দেখার ক্ষমতা কি আমার একেবারে নেই ?

আমার মনে জ্বালা ধরে গিয়েছিলো। তবু শাহরিয়ার এবং শামারোখের অকুণ্ঠ প্রশংসা না করে পারলাম না। মাহফুজের কাছে আমি জেনেছি, শাহরিয়ারের একটি পা কবরের ভেতর। তার পরেও প্রেমের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে মৃত্যুর শীতল স্পর্শকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে শাহরিয়ার। তার ওই কবিতাগুলো তো মৃত্যুর বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ। হয়তো শাহরিয়ার বেশিদিন বাঁচবে না। কিন্তু বেশিদিন বেঁচে কি লাভ? জীবন-মরণের যা অভীষ্ট, শাহরিয়ার তো তার সন্ধান পেয়ে গেছে। শাহরিয়ারের কাছে আমার নিজেকে বিবমিষা উৎপাদনকারী তুচ্ছ কৃমি কীট বলে মনে হতে থাকলো।

তার প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গিরও একটা পরিবর্তন ঘটে গেলো। শামারোখের শারীরিক সৌন্দর্য প্রথমদিকে পূর্ণিমার চাঁদ যেমন সমুদ্রের জলকে আকর্ষণ করে সেভাবে আমাকে আকর্ষণ করেছিলো। কিন্তু তার সঙ্গে মেলামেশার এক পর্যায়ে তার সৌন্দর্যের প্রতি আমি পুরোপুরি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। শেষের দিকে ভয় করতে আরম্ভ করেছিলাম। তার শরীর দেখলে আমার রং-করা মাংস বলে মনে হতো। এই সৌন্দর্যের ফাঁসে যাতে আমি আটকে না যাই, পালিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করতাম। এখন অনুভব করতে পারছি শামারোখের অপরূপ সৌন্দর্য হলো ঈশ্বরের এক মহান দান। এই সৌন্দর্য কী অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়ে তুলতে সক্ষম, শাহরিয়ারের কবিতাগুলো পড়েই বুঝতে পেরেছি। আমি ধরে নিলাম আমার চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে গেছে। এক সময় ইচ্ছে করলে আমি শামারোখকে সম্পূর্ণ আপনার করে নিতে পারতাম। তার প্রকৃত রূপ অন্তরের চোখ দিয়ে অবলোকন করতে পারতাম। আমি একজন পাষণ্ড, আমার হৃদয়ে চোখ জন্মাবে কেমন করে। ঈশ্বরের মহত্তম দান আমি অবহেলা করেছি বলে, দাম দেবার কিছু থাকবে না, সেটা কেমন করে হতে পারে? ঈশ্বরের রাজত্বে এতো অবিচার কি সম্ভব?

শামারোখ শেষ পর্যন্ত সেই মানুষের সাক্ষাৎ পেয়ে গেছে, যে তাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে। হোক না তা অত্যন্ত ক্ষণিকের। আমার অনুভব করতে বাকি রইলো না আমি নিতান্তই একজন হতভাগা। মানুষ হিসেবে আমার অপূর্ণতাই আমাকে পীড়িত করছিলো। এখন আয়নায় নিজের মুখ দেখতে আমার কষ্ট হয়।

২০

একদিন রাতে ঘুমিয়ে আছি। মাহফুজ এসে আমার ঘুম ভাঙালো। ঘড়িতে দেখি একটা বেজে গেছে। আমি মাহফুজের দিকে একটু বিরক্তির দৃষ্টিতেই তাকিয়ে জিগ্যেস করলাম, কি বিত্তান্ত, এতো রাতে? মাহফুজ বললেন, আপনাকে একটু আসতে হয়। আমি বললাম, কোথায়? মাহফুজ বললেন, হাসপাতালে। আমি বললাম, হাসপাতালে কেনো?

তিনি বললেন, পরশুদিন শাহরিয়ারকে ভর্তি করানো হয়েছে, ছটফট করছে। ডাক্তার বলছেন, আর বেশি দেরি নেই। আপনাকে দেখতে চাইছে। জাহিদ সাহেব আপনি যেদিন আমার বাড়িতে গিয়েছিলেন আমি তো বলেছিলাম এই ডাকিনী মহিলা শাহরিয়ারকে চারটি মাসও বেঁচে থাকতে দেবে না। এখন মাত্র তিনমাস। দেখছেন তো আমার কথাটা এখন সত্যি হতে যাচ্ছে। আমি মাহফুজের কথার কোনো জবাব দিলাম না। মনে মনে বললাম, শাহরিয়ার না বাঁচলেও এমন কি ক্ষতি! সে তো অমৃতের সন্ধান পেয়ে গেছে।

আমি হাসপাতালে গিয়ে দেখি অনেক মানুষ তার বিছানার চারপাশে। ছোট্টো কক্ষের মধ্যে স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না দেখে অনেকে করিডোরে দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তার শেষ অবস্থা নিশ্চিত জেনে মুখ থেকে অক্সিজেন মাস্কটি খুলে নিয়েছেন। শাহরিয়ারের পাশের একটি খাটে শামারোখ মুখে হাত দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। তাকে একটি ভাস্কর্যের মতো দেখাচ্ছে। আমি যখন গিয়ে শাহরিয়ারের কপালে হাত রাখলাম, দেখি তার চোখের কোণ দুটো পানিতে ভরে গেছে। মুখ থেকে লালা গড়িয়ে পড়ছে। বিড় বিড় করে কিছু একটা উচ্চারণ করার চেষ্টা করছে। আমার কান একেবারে তার মুখের কাছে নিয়ে গেলাম। কিন্তু কি বলছে কিছুই উদ্ধার করতে পারলাম না। তারপরের কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব শেষ। শাহরিয়ারের বোনটি ডুকরে কেঁদে উঠে দু'হাত দিয়ে নিষ্প্রাণ শরীরটাকে আঁকড়ে ধরলো।

শামারোখের কোনো ভাবান্তর নেই। গালের ওপর হাতটা রেখে শাহরিয়ারের দিকে নির্বিকার তাকিয়ে আছে। তার ঠোঁট দুটো কাঁপছে। আমার কেমন জানি মনে হলো, সে আমাকে বলছে, ওহে পাষণ্ড, তুমি চেয়ে দেখো একজন তরুণ আমার সৌন্দর্যের বেদিমূলে এইমাত্র তার অমূল্য জীবন উৎসর্গ করলো।

প্রিয় সোহিনী, শামারোখের উপাখ্যানটা যদি এখানে শেষ করতে পারতাম, তাহলে সবচাইতে ভালো হতো। এই রকম একটি সুন্দর পরিসমাপ্তি যেখানে মৃত্যুর সঙ্গে শিল্প হাত ধরে এসে দাঁড়িয়েছে, জীবনের সঙ্গে এসে মিশেছে কবিতা, তার মধ্যে শামারোখকে স্থাপন করে কাহিনীটি যদি শেষ করতে পারতাম, সেটা আমার জন্য, শামারোখের জন্য এবং আমার তরুণ লোকান্তরিত বন্ধু শাহরিয়ারের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট হতো। কিন্তু কাহিনীটা সেভাবে শেষ করতে পারলাম না। কারণ জীবন শিল্প নয়, কবিতা নয়। জীবনে যা ঘটে শিল্প এবং কবিতায় তা ঘটে না। জীবন জীবনই। জীবনের সঙ্গে অন্য কোনো কিছুর তুলনা চলে না এবং জীবন ভয়ানক নিষ্ঠুর। সমস্ত প্রতিশ্রুতি, সমস্ত প্রতিজ্ঞা, সমস্ত স্বপ্ন দুঃস্বপ্নের ওপারে জীবনের লীলাখেলা।

প্রিয় সোহিনী, এখন তোমার কাছে শামারোখের আসল ঘটনাটি ফাঁস করি। শাহরিয়ারের মৃত্যুর পনেরো দিনের মধ্যেই শামারোখ জমিরুদ্দীনকে বিয়ে করে ফেলেছিলো। জমিরুদ্দীনের পরিচয় জিগ্যেস করবে না। তা'হলে তুমি মনে শামারোখ সম্পর্কে অত্যন্ত খারাপ একটি ধারণা পোষণ করবে। লেখক, কবি, শিল্পী কিংবা অভিনেতা কিছুই ছিলো না সে। এমনকি সে অঢেল টাকার মালিকও ছিলো না। যথার্থ অর্থেই সে

একটি দু'পেয়ে পশু ছিলো। শামারোখকে সকাল-বিকেল ধরে পেটানো ছাড়া আর কোনো গুণপনা সে প্রদর্শন করতে পারে নি। সব জেনেশুনে শামারোখ এই জমিরুদ্দীনকেই বিয়ে করেছিলো। এটাই হলো জীবনের ভোজবাজি।

প্রিয় সোহিনী, তুমি যদি জানতে চাও, এখন শামারোখ কোথায়? আমি বলবো, হারিয়ে গেছে। ফের যদি জিগ্যেস করো কোথায় হারিয়ে গেছে, তার সংবাদও আমি তোমাকে দিতে পারি।

যেই দেশটিতে গিয়ে আমাদের ব্রিলিয়ান্ট তরুণেরা হোটেল বেয়ারা কিংবা ড্রাইভারের চাকরি পেলে জীবন সার্থক মনে করে, আমাদের অভিজাত এলাকার অত্যন্ত স্পর্শকাতর অপরূপ তরুণীরা শিশু পাহারার কাজ পেলে মনে করে আহ্ কী সৌভাগ্য! যেই দেশটিতে যাওয়া হয় নি বলেই সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ এই নশ্বর জীবনে স্বর্গ দেখা হবে না বলে আফসোস করে, শামারোখ জমিরুদ্দীনকে নিয়ে সেই স্বপ্নের দেশ আমেরিকার কোথায় হারিয়ে গেছে, কে বলতে পারে?

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত